মহান নেতা এম এন লারমার
২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী
ও
জুম্ম জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা

১০ই নভেম্বর স্মরণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

তথ্য ও প্রচার বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশঃ
১০ নভেম্বর ২০১১

প্রকাশনায়ঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোনঃ +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইলঃ pcjss.org@gmail.com, pcjss@hotmail.com
ওয়েবঃ www.pcjss-cht.org

মূল্যঃ ৫০ টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় -১

প্রবন্ধঃ স্মৃতি তর্পণ ও সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা ৩-২৫

১০ই নভেম্বরের বিশ্বাসঘাতকতা ও তার নব্য সংস্করণ : ষড়যন্ত্রের নানা রূপ ▪ উদয়ন চাকমা - ৩

ধিক্কার জানাই চার সংস্কারপন্থী চক্রদের ▪ শ্রী এস বোস - ৮

অবিস্মৃত স্মৃতির পাতায় প্রয়াত নেতা এম এন লারমা ▪ সুদত্ত চাকমা - ১০

পাহাড়ের পথে জীবনের গান গেয়ে যাই ▪ সঞ্জীব দ্রং - ১৩

শহীদ মনির ▪ লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা - ১৫

হাজার তারার এক তারা : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ▪ শরৎ জ্যোতি চাকমা - ১৮

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের পথিকৃৎ মহান নেতা এম এন লারমা ▪ বিনয় কুমার ত্রিপুরা - ২১

একটি স্বপ্নকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ১০ই নভেম্বর'৮৩ ▪ বাচ্চু চাকমা - ২৩

কাজাক্‌সা ▪ চিংলামং চাক - ২৫

প্রবন্ধঃ আদিবাসী ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি ২৮-৪২

কারও মনে দুঃখ দিয়ো না... ▪ মুহম্মদ জাফর ইকবাল - ২৮

আদিবাসীদের ভয় কেন? ▪ আবুল মোমেন - ৩১

আদিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বাঙালী জাতীয়তাবাদ ▪ রোবায়েত ফেরদৌস - ৩৪

আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের অধিকার এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি ▪ ধীর কুমার চাকমা - ৩৭

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও ইতিহাস প্রসঙ্গ ▪ সজীব চাকমা - ৪২

প্রবন্ধঃ সমাজ, শ্রেণী, সংগ্রাম ও রাষ্ট্রযন্ত্র ৫১-৬১

জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা ▪ এম কে চাকমা - ৫১

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন : জুম্ম যুব সমাজের ভূমিকা ▪ এস চাকমা - ৫৫

ঐক্যের ফেরিওয়ালাদের কাছে কিছু বিনীত নিবেদন ▪ দীপায়ন খীসা - ৫৮

কারাগারে ১২৮৪ দিন ▪ সত্যবীর দেওয়ান - ৬১

বিশেষ প্রতিবেদন ৬৭-৭৮

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও জাতি-আগ্রাসী - ৬৭

পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে খ্রিস্টান রাষ্ট্র বা দক্ষিণ সুদান কিংবা পূর্ব তিমুর বানানোর মতো পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের অপপ্রচারণা প্রসঙ্গে - ৬৯

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত - ৭২

বান্দরবানে লীজ বাতিল : এক শুভঙ্করের ফাঁকি -৭৪

আদিবাসী বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য বিভ্রান্তিকর, সাম্প্রদায়িক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত - ৭৬

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১০ম অধিবেশন - ৭৮

সংবাদ প্রবাহ ৮১-৯৮

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

সেটেলার বাঙালীদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল

নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা

সম্পাদকীয়

এক.

বছর ঘুরে আবার এলো ১০ নভেম্বর। ২০১১ সাল। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাণের মানুষ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। এটা জুম্ম জনগণের জাতীয় শোক দিবস। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতির জন্য এ এক গভীর তাৎপর্যময় দিন। কেননা ১৯৮৩ সালের এই দিনেই জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু, সাবেক সংসদ সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও মহান বিপ্লবী নেতা এম এন লারমা পার্টিরই একদল বিশ্বাসঘাতক, বিভেদপন্থী ও উপদলীয় চক্রান্তকারীর অতর্কিত সশস্ত্র হামলায় অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এটা একদিকে যেমন অত্যন্ত শোকাবহ, তেমনি অপরদিকে সেই সব অপরিণামদর্শী ঘাতকদের প্রতি প্রাপ্য ঘৃণা প্রকাশ এবং জুম্ম জাতি বিধ্বংসী বিভেদপন্থা, উপদলীয় চক্রান্ত ও যাবতীয় ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে তা নির্মূলকরণে দৃঢ় প্রত্যয়ে শপথ নেবারও একটি দিন। মহান নেতা এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং দেশের শোষিত-বঞ্চিত গণমানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ, সকল জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

অপরিণামদর্শী, সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ ও বিবেকবর্জিত চার কুচক্রী গিরি (ভবতোষ দেওয়ান)-প্রকাশ (প্রীতি কুমার চাকমা)-দেবেন (দেবজ্যোতি চাকমা)-পলাশ (ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান) এই মহান নেতাকে হত্যা করে সেদিন যে অপরিসীম ক্ষতিসাধন করেছিলো তা জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখোমুখি জুম্ম জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সেদিন সেই বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীরা জুম্ম জাতির অগ্রদূতকে হত্যা করে জুম্ম জাতির লড়াইয়ের হাতিয়ার পার্টিকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং জুম্মদের জাতীয় জীবনে ভ্রাতৃঘাতী ঘৃণা ও বিভেদের বিষাক্ত বীজ বপন করেছিল। যার অশুভ ও বিপর্যয়কর পরিণতি জুম্ম জাতিকে আজও বহন করতে হচ্ছে। যে মানুষটি ঘুমন্ত ও অচেতন জুম্ম জাতিকে জাগিয়েছিলেন, জুম্ম জাতির অন্ধকার জীবনে আলোর মশাল জ্বালিয়েছিলেন, হিংসা-বিদ্বেষের বিপরীতে যিনি মানবতার জয়গান গাইতে চেয়েছিলেন সে মহান মানুষটিকেই হত্যা করতে পারলো ষড়যন্ত্রকারীরা! ধিক তাদের! জুম্ম জাতির সকল ঘৃণা বর্ষিত হোক তাদের উপর!

চার কুচক্রী এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করলেও তাঁর দর্শন ও বিপ্লবী চেতনাকে ধ্বংস করে দিতে পারেনি। মানুষ ও মানবতার জন্য যে দর্শন ও চেতনা, তার কোন ধ্বংস নেই। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ষড়যন্ত্রকারীরা এম এন লারমাকে হত্যা করলেও তার চিন্তা-চেতনা ও দর্শনকে হত্যা করতে পারেনি, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তির সূচাগ্রও ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। বরঞ্চ যত দিন যাচ্ছে ততই এম এন লারমার আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং সেই আলোতে মানুষ উজ্জীবিত ও পুলকিত হচ্ছে। বিপরীতে বিভেদপন্থী, ষড়যন্ত্রকারীরা, এম এন লারমার হত্যাকারী চার কুচক্রী ও তাদের দোসররা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে দিন দিন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। ঘাতকরা সেদিন এম এন লারমাকে হত্যা করে আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইলেও এম এন লারমার যোগ্য উত্তরসূরী, সহযোদ্ধা ও পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে হত্যা করতে পারেনি। তাঁরই নেতৃত্বে পার্টি আবারও ঘুরে দাঁড়াতে এবং সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাঁর নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরে সক্ষম হয়।

দুই.

অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এরপরও যেন কেউ কেউ ইতিহাস থেকে, ১০ নভেম্বর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তাই আজও আমরা সেই জাতিবিধ্বংসী ষড়যন্ত্রকারী, বিভেদপন্থী ও জিঘাংসায় মত্ত ঘাতকদের দেখতে পাই নানা রূপে, নানা ঢঙে। এরা মূলত চার কুচক্রীদেরই অশুভ প্রেতাত্মা, নতুন সংস্করণ। তাদের মুখে জনগণ ভোলানো নানা কল্পকাহিনী, ছলছাতুরী, অভিযোগ আর অজুহাত। কিন্তু কার্যত জাতিবিধ্বংসী বিভেদ, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, জিঘাংসা, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের এ সমস্ত কর্মকান্ড জুম্ম জাতিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আর পিছুটান ছাড়া আর কিছু উপহার দিতে পারেনি। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর নানা বাস্তবতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও বিচক্ষণতা দিয়ে জাতীয় স্বার্থে সন্তু লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১৯৯৭ সালে যে চুক্তি করে, সেই চুক্তিকে বিরোধীতা করে কল্পলোকের গালগল্প 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' এর ধুয়ো তুলে ১৯৯৮ সালে অশুভ যাত্রা করে তথাকথিত 'ইউপিডিএফ'। চুক্তি সম্পাদনের পর, তার যাত্রার ১২/১৩ বছরে এই ইউপিডিএফ তার 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' এর বিন্দু-বিসর্গও দেখাতে পারেনি। বিপরীতে আবার বিভেদ, ষড়যন্ত্র, হত্যা, ঘৃণা, অপহরণ, চাঁদাবাজি দিয়ে জুম্ম জাতিকে করেছে ক্ষতবিক্ষত, দিয়েছে দুর্বিসহ এক জীবন। আর চুক্তির বাস্তবায়নকে বারবার টেনেছে পেছনের দিকে এবং চুক্তি

বাস্তবায়নের আন্দোলনকে করেছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অপরদিকে বিগত সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জরুরী অবস্থার ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে এবং নিজেদের ক্ষমতালোভকে চরিতার্থ করার মানসে পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে ও শিশুসুলভ অজুহাত তুলে পার্টিরই কতিপয় সদস্য শুরু করে নতুন এক বিভেদের ফাঁদ। তারা আজ পরিচিত তথাকথিত সংস্কারপন্থী হিসেবে। এরাও আজ জুম্মদেরকে বিভক্ত করতে চাইছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নকে অত্যন্ত কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আজকের এই ১০ নভেম্বরকে পালন করতে গিয়ে এ সমস্ত নব্য বিভেদপন্থীদের ব্যাপারে জনগণকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ও চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে এসব প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে।

তিন.

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আজ চৌদ্দ বছর হলো। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পুনর্গঠন করা হলেও তা কার্যকরকরণে কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আবার চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোর কোন কোনটি একেবারেই বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তি বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা, আর সরকারের সদিচ্ছার অভাবের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ কখনো ভালোভাবে এগুতে পারেনি। ফলে জনগণ সত্যিকার অর্থে এখনও চুক্তির সুফল ভোগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি আবার জটিল থেকে জটিলতর অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশেষ করে শ্বাসরুদ্ধকর জরুরী অবস্থার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জুম্ম জনগণ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিকামী মানুষ আবার আশাবাদী হয় এবার বুঝি চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে যাবে ও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মিলবে। এই সরকারের বয়স তিন বছর অতিক্রান্ত হতে চললো, কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের কোন উল্লেখযোগ্য কাজ এখনো দেখা যায়নি। বিপরীতে দিন দিন চুক্তিবিরোধী নানা তৎপরতা এবং জুম্মদের ভূমি বেদখল, জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, জুম্ম নারী ধর্ষণের মত ঘটনা অব্যাহতভাবে ঘটে চলেছে। অপরদিকে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা এই সরকার ঘটা করে সংবিধান সংশোধন বা সংবিধানকে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক করার নানা ঘোষণা সত্বেও শেষ পর্যন্ত সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতা আর অগণতান্ত্রিকতাকে পাকাপোক্ত করা হয়। আর অনেক দাবী-দাওয়া সত্বেও আদিবাসীদের জাতি হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়', এমনকি বাঙালী হিসেবে পরিচিত করানো হয়। যা দেশের সকল আদিবাসী জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এমনি এক পরিস্থিতিতে জুম্ম জনগণ আজ ১০ নভেম্বর প্রতিপালন করছে। কাজেই ১০ নভেম্বরকে সার্থক করার জন্য জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল প্রকার বিভেদ, ষড়যন্ত্র, জাতিবিধ্বংসী কর্মকান্ড রুখে দাঁড়িয়ে এম এন লারমার আদর্শে আরো সজ্জিত হয়ে তারই উত্তরসূরী সন্তুলারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে সমবেত হতে হবে এবং জুম্ম জনগণের অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য দুর্বার আন্দোলন রচনা করতে হবে। মহান নেতা এম এন লারমা, লও লও লাল সালাম। জনসংহতি সমিতির জয় অনিবার্য। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।

১০ই নভেম্বরের বিশ্বাসঘাতকতা ও তার নব্য সংস্করণঃ ষড়যন্ত্রের নানা রূপ

উদয়ন চাকমা

আজ থেকে আটাশ বছর আগের সেই রক্তাক্ত ঘটনা। বিভৎস কালো রাত্রি। শোকবহ ১০ই নভেম্বর। বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল সমগ্র জুম্ম জাতিকে। অধিক শোকে পাথর হয়েছিল বিশ্বের মুক্তিকামী নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের বিবেক। এই দিনে বিভেদপন্থী, জাতীয় কুলাঙ্গার, বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, জুম্ম জনগণের একমাত্র পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর আটজন সহযোদ্ধাসহ নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। বিভেদপন্থীদের এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে সমগ্র জুম্ম জাতিসহ বিশ্বের অধিকারকামী জনগণ যেমন হতবাক হয়েছিল, তেমনি সংগ্রামরত জুম্ম জনতা এসব জাতীয় বেঈমানদের ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করেছিল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

যুগ যুগ ধরে জুম্ম জনগণ সামন্ততান্ত্রিক, উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশের শাসনামলে ক্রমাগত শাসন-শোষণের ফলে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যখন চরম সংকটে পর্যবসিত হতে থাকে এবং নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যখন তাদের অধিকার লুণ্ঠিত হতে থাকে তখন মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা হাজির হন জাতীয় মুক্তির মন্ত্র নিয়ে এবং সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত করে তুলেন ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে। তাঁর দূরদর্শী, সুদক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অধিকার হারা জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন যখন এগিয়ে যেতে থাকে দুর্বার গতিতে এবং আন্দোলন যখন হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য, ঠিক সেই মুহূর্তে পার্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুবিধাবাদী, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু ভবতোষ দেওয়ান (গিরি)-প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ)-দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন)-ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) চার কুচক্রী উপদলীয় চক্রান্তের মাধ্যমে পার্টির মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনীর একের পর এক আক্রমণে যখন বিভেদপন্থী চক্ররা কোণঠাসা হয়ে পড়ে তখন তারা সমঝোতার আহ্বান জানায়। এক পর্যায়ে 'ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া' নীতির ভিত্তিতে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমঝোতা হওয়া সত্ত্বেও বিভেদপন্থী চক্র ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর ভোর রাতে বিশ্বাসঘাতকতামূলক এক অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মর্মান্তিকভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও চিন্তাধারা আমরা ধারণ করে চলেছি। তাঁর সংগ্রামী আদর্শ ও চেতনা ধারণ করে জুম্ম জনগণ অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে।

শোক থেকে চেতনার স্ফুরণ

গৃহযুদ্ধের শুরুতে দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনীর মধ্যে কেউ মেনে নিতে পারেনি নৃশংস গৃহযুদ্ধকে। কেউ চাইনি ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি, জুম্ম দিয়ে জুম্মকে হত্যার বিভৎস ধ্বংসলীলা। তাই গৃহযুদ্ধের শুরুতেই কর্মীবাহিনীর মধ্যে দেখা দেয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। গৃহযুদ্ধের উদ্ভব নিয়ে ছিল নানাবিধ প্রশ্ন ও সংশয়। বিশেষ করে যাদের নিয়ে এক সাথে থেকেছে খেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে কারোর মন সাঁয় দিতে চাইনি। যে অস্ত্র এতদিন ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে তাক করা, যে অস্ত্র এতদিন শত্রুর বুক ঝাঁঝড়া করে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে সেই অস্ত্র দিয়ে স্বজাতীয় ভাইয়ের বুক ঝাঁঝড়া করে দিতে চাইনি কেউ। দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনী তাই ছিল বরাবরই ঐক্যের পক্ষে এবং বিভেদপন্থা ও উপদলীয় চক্রান্তের বিপক্ষে। তাই 'মা করা ভুলে যাওয়া' নীতির ভিত্তিতে যখন সমঝোতা সম্পাদিত হয় তখন কর্মীবাহিনী খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠে। ঐক্যবদ্ধভাবে আবার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিন্তু তাদের সেই ঐক্যের স্বপ্ন বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। যাদের রক্তের শিরায় শিরায় ছিল বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের চক্রান্তে ভরা, তাদের পক্ষে ঐক্য-সংহতি কিংবা 'ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া' নীতি ছিল নিছক ছেলেখেলা। তাই সমঝোতার আবেগে ভাসতে না ভাসতে কর্মীবাহিনীকে হতবাক করে দেয় ১০ই নভেম্বরের রক্তাক্ত বন্যা।

গৃহযুদ্ধ যেমন মেনে নিতে পারেনি দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনী ও মুক্তিকামী জুম্ম জনতা, ততধিক মেনে নিতে পারেনি বিভেদপন্থী চক্রদের সেই বিশ্বাসঘাতকামূলক আক্রমণ ও জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা এম এন লারমাকে নির্মমভাবে হত্যার ষড়যন্ত্রকে। এ নির্মম নৃশংস ঘটনার ফলে কর্মীবাহিনী একাধারে শোক ও চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। গভীর শোকে যেমনি হয় মর্মাহত, তেমনি চেতনার স্ফুলিঙ্গে জ্বলে উঠে সমগ্র কর্মীবাহিনী। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধারণ কর্মীবাহিনীর কাছে অধিকতরভাবে উন্মোচিত হয় বিভেদপন্থীদের নৃশংসতা ও ষড়যন্ত্র। সাধারণ জুম্ম জনতা বুঝতে পারে

বিভেদপন্থীদের সস্তা শ্লোগান ও গালভরা বুলি। ফলে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয় কেটে উঠে কর্মীবাহিনী ও জনগণ বিভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১০ই নভেম্বর ঘটনার মধ্য দিয়ে কর্মীবাহিনীর মধ্যে স্ফূরিত চেতনার এতই তীব্রতা ছিল যে বিভেদপন্থীদের উপর ঢেউয়ের আকারে একের পর এক আক্রমণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে এবং বিভেদপন্থীরা দ্রুত কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বিভেদপন্থী চক্রবাহিনী খোঁজ পেলে পার্টির কর্মীবাহিনী কোনরূপ মরণ তোয়াক্কা না করে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত ক্রমাগত ধাওয়া করতে থাকে। এমনকি বিভেদপন্থী চক্রবাহিনী মনে করে কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদেরও ধাওয়া করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফলে সম্বিত ফিরে পাওয়া সংগ্রামী জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আত্মত্যাগের চেতনায় টগবগে ফুটে উঠা কর্মীবাহিনী কর্তৃক চার কুচক্রীর সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ দ্রুত নিরসন করা সম্ভব হয়ে উঠে। কর্মীবাহিনী ও জনগণের এই চেতনার স্ফুলিঙ্গ সমগ্র গৃহযুদ্ধকে ছাপিয়ে গিয়ে গৃহযুদ্ধ-উত্তর সরকার বিরোধী আন্দোলনকেও বেগবান করে তুলে।

গৃহযুদ্ধ-উত্তর দুর্বার আন্দোলন ঃ ১০ নভেম্বরেরই চেতনার ফসল

ক্ষমতা লিপ্সায় মদমত্ত হয়ে সর্বোপরি আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করার লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের খপ্পড়ে পড়ে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র পার্টির মধ্যে বিভেদপন্থা ও উপদলীয় চক্রান্তে লিপ্ত হয়। কিন্তু মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করেও বিভেদপন্থী ও তাদের দোসরদের সেই হীন আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ হয়নি। আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি তারা। এম এন লারমার আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে পার্টি আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে ১০ই নভেম্বরের মর্মান্তিক শোক জাতীয় চেতনায় রূপান্তরের ফলে, সর্বোপরি কর্মীবাহিনীসহ সমগ্র জুম্ম জনতার মধ্যে চেতনার স্ফুলিঙ্গ গড়ে উঠার ফলে। ১০ই নভেম্বরের নৃশংস হত্যাকান্ড কর্মীবাহিনীকে এমনভাবে দৃপ্ত চেতনায় উজ্জীবিত করে তুলে যা গৃহযুদ্ধ-উত্তর সরকার বিরোধী আন্দোলনে সুদূর প্রসারী ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

গৃহযুদ্ধের ফলে পার্টির মধ্যে ব্যাপক শক্তি ক্ষয় হলে পার্টির নতুন নেতৃত্ব কর্তৃক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে বেগবান করা ও দুর্বার গতিতে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে কিনা এ নিয়ে দ্বিধা-সংশয় ছিল অনেকের। কিন্তু গৃহযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর পরই সেনাবাহিনীসহ সরকারের সকল অপশক্তির উপর একের পর এক আঘাত করতে পার্টি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সফল হয়। ফলে আন্দোলনের গতি লাভ করে দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য। এক পর্যায়ে সরকার ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। সরকার এই চুক্তি স্বাক্ষরে সহজে এগিয়ে আসেনি। সশস্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এবং দেশ-বিদেশের প্রবল জনমতের চাপে পড়ে সরকার এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে পার্টি নেতৃত্বের বিচক্ষণতা এবং জুম্ম জনগণের মধ্যে অটুট ও দৃঢ় সংগ্রামী চেতনার ফলে। এই চুক্তিতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের চিরাচরিত মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় এবং বিধান করা হয় এই মর্যাদা সংরক্ষণের। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসন প্রবর্তনের বিধিব্যবস্থা করা হয় চুক্তিতে। এছাড়া জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার এ চুক্তিতে স্বীকৃতি লাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বা পার্বত্য শান্তিচুক্তি নামে সমধিক পরিচিত এই চুক্তি জুম্ম জনগণের জাতীয় ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক অর্জন।

নব্য চক্র ইউপিডিএফ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিরোধিতা করে জুম্ম জনগণের মধ্যে এক নব্য চক্রের উত্থান ঘটে। তারা মুখে তথাকথিত 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' এর কথা বললেও তাদের মূল কাজ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থনকারীদের হত্যা ও অপহরণ করা এবং ব্যবসায়ীসহ সাধারণ জুম্ম জনগণের কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে অবাধে চাঁদা আদায় করা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

তারা দেশে-বিদেশে জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য অপপ্রচার চালায় যে, "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে এবং সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে" ইত্যাদি। তারা আরো বলে যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তাই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে সর্বাগ্রে খতম করতে হবে।" পরবর্তীতে তারা শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রে 'ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' নামে একটি সংগঠন গঠন করে সন্ত্রাসী কার্যক্রম অবাধে চালাতে থাকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চুক্তি সমর্থনকারীদের অব্যাহতভাবে হত্যা ও অপহরণ করতে থাকে। তথাকথিত 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' আদায়ের জন্য তাদের সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করতে দেখা

যায়নি। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থনকারীদের হত্যা ও অপহরণ করা এবং ব্যবসায়ীসহ সাধারণ জুম্ম জনগণের কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে অবাধে চাঁদা আদায় করা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ তার জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি জনসংহতি সমিতির ৭৯ জন সদস্যসহ তিন শতাধিক জুম্মকে হত্যা করেছে। তারা জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকেও অন্ততঃ তিনবার হত্যার প্রচেষ্টা চালায়।

তারা জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী তাদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য দেশের শাসকগোষ্ঠীর সাথে গাঁটছড়া বাঁধে। এমনকি তারা জুম্ম জনগণের চরম বিরোধীতাকারী দেশের মৌলবাদী শক্তির সাথে আতাঁত গড়ে তুলতে দ্বিধাবোধ করেনি। তার অংশ হিসেবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের (২০০১-২০০৬) উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জুম্ম-বিদ্বেষী আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং-এর সাথে আতাঁত করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং-এর সাথে আতাঁত করে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে দুর্বল ও নস্যাৎ করতে মরিয়া হয়ে উঠে।

ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ সাধারণ মানুষকে অপহরণ, হত্যা, চাঁদাবাজি প্রভৃতি সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে সাধারণ মানুষ অতীষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে ইউপিডিএফ বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে কঠিন প্রতিরোধের মুখোমুখী হচ্ছে এবং বিভিন্ন এলাকায় চরম কোণঠাসা অবস্থায় বিরাজ করছে। '৮৩-এর চার কুচক্রীর মতো সস্তা শ্লোগান দিয়ে জুম্ম জনগণ তথা বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তারা। চার কুচক্রী যেমন দ্রুত নিষ্পত্তির সস্তা শ্লোগান দিয়ে সাময়িক কালের জন্য কর্মীবাহিনী ও জনগণের একটা ক্ষুদ্রাংশকে বিভ্রান্ত করেছিল, তেমনি ইউপিডিএফ নামধারী এই নব্য চক্রও 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' এর সস্তা শ্লোগান দিয়ে ছাত্র-যুব সমাজ ও জুম্ম জনগণের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশকে বিভ্রান্ত করে প্রতি বিপ্লবী অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিন বিদেশী অপহরণ এবং মুক্তিপণ বাবদ কোটি কোটি টাকা আদায়ে যেমন সরকারের একটি বিশেষ মহল ইউপিডিএফ'কে সহায়তা করেছিল, তেমনি বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই সন্ত্রাসী সংগঠনকে ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে সরকারের ঐ বিশেষ মহলও তার প্রতিদান শোধ করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভোটার তালিকা দিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে সরাসরি আঘাত হেনেছে।

জরুরী অবস্থার সময়ও ইউপিডিএফের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চুক্তি সমর্থনকারীদের হত্যা ও অপহরণ ও ব্যবসায়ীসহ সাধারণ জুম্ম জনগণের কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে অবাধে চাঁদা আদায় করা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম আরো জোরদার হয়ে উঠে। জরুরী অবস্থাকে ব্যবহার করে ইউপিডিএফ তার সশস্ত্র সদস্যদের দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের হত্যা ও অপহরণসহ সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় স্থানীয় সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন ইউপিডিএফের অবাধে সশস্ত্র তৎপরতা চালাতে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে। একদিকে নিরাপত্তা বাহিনী জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের ধর-পাকড় করে, অন্যদিকে পার্টির সাংগঠনিক ঘাঁটিগুলোতে ইউপিডিএফের সশস্ত্র অনুপ্রবেশে প্রত্যক্ষ মদদ প্রদান করে। জরুরী অবস্থার সুযোগে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ডেকে ডেকে তাদের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়, অন্যথায় তাদেরকে হত্যার হুমকি দেয় ও ভিটেমাটি ত্যাগে বাধ্য করে।

এভাবে ইউপিডিএফ ও শাসকগোষ্ঠীর একটি বিশেষ মহলের মধ্যে লেজে গোবরে সম্পর্ক গড়ে উঠে। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে ততই ইউপিডিএফের ভাঁওতাবাজির লেবাস জানতে জুম্ম জনগণের আর কোন কিছু বাকী নেই। জুম্ম জনতার মাঝে যেমন তাদের হীন মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে তেমনি জুম্ম জনতা প্রতিটি স্থানে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

ইউপিডিএফ তার সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধিতার জন্য জন্ম থেকেই দেশে-বিদেশে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। একসময় গ্রামে গ্রামে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়লে এবং নিজেদের বৈধতা আদায়ের জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে সমঝোতার প্রস্তাব দেয়। আর জুম্ম জনগণের একটি সুবিধাবাদী মহল থেকেও ইউপিডিএফের এই 'সমঝোতা' প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের নাচন শুরু করে। বস্তুতঃ যাদের জন্মই হচ্ছে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিভেদপন্থার মধ্য দিয়ে, তাদের সাথে কতটুকু পরিমাণে সমঝোতা হতে পারে বা সমঝোতার স্থায়িত্ব কতটুকু হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবুও আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে ইউপিডিএফের সাথে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করা হয়। সমঝোতা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে খাগড়াছড়ির নারানখিয়ায় অনন্ত বিহারী খীসার বাড়ীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৈঠকে ইউপিডিএফ ও জনসংহতি সমিতির সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সমঝোতার ১২ ঘন্টার মাথায় ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ির দাঁতকুপ্যা এলাকায় সুখেন্দু বিকাশ চাকমা নামে জনসংহতি সমিতির একজন নিরীহ

প্রত্যাগত সদস্যকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ থেকে আরেক বার প্রমাণিত হলো ষড়যন্ত্র ও বিভেদকামীদের সাথে সমঝোতার কোন সুযোগ নেই। এম এন লারমা তাঁর জীবন দিয়ে তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। সুখেন্দু বিকাশ চাকমাও তার জীবন দিয়ে ষড়যন্ত্র ও বিভেদকামীদের বিশ্বাসঘাতকতা কি ধরনের হতে পারে তা আরেকবার জুম্ম জনগণকে স্মরণ করে দিয়ে গেছেন।

দেশে-বিদেশে প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে ইউপিডিএফ সাম্প্রতিক কালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতি সমর্থনের কথা বলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে একসাথে আন্দোলন করারও প্রস্তাব দিচ্ছে। তারা একদিকে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতি সমর্থনের কথা বলছে আর অন্যদিকে একই সুরে প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে। একদিকে চুক্তির প্রতি সমর্থনের কথা বলা আর অন্যদিকে চুক্তির মাধ্যমে বেঈমানী করার অভিযোগ চরম দুমুখো নীতি ও ভাঁওতাবাজিরই বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছু নয়। যাদের প্রচারপত্রে আগাগোড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধিতা এবং জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতি সমর্থন করার প্রচারনা দেশ-বিদেশের জনমত বিভ্রান্ত করার কৌশল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। আর ইউপিডিএফের সমঝোতার ছল-চাতুরীকে কেন্দ্র করে জুম্ম জনগণের কতিপয় ব্যক্তি যে নাচন শুরু করেছে তাদের হয় গোটা বিষয়টা রাজনৈতিকভাবে দেখার দুরদর্শীতার অভাব রয়েছে নতুবা স্রেফ সুবিধা আদায়ের জন্য তার এই প্রলাপ বকে চলেছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধিতা করে ইউপিডিএফ জুম্ম জনগণের মধ্যে যে বিভেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে এবং যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ একযুগেরও অধিক সময় ধরে জুম্ম জনগণের উপর হানাহানি চাপিয়ে দিয়েছে তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? একযুগের পর চুক্তির পক্ষে কথা বলে ইউপিডিএফ কি সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারবে?

সংস্কারপন্থী খ্যাত ক্ষুদে দলবাদী চক্র

বহুল আলোচিত ১/১১ এর পর দেশে জরুরী অবস্থা জারী হলে পার্টি সংগঠনের চরম দুর্দিনে পার্টির কতিপয় নেতা-কর্মীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী চরিত্র ভেসে উঠে এবং শাসকগোষ্ঠীর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। বলাবাহুল্য, ১/১১ এর কুশিলবরা জরুরী অবস্থার সুযোগে এবং জরুরী অবস্থাকে ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে চিরতরে ধ্বংস করা এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্যে মিথ্যা ও সাজানো মামলায় জড়িত করে ও অস্ত্র গুঁজে দিয়ে জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গসংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের উপর ব্যাপকভাবে গ্রেফতারী অভিযান চালানো হয়। পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ানসহ কমপক্ষে ২৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের মধ্যে অনেককে অতি স্বল্প সময়ে নিষ্পন্ন প্রহসনমূলক বিচারে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে পার্টির সভাপতিসহ শতাধিক সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথা মামলা দায়ের করা হয়। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় সেনা ক্যাম্প কর্তৃক পার্টির স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে জনসংহতি সমিতির সদস্যপদ ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ প্রদান করা হয়। অন্যথায় ক্রশ ফায়ারে হত্যা, মামলা-মোকদ্দমা, চরম নিপীড়ন-নির্যাতনের মুখোমুখী হতে হবে বলে হুমকি দেয়া হয়।

সারাদেশের তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্কারের অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামেও সংস্কারের বিশেষ মহল 'মাইনাস সন্তু লারমা' তত্ত্ব এবং পার্টির কতিপয় উচ্চভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থান্বেষী নেতৃস্থানীয় সদস্যের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে ষড়যন্ত্রের নীল-নক্সা হাতে নেয়। একদিকে জেল-জুলুমের ভয়ে, অন্যদিকে ক্ষমতার লোভে মদমত্ত হয়ে পার্টির কতিপয় নেতৃস্থানীয় সদস্য শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ বাহিনীর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে পার্টির সভাপতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার শুরু করে। এসব সুবিধাবাদী ও আদর্শচ্যুত সদস্যরা তাদের মতামত ও অভিযোগ পদ্ধতিগতভাবে তুলে না ধরে পার্টি গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলা-পরিপন্থীভাবে যত্রতত্র প্রচার করে কর্মী বাহিনী ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার হীনতৎপরতা চালাতে থাকে। এই গোষ্ঠীর চিহ্নিত কতিপয় সদস্য এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদ লাভে মরিয়া হয়ে উঠে।

দেশে জরুরী অবস্থাকে ব্যবহার করে যখন শাসকগোষ্ঠী পার্টির নেতৃত্ব ও সংগঠনের উপর একের পর এক নির্মম দমন-পীড়ন চালাচ্ছিল এবং তৎকারণে পার্টির নেতৃত্ব ও সংগঠন ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পর্যবসিত হচ্ছিল সেই অবস্থায় তারা ক্ষুদে দলবাদী হয়ে বিভেদপন্থা অবলম্বন করে এবং তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্কারের হীনকর্মসূচীতে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, আদর্শ-বিচ্যুত এই রূপায়ণ-সুধাসিন্ধু নেতৃত্বাধীন ক্ষুদে দলবাদী গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদসহ শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছিষ্ট লাভের উদগ্র লোভে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পার্টি প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারাভিযান চালায়।

আর ইউপিডিএফের সাথে এই সংস্কারপন্থীদের সমঝোতাও তথৈবচ। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংসের জন্য

ইউপিডিএফ সাময়িকভাবে সংস্কারপন্থীদের সুযোগ দিয়েছে। বস্তুতঃ তারা এখনো কোন ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মসূচীতে উপনীত হতে পারেনি। বস্তুতঃ উপনীত হওয়ার মতো তাদের মধ্যে সেই রাজনৈতিক ভিত্তি থাকারও প্রশ্ন উঠে না। এমনকি সংস্কারপন্থীদের অবাধে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রেও ইউপিডিএফ সংস্কারপন্থীদের নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

আবারো স্ফুরণ ঘটুক ১০ই নভেম্বর চেতনা

বর্তমানে জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে চলছে এক কঠিন সংকট। সংকটের মধ্য দিয়ে চলমান পরিস্থিতিতে আজ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চরম হুমকির মুখে বিরাজ করছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বর্তমান মহাজোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসছে না। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে নস্যাৎ করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম বর্তমানে অতি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অপরদিকে জাতীয় জীবনে চলছে গৃহযুদ্ধের মতো আরেক আভ্যন্তরীণ সংকট। '৮৩-এর সেই বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের মতো বিভেদপন্থা গ্রহণ করে প্রসিত-সঞ্চয়-রবিশংকর চক্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ সাধারণ জুম্মদের অপহরণ, হত্যা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অবতারনা করেছে এই অনাকাঙ্ক্ষিত জাতীয় সংকট। আর বিভেদপন্থার সর্বশেষ সংস্করণ রূপায়ণ-সুধাসিন্ধু নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত আদর্শচ্যুত স্বার্থান্বেষী কতিপয় সদস্য জনগণকে বিভ্রান্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত ও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ফলতঃ '৮৩ এর গৃহযুদ্ধের মতো জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয়েছে হানাহানি ও রক্তক্ষরণ। এমনিতর এক কঠিন পরিস্থিতিতে ১০ই নভেম্বরের চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়ে সকল প্রকার বিভেদপন্থী চক্রান্ত মোকাবেলা ও নির্মূল করা ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নেই। তাই '৮৩ গৃহযুদ্ধের মতো গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলে বিভেদকামীদের সকল সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক তৎপরতা সমূলে উৎপাটন করা আশু করণীয় হয়ে পড়েছে।

আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম। জুম্ম জনগণের চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে যাবেই। বিগত সময়ে অধিকারকামী সংগ্রামী জুম্ম জনগণ জনসংহতি সমিতির আপোষহীন নেতৃত্বে কর্মীবাহিনীর সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে সকল ধরনের প্রতি-বিপ্লবী কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। গৃহযুদ্ধের মতো কঠিন প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকেও সমূলে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। তাই সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইস্পাত-কঠিন জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে হবে।

ধিক্কার জানাই চার সংস্কারপন্থী চক্রদের

শ্রী এস বোস

আজ ১০ নভেম্বর ২০১১ সাল। জুম্ম জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণিত, নিন্দিত ও ধিক্কৃত একটি কলঙ্কিত শোকাবহ অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৮৩ সালের এই দিনে জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, অধিকারকামী জুম্ম জনগণের কান্ডারী ও মুক্তিপথের দিশারী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অবিসংবাদিত বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ আটজন সহযোদ্ধা আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত গৃহযুদ্ধে এবং জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামে এযাবৎ যাঁরা নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই সকল শহীদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও লাল সালাম। আর অপরদিকে আততায়ী, বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রকারী, ক্ষমতা উচ্চাভিলাষী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চার কুচক্রীসহ তাদের অনুগামী সকল জাতীয় বেঈমান ও কুলাঙ্গারদের জানাই ঘৃণা ও ধিক্কার।

বলাবাহুল্য, ১৯৮৩ সালের বিভীষিকাময় গৃহযুদ্ধে জুম্ম জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল, সেই ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের তিক্ত অভিজ্ঞতা তৎকালীন বহু নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণের অন্তরে গেঁথে রয়েছে। প্রত্যেক বছর এইদিনে গৃহযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেউ কেউ আবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁদেন, আবার বেদনা স্পর্শী স্মৃতিসহ গৃহযুদ্ধের নির্মম-নিষ্ঠুর তান্ডবতা তুলে ধরে অন্যদেরকেও কাঁদান। কেউ কেউ অনেকেই লেখালেখির মাধ্যমে কর্মীবাহিনীর কাছে ও জাতির সামনে গৃহযুদ্ধের তান্ডবতা তুলে ধরেছেন। ভবিষ্যতে যাতে আর কোন গৃহযুদ্ধ বা ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের অবতারনা ঘটতে না পারে, সে বিষয়ে উপলব্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য দিয়ে এসেছেন। চক্রান্তকারী বিভেদপন্থীদের প্রতি ঘৃণা, নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে গৃহযুদ্ধের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে কর্মীবাহিনীকে ও জনগণকে অধিকতর সচেতন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সে ধরনের কতিপয় নেতার বক্তব্যের ফুলঝুরি এখনো আমার কানে বাজে। এমন শোকাবহ দিনে অত্যন্ত বেদনা কাতর কণ্ঠে বলে উঠতেন যে, "সংগ্রামী বন্ধু, ভাই ও বোনেরা আমার, আমরা আর দ্বিতীয়বারের মত গৃহযুদ্ধ চাই না। ভ্রাতঘাতী সংঘাত চাই না।" এভাবে যাঁরা বক্তব্য দিতেন এবং কেউ কেউ সাহিত্য রসে রসালো লেখালেখি করতেন; আসলে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাদেরই কয়েকজন আবার একই কায়দায় বিভেদের ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। তাদেরকে কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের প্রেতাত্মায় পেয়ে বসে। তারাও চারজন রূপায়ন, সুধাসিন্ধু, চন্দ্রশেখর, তাতিন্দ্র পাটির সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘদিন লালিত ও কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পুরণ করতে হলে সন্তু লারমাকে সরাতে হবে। তাই তারা একটি উপযুক্ত সময়-সুযোগ ক্ষণের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকল।

২০০৭ সালের ওয়ান ইলেভেনে (১/১১) জরুরী অবস্থা জারী হলো। জরুরী অবস্থার ঝড়ঝাপটায় সবকিছু যেন উলট-পালট ও তছনছ। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি, সন্ত্রাস দমন ও নির্মূলীকরণের নামে তথাকথিত সংস্কার কার্যক্রম। চারিদিকে শুধু সংস্কারের শ্লোগান। সারা দেশে যৌথবাহিনীর অভিযানে ধর-পাকড়, গ্রেপ্তার, জেল-জুলুম ও নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও হয়রানিমূলক কর্মকান্ডে এক ভয়ঙ্কর ও বড়ই নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ফলে এতদিন যারা যে সময়-সুযোগের প্রতীক্ষায় ঘাপটি মেরে প্রহর গুনছিল, তারা ইত্যবসরে খুবই তৎপর হয়ে উঠল। তারা দলীয় আদর্শ বিসর্জন ও কর্তব্য-কর্মে ফাঁকি দিয়েই জরুরী আইনের ঝড়-ঝাপটার ধকল থেকে নিজেকেও বাঁচাতে আর পার্টির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান সন্তু লারমাকে স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত ও নানা মিথ্যে অপবাদ দিয়ে তাঁকে পার্টির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করে নিজেদের সংস্কারের দাবীতে শ্লোগান তুলে ধরে। তারা ভেবেছিল যে, জরুরী আইনের ঝড়-ঝাপটায় ওলট-পালট হয়ে সন্তু লারমা শেকড়শুদ্ধ উপড়ে পড়ে মাটিতে হেলিয়ে-লুটিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু না...। সন্তু লারমার বুদ্ধিমত্তা, দুরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, জনপ্রিয়তা, সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং কুটকৌশলের কারণে তারা তাঁকে তাঁর কর্তব্য-কর্ম ও আদর্শস্থান থেকে একচুল পরিমাণও সরাতে পারেননি। সন্তু লারমার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। তিনি বরাবরই পার্টির নীতি-আদর্শ ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আন্দোলনের কর্মসূচী সামনে রেখে নেতৃত্বদানে ও কর্তব্য-কর্মে নিবেদিত। তাই তিনি জরুরী আইনের ঝড়-ঝাপটায় এবং ক্ষমতালোভী, উচ্চাভিলাষী, স্বার্থপর ও চরম সুবিধাবাদী, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক চার ক্ষুদে দলবাদী সংস্কারপন্থীদের নানা অপবাদে বিচলিত হননি। তিনি বরাবরই কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলিয়েছেন, পার্টিকে সামলিয়েছেন, রক্ষা করেছেন এবং পার্টির নেতৃত্বকে সঠিক দিশা দিতে পেরেছেন।

পক্ষান্তরে দেখা গেল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের বিশেষ একটি মহলের মদতে চার কুচক্রীর উত্তরসূরী সংস্কারবাদীদের শ্লোগান- "ওয়ান মাইনাস, টু প্লাস ফরমূলা"। অর্থাৎ সন্তু লারমাকে হটিয়ে, জিনপরী-প্রেতাত্মা মিলে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে তারা

রাজত্ব করবে। এইতো ছিল তাদের মনোবাসনা। কিন্তু ...না। মনোবাসনা পূরণ হলোনা। যেহেতু ক্ষমতার যে হরির লুট, তা করতে পারেনি। তবে ক্ষমতার নতুন মেরুকরণ ও সংস্করণ ঘটালো। সেটি কি রকম? তা হলো এই- "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (এম এন লারমা)" গঠন করে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করল। নিজেদেরকে এম এন লারমার আদর্শের অনুসারী হিসেবে দেখাতে নিজেদের সংগঠনের পেছনে এম এন লারমার নাম সেটে দিল। কি জঘন্য ষড়যন্ত্র! জুম্ম জনগণের ঐক্যের প্রতীক মহান নেতা এম এন লারমার মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে টানাহেচড়া করে দিল এই নব্য বিভেদপন্থীরা। যে এম এন লারমা সমগ্র জুম্ম জাতিকে একই কাতারে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন সেই এম এন লারমাকে সংগঠনের লেজে সেটে দিয়ে ক্ষুদে দলবাদের নেতা বানানো হলো। এম এন লারমার আদর্শের প্রতি ক্ষুদে দলবাদীদের কি অনুপম শ্রদ্ধাঞ্জলি! গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র জীবন্ত এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করেছে আর সংস্কারপন্থী খ্যাত ক্ষুদে দলবাদীরা শহীদ এন এম লারমাকে নিয়ে দিগবাজি খেলায় মেতে উঠেছে।

সংস্কারপন্থীদের দিগবাজী শুধু এম এন লারমা, কর্মীবাহিনী বা জনগণকে নিয়ে নয়। রয়েছে তাদের মধ্যেও ক্ষমতার টানাটানিতে নানা চালবাজি! অনেকটা সেয়ানে সেয়ানে লড়াই! কেউ কারো চেয়ে কম নয়। তারা এতই যোগ্যতা রাখেন যে, একক আহ্বায়ক নয়, দু'জন যুগ্ম আহ্বায়কই রেখে তাদের করতে হলো আহ্বায়ক কমিটি। যোগ্যতার বিচারে রূপায়ণ ও সুধাসিন্ধু কারোর চেয়ে কেউ কম নয়। উভয়ে সমানে সমান। ক্ষমতার প্রশ্নে কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজী নয়!

আজ যারা তথাকথিত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নামে লড়াই-সংগ্রামের ভান-বনিতা করে নানা রকম ছলচাতুরী করে জুম্ম জনগণের উপর অন্যায়-অবিচার নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছে, জাতিকে ধ্বংসের দিকে ও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে; সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসুন, তাদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করি, তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলি। তাদের সকল অপরিণামদর্শী অপতৎপরতা বন্ধ করি এবং বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সফল করি- এই হোক সংগ্রামী জুম্ম জনতার অঙ্গীকার।

সেই জাতীয় বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক, সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী ক্ষুদে দলবাদী সংস্কারপন্থী ও চুক্তিবিরোধী দালাল-প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবীরা নিপাত যাক! জুম্ম জনতা মুক্তি পাক।

অবিস্মৃত স্মৃতির পাতায় প্রয়াত নেতা এম এন লারমা

সুদত্ত চাকমা

অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারিত কথাগুলো সযত্নে মনে গেঁথে নিচ্ছিলাম। আমাদের চলমান আন্দোলন থেকে শুরু করে বিরাজমান বিশ্ব ব্যবস্থা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভূ-রাজনীতি, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থান, তৎকালীন তৃতীয় বিশ্বের তাঁবেদারী নীতি, দুনিয়া জুড়ে নিপীড়িত জাতিগুলোর মুক্তি সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কোনটাই বাদ যাচ্ছিল না। আলোচনার স্রোতধারায় সমতলের আদিবাসী জনজাতি সাঁওতাল, গারো, হাজং, মণিপুরী ও মুন্ডা জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্ব সংকট ও সংগ্রামের কথাও এসে পড়ছিল। প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের মেহনতী মানুষ, কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের লড়ে যাওয়া বীরত্ব কাহিনী যেন ফল্গুধারার জীবন্তরূপ নিয়ে একে একে আমার মানসপটে আছড়ে পড়ছিল। পদ্মাসনে বসা নেতাপ্রবর তাঁর স্বভাব-সুলভ ভাব-ভঙিমায় বলে যাচ্ছিলেন সেসব সংগ্রামী কাহিনী। মাঝে মাঝে বাঁধ সাধছিলাম তত্ত্বগত ব্যাখ্যা চেয়ে। শিক্ষকের শিক্ষক তো বটেনই। আমার হস্তক্ষেপে বিরক্ত বোধ না করে বরং আরো সহজ ও সাবলীলভাবে কার্য-কারণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে দিন সন উল্লেখ করে কৌতুহল মিটিয়ে দিচ্ছিলেন। ১৯৭৮ সালের জুন মাসের ক'টা দিন এভাবে কাটছিল প্রিয় নেতার সান্নিধ্যে।

'তা ফিরছো কবে?' সহকর্মী সেক্টর রাজনৈতিক সচিবের প্রশ্নের জবাবে- 'এই গেলাম আর এলাম' বলে সে যে একমাস ধরে হেঁটে সদর দফতরে আসাটা কি মাটি করতে পারি? ওৎ পেতে থাকতাম দাপ্তরিক কাজের অবসরে কখন একটু উনার সাথে বসা যায়। আর কেউ না হোক, উনি কিন্তু আমার সে মতলব সম্পর্কে ভালো সমঝদার ছিলেন। অতএব প্রতিদিন প্রত্যাশিত সময়গুলোতে ঠিকই ডাক পড়তো।

একদিন দক্ষিণাঞ্চলে বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টির সদস্যদের সাথে সংঘাতের কথাও আলোচনায় উঠে এলো। জানতে পেলাম, দেশ-বিভাগের পর 'পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটি' নামে পূর্ব পাকিস্তানে যে একমাত্র সাম্যবাদী দল ছিল তা কালক্রমে নানা ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি নামে একাংশের আবির্ভাব হয়। বাংলাদেশের জেলাগুলো স্ব স্ব অবস্থান অনুযায়ী তারা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং একে অপরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কারণ একের দৃষ্টিতে অন্যেরা হয় সংশোধনবাদী না হয় অন্য কোন মতবাদী যা আদৌ বৈপ্লবিক নয়। স্যারের মতে, ওরা আর যাই হোক অন্ততঃ আমাদের শত্রু হতে পারেনা।

দুই পরাশক্তির প্রবল পরাক্রমের ঝুঁকি এড়াতে তখনকার জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে দক্ষিণ এশিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। আলাপচারিতায় উঠে এলো ভারতের ইন্দিরাজী আর বঙ্গবন্ধুর কথা। লোভ সামলাতে পারছিলাম না বঙ্গবন্ধুকে তিনি কেমন দেখেছিলেন সে সম্পর্কে জানতে। তাঁর এমএলএ ও এমপি জীবনে তৎকালীন পাকিস্তান ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনেকের সাথে তাঁর দিন কেটেছিল। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে তিনি কেমন দেখেছিলেন আর কেমন পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে একরাশ কৌতুহল নিয়ে প্রসঙ্গ টেনে বললাম- "স্যার, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে কি হতো জানিনা। তবে ১৯৭৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারীতে তাঁর রাঙ্গামাটি সফরকালীন ভাষণ রীতিমতো জুম্ম জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়েছিল। তিনি সদম্ভে বলেছিলেন- '...মনে রাখবেন, সে সমতলের ছেলে হোক বা সমুদ্রপারের ছেলে হোক কিংবা গিরি উপত্যকার ছেলে হোক, সে যদি বিদেশে যায় তাহলে তার একমাত্র পরিচয় হবে- সে বাঙালী। ...ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আপনাদেরকে উপজাতি করে রেখেছিল; পাকিস্তান আপনাদেরকে উপজাতি করে রেখেছে; আর আমি আপনাদেরকে জাতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছি। আজ থেকে আপনাদের জাতীয়তা হবে- বাঙালী।' বঙ্গবন্ধুর মুখে ঐ উক্তি কতটুকু মানানসই ছিল তা প্রকাশ করার ভাষাজ্ঞান না থাকলেও অনেকের মতো আমার কানের সাথে ঐ ধরনের উক্তি বনাবনি হচ্ছিল না বলে চলে এসেছিলাম। ভাবলাম বজ্রকণ্ঠের সেই একাত্তোরের ডাকে আমাদের কচি হৃদয়ের ধমনীতে যে উষ্ণরক্তের জোয়ার এনে দিয়েছিল বুঝিবা মুহূর্তের মধ্যে সে জল শুকিয়ে সমস্ত হৃদয় যেন সাহারা করে দিল। স্যার, এই তো ছিল আমাদের অনুভূতি।

আমার কথাগুলো উনি মন দিয়ে শুনছিলেন। এক সময় বললেন- "...পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি পুঁজিপতি তথা মুৎসুদ্দী শ্রেণীর মধ্যে যে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব চলছিল তার অনিবার্য ফসল হলো বাঙালী জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং চূড়ান্ত পরিণতি হলো স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। বাঙালী জাতীয়তাবাদ এখনো সংকীর্ণতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলার আপামর জনগণের নেতা আর শ্রেণীগত বিচারে তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার উঠতি পুঁজিবাদী ও মুৎসুদ্দী শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি। কিন্তু 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' মনোভাবাপন্ন পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিপক্ষ প্রাসাদ রাজনীতির আশ্রয়ে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করে ফেললো। এটা একটা নির্জলা খুনের অপরাধ এবং দেশদ্রোহীতার চরম নিদর্শন।'

এই বলে তিনি খানিকটা থেমে গেলেন। বুঝিবা তাঁর চোখের কোণ অশ্রুবাষ্পে ভরে উঠছিল। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল সেই কালোরাতের কালো কাহিনী। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অন্ধকার রাতে বঙ্গবন্ধুর হত্যালীলা এবং ঢাকার মসনদে সামরিক শাসকের খবরদারীর সংবাদ সারা বাংলাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। নিথর পাহাড় জুড়ে এক অশনি সংকেত যেন বয়ে গেল। সবাইকে তাক লাগিয়ে আমাদের অবিসংবাদিত নেতা এম এন লারমার চোখ সজল হয়ে উঠলো। বিস্ময়েরও বিস্ময়, সেদিন তিনি দু'বেলা আহার করেননি। নেতার এই বিশেষ অনুভূতির কথা জিজ্ঞেস করার মতো কারোর বুকের পাটা ছিলনা। ছিল কেবল গুমোটধরা নির্বাক বিস্ময়।

তিনি বলা শুরু করলেন আর আমার মধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যায় তাঁর প্রতিক্রিয়ার পর্দা যেন খসে পড়লো। তিনি বলতে থাকলেন- "...মহান সংসদে দাঁড়িয়ে যখন বাধ্য হয়ে বলতে হলো, ...আমি এবং আমার চৌদ্দগোষ্ঠী চাকমা নামে পরিচিত; ...কিভাবে জাত্যান্তর সম্ভব, মাননীয় স্পীকার রুলিং দেবেন কি? সংসদ জুড়ে ছিল তাচ্ছিল্যের বাতাবরণ। একসময় গলা শুকিয়ে এসেছিল, একগ্লাস জল চেয়েছিলাম বলে বিদ্রুপের হাসিতে ফেটে পড়ছিলো গোটা সংসদ। বঙ্গবন্ধুকে দেখলাম, উনি গালে হাত রেখে আমার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন।" এই বলে তিনি এমন একটা ভাব করলেন যার ভাবার্থ করা যেতে পারে, এই সেই তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংসদ আর সদ্য স্বাধীন জাতির গণতান্ত্রিক চর্চা!

নীরবতা ভেঙে উনি বললেন- "ব্যক্তি শেখ সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক খুবই মধুর। তিনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন, স্নেহও করতেন। তিনি রাঙ্গামাটিতে আসলে আমি প্রেটোকল দিতে গেলাম। রেষ্ট হাউসে উনি আমাকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, কিছু মনে নিওনা। আমি শুনলাম, তোমার ভাই সন্তু লারমা নাকি শান্তিবাহিনী না কি একটা বাহিনী গঠন করছে?' আমি বললাম, 'এ আবার কি কথা! আমার ভাই তো হাই স্কুলের টিচার। উনি তো চাকরীতে আছেন বলেই জানি।' উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ও আচ্ছা, আচ্ছা, সেরকম কিছু না হলেই হলো।' তারপর বললেন- 'দেখো, তোমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বলি। তুমি তো স্বায়ত্তশাসন দাবী করছো। ধরো গিয়ে তা তুমি পেলেনা, শেষে তুমি কি করবে? ধরা যাক তুমি অস্ত্র তুলে নিলে। তোমার তুলনায় বাংলাদেশ আর্মি শক্তিশালী। তুমি কি পারবে পরাজিত করতে? কে তোমাকে সাহায্য দেবে? ভারত তো বাংলাদেশের বন্ধু। আর বার্মা? ধরে নিলাম বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে বার্মা তোমায় সাহায্য দেবে। আমি ১০ ডিভিশন সেনা নিয়ে বার্মা বর্ডার শীল্ড করে দেবো। কোথায় পালাবে তুমি? আর যাই করো তুমি ঐ লাইনে চিন্তা-ভাবনা করোনা। জানো তো যুদ্ধ কতো ভয়াবহ, কতো নির্মম। তোমার গ্রাম পুড়বে। পাহাড়ী মেয়ের গর্ভ থেকে বাঙালীর বাচ্চা বের হবে। আরো কত কিসব হতে পারে। কাজেই ও পথে পা বাড়িওনা।'- এই ছিল শেখ সাহেবের উপদেশ বা পরামর্শ। তবে তিনি স্বায়ত্তশাসনের কথা কানে তুলতে না পারলেও স্নেহ আর প্রলোভন দেখানোতে কোন ঘাটতি রাখেননি। তার প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কোন কমতি ছিলনা। রাজনৈতিক মতপার্থক্য আর বয়সের তফাৎ আমাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধাশীলতায় কখনো চিড় ধরাতে পারেনি। তাঁকে হারিয়ে জাতি আজ রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে গেছে।"

রাজনৈতিক মতাদর্শগত, নীতিগত বা কৌশলগত পার্থক্য থাকতে পারে, পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থান সত্ত্বেও একজন নেতা অন্য এক নেতার প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল হতে পারেন তা' বঙ্গবন্ধুর প্রতি মহান নেতা এম এন লারমার প্রগাঢ় অনুভূতি থেকেই উপলব্ধি করতে পারা যায়। তাঁরা জীবন দিয়ে সে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

অন্য একসময় আমাদের আন্দোলন নিয়ে আলাপচারিতা চলছিল। উনি তত্ত্বের আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান এবং আমাদের সংগ্রামের নীতি কৌশল সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ফুটে উঠছিল আন্দোলন অনেক সময় নেবে। দেশে তাঁবেদারী সামরিক জান্তার শাসন চলছে এবং চলতে থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলো ম্রিয়মান। অতএব গণতন্ত্র সুদূর পরাহত। তিনি সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলছিলেন যে, "আমাদের আন্দোলনকে সামষ্টিক চরিত্র সম্পন্ন করতে না পারলে অধিকার আদায়ের পথ সুগম হবেনা। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতিদের দিয়ে হবেনা, সব জাতিসত্তাগুলো একত্রীভূত করতে হবে। এজন্যে কর্মীদেরকে আরো ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং ইস্পাত-কঠিন মনোবল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের বিভিন্ন জাতিগুলোর মধ্যে শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিকাশ বড়ই অসম। কাজেই এক নির্দিষ্ট সময় পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার সুষম বিকাশ আশা করা যায়না।" তিনি জোরালোভাবে বললেন- "তোমরা সব জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জীবনপ্রণালী, প্রথা ও রীতিনীতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল থেকো। হোচিমিন ভিয়েতনামের গেরিলাদের জন্য তিনটি নীতি বেঁধে দিয়েছিলেন। তা হলো- (১) এক সঙ্গে থাকা, (২) এক সঙ্গে কাজ করা ও (৩) এক সঙ্গে বসে আলাপ করা। বিশেষতঃ বহু জাতি অধ্যুষিত এলাকায় এ নীতির কড়াকড়ি অনুশীলন করতে হবে। জনগণের বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করতে হলে সুখে ও দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের পক্ষে বোঝা হতে পারে এমন কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবেনা। দেখবে, একসময় তারা তোমাদেরকে ঠিকই আপন করে নেবে। এভাবে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎকর্ষসাধন করা যাবে।"

একবার প্রসংগক্রমে তিনি একটা স্বগঃতোক্তি করেছিলেন- "আমরা তো আন্দোলনে আছি। এ হাতিয়ার কার হাতে তুলে দেবো?" কথাটার গুরুত্ব বোঝার মতো উপস্থিত কারোর ব্রেইন সঠিক ফ্রিকোয়েন্সিতে ছিলনা। অনেকটা বোকা বোকা লাগছিল নিজেদেরকে। পরক্ষণে যা বলেছিলেন তা হলো- আন্দোলনে উত্থান-পতন অনিবার্য। সুবিধাবাদী চরিত্র ডানে বা বাঁয়ে ছিটকে ফেলতে পারে। ক্ষমতার প্রতি উচ্চাভিলাষ যে কাউকেই জাতিদ্রোহী করে তুলতে পারে। অনুরূপ বাস্তবমুখী বাস্তবতার সাথে আত্মমুখী প্রস্তুতি না থাকলে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করা যায়না। ফলে হতাশায় পড়ে অথবা সংকীর্ণ স্বার্থের কারণে যে কেউ অ-বৈপ্লবিক ও পার্টি বিরোধী কর্মকান্ড ঘটাতে পারে। প্রয়াত নেতার এ স্বগঃতোক্তি যে নীরেট কথার কথা ছিলনা তা অনেকে পরে অপরিমেয় ক্ষতি স্বীকারের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং সময় সন্ধ্যে ৭ টা ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর। ছোট্ট একটা ইউনিট নিয়ে সদর দপ্তর থেকে ডাক নিয়ে পৌছেছিল। খুশীর জোয়ারে ভাসছিল সবায়। কর্মীদের ব্যক্তিগত চিঠি বিলি হচ্ছিল। অনেক দিন পরে প্রিয়জনের চিঠি পড়া যাবে। দাপ্তরিক চিঠিতে ডুবে গেলাম। এখনো সেই নির্মম বাস্তবতা প্রত্য করতে হচ্ছে। প্রয়াত নেতার সাথে এই ছিল আমার শেষ দেখা। বর্ষা জোরে নামবে বলে ফেরার প্রস্তুতি শেষ করে রওনা হলাম আমার এলাকার উদ্দেশ্যে।

সময় সন্ধ্যে ৭ টা ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর। ছোট্ট একটা ইউনিট নিয়ে সদর দপ্তর থেকে ডাক নিয়ে পৌছেছিল। খুশীর জোয়ারে ভাসছিল সবায়। কর্মীদের ব্যক্তিগত চিঠি বিলি হচ্ছিল। অনেক দিন পরে প্রিয়জনের চিঠি পড়া যাবে। দাপ্তরিক চিঠিতে ডুবে গেলাম। এতসবের মধ্যেও স্বভাবজাত অভ্যাসের বশে একজন বিবিসির খবর শুনছিল। বোধকরি তার নামে কোন চিঠি ছিলনা। ভল্যুম বাড়াতেই স্পষ্ট পুরুষ কণ্ঠে ভেসে এল সেই দুঃসংবাদ। '...নেতা মানবেন্দ্র লারমা নিহত হন।' নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। অতএব খবরের সত্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। ডাকবাহী ইউনিটের সদস্যরা কোন তথ্যই দিতে পারলোনা। তারাও হতবাক। ভীষণ শূন্যতা অনুভূত হলো। হই হট্টগোল উবে গিয়ে পিন পতনের নিস্তব্ধতায় সন্ধ্যারাতের সন্ধিণকে ভারী করে তুলেছিল। আমার কেবল কানে বাজছিল সেই স্বগঃতোক্তি, 'এ হাতিয়ার কার হাতে তুলে দেবো???'

প্রয়াত নেতার নেতৃত্বে নির্ধারিত অন্যতম রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল সাংবিধানিক অধিকার অর্জন করা। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বারের মাধ্যমে সে ল্য খানিকটা অর্জিত হয়েছে। দীর্ঘ আড়াই দশকের রক্তক্ষয়ী আন্তঃসংঘাতেরও অবসান ঘটেছে। চুক্তির আলোকে প্রণীত হয়েছে (ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ও (খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধন)। চুক্তি ও এ আইনগুলোর ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তিত হয়েছে 'বিশেষ শাসনব্যবস্থা'। বিরাজমান ভূমি সমস্যার নিষ্পত্তি বিধানের জন্য প্রণীত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ যার মূলে বলা আছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান ভূমি সমস্যা পার্বত্য আদিবাসীদের প্রথাগত আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি বিধান করা হবে। এ চুক্তির অন্য আর এক বাস্তবতা হলো- চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনায়কেরা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক (ইউনেস্কো) শান্তি পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তৎকালীন এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের। গড়িমসি করে এ দায়িত্ব এড়ানো যাবেনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে এটাই এখনকার রাজনৈতিক কর্মসূচী।

পাহাড়ের পথে জীবনের গান গেয়ে যাই

সঞ্জীব দ্রং

আমি যখন সাপ্তাহিক খবরের কাগজে 'আদিবাসী মেয়ে' কলাম লিখতাম নব্বই দশকের শুরুতে, তখন বেশির ভাগ কলাম ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে। তখন শান্তিবাহিনী তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে খুব কম খবর ছাপা হতো সে সময় জাতীয় পত্রিকায়। তখন পত্রিকা বলতে সংবাদ, ইত্তেফাক, আজাদ ও দৈনিক বাংলা। সম্ভবত বাংলার বাণীও ছিল। আমি পাহাড়ী তরুণদের রাডার পত্রিক' পেতাম। পরবর্তী সময়ে সেটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, রাডার পত্রিকায় যারা লিখতেন, বেশির ভাগই ছদ্মনামে লিখতেন। তখন পাহাড়ে সময় ভালো ছিল না। যারা ওই কঠিন সময়েও রাডার বের করেছিলেন, নিশ্চয় খুব সাহসী কাজ করেছেন তারা। সবার ছোট ছোট অনেক কাজের সম্মিলিত ফল আজকের তরুণ সমাজ ভোগ করছে। তাই আজো আমরা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র কথা বলি। জাতীয় সংসদের তাঁর বাহাত্তর সালের বক্তৃতাগুলো অনেকেই নানা জায়গায় তুলে ধরেন।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থাপনের পর স্বাভাবিকভাবে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করা আমার মতো অনেকের স্বপ্ন ছিল নতুন কিছু করার। ওই সময়েই আজকের কাগজ পত্রিকা বের হয়। তাদের সাপ্তাহিকের নাম ছিল খবরের কাগজ। তাতে আমি লিখি প্রতি সপ্তায় একটি করে কলাম আর ধানমন্ডিতে খবরের কাগজের অফিসে যাতায়াত করি। সে সময় খবরের কাগজে বিখ্যাত সব মানুষেরা লিখতেন। এমনকি ওপার বাংলা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আবুল বাশার, শিবনারায়ণ রায়, তারাপদ রায় প্রমুখ লিখতেন। অন্নদা শংকর রায়ের কিছু লেখাও আমি দেখেছি সে সময় কাগজে। যারা সেই সময় খবরের কাগজ নিয়মিত পড়তেন নিশ্চয় তাদের সেসব কথা মনে পড়বে।

তখন কত বড় স্বপ্ন বুকের মধ্যে। অনেকেই তখন আমার লেখা পড়তেন। তাদের কেউ কেউ চিঠি লিখতেন পত্রিকা অফিসে। সেইসব চিঠিও ছাপা হতো। দেখে ভালোই লাগতো। আমি চিঠিগুলো কাটিং করে রাখতাম। ছোটোখাটো একটি বই হয়ে যাবে সেসব চিঠি ছাপালে। সেই সময় আমার একটি কলাম বেরিয়েছিল, "চাকমা মেয়ের চলে দেখে দুঃখ পায় চাকমা ছেলেরা।" এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হলো। অনেক চিঠি ছাপা হতে থাকলো চিঠিপত্র পাতায়। এটি ১৯৯৫ সালের কথা। ১৯৯৫ সালের জুন মাসের ৬ তারিখ আমি জগন্নাথ হলের পূর্ববাড়ি ভবনের ৩২০ নং কক্ষে গিয়েছিলাম। তখন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের লালন কান্তি চাকমা, মার্কেটিংয়ের সুজ্ঞান চাকমা, লোক প্রশাসন বিভাগের বিপ্লব চাকমা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র শ্যামল বিকাশ চাকমা, আইইউবিএটি'র ছাত্র সুমিত্র খীসার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাদেরই অনুরোধে ওই কলামটি লিখেছিলাম। ওই কলাম নিয়ে সুন্দর বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা বিতর্ক হয়েছিল। আমি তখনি আমার কলামে চাকমা মেয়েকে 'আদিবাসী' মেয়ে হিসেবেই লিখেছি ১৯৯৫ সালেও। বেশ কয়েকজন বাঙালি খবরের কাগজে চিঠি লিখেছিলেন তখন।

পরে দৈনিক আজকের কাগজেও আমি নিয়মিত লেখা শুরু করলাম। সে সময়ই আমি আমার কলাম "তুই যদি ভালো গোরমেন, তবে আমাদের এত কষ্ট কেন" লিখেছিলাম। আমার এই লেখালেখির খবর চলে গেলে আমার বহু বছর আগে স্বেচ্ছা অবসরে চলে যাওয়া স্কুল শিক্ষক বাবার কাছে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে। সেখানে পত্রিকা যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। জীবনে বেশ কয়েকবার দেশান্তরী হওয়া পিতা স্বাভাবিকভাবেই সন্তানের মঙ্গল চেয়ে চিঠি লিখলেন আমাকে আমি যেন বাস্তবতাকে মেনে নিই। আদিবাসী সংখ্যালঘু মানুষের কষ্টকে নিয়তি হিসেবে মেনে নেই। বাবা এও লিখলেন, "তোমার মতো বাংলায় এত কঠিন ভাষায় তো আগে কেউ এদেশে আদিবাসীদের জন্য লিখেনি। তাই কষ্ট হলেও সংখ্যালঘু মানুষের নিয়তি মেনে নিয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকো।" ওই সময় আমার একটি কলাম বেরিয়েছিল "সরকার চায় আদিবাসী মেয়ে দুঃখে থাকুক।" কলামে লিখেছিলাম, "সরকার চায় আদিবাসী মেয়ে দুঃখে থাকুক, না খেয়ে মরে যাক, বসতবাটি থেকে চিরতরে উচ্ছেদ হোক, বহিরাগতরা দলে দলে গিয়ে পাহাড়-জমি-নদী-বন সব দখল করে নিক, দীঘিনালার পথে যেতে যেতে লাঞ্ছিত হোক পাহাড়ী মেয়ে এবং অবশেষে আত্মহত্যা করুক। যুগে যুগে শাসকশ্রেণী এই-ই চেয়েছে আদিবাসীদের নিয়ে।" প্রায় ১৭ বছর আগে আমি এই রকম লিখেছিলাম আমার কলামে, ভাবলে অবাক লাগে। এই কলামে মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের কথা আমি বলেছিলাম। কলামের শেষে একটি কবিতার উদ্ধৃতি ছিল, "ওদের বিচারে মাগো দেশকে ভালোবাসা প্রচন্ড দেশদ্রোহিতা, ওদের বিচারে শোষণ-মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করাটা মর্মান্তিক বে-আব্রু বে-আইন, ওরা আজ তাই আমাদের হত্যা করছে রাজপথে, জনপথে, ধানক্ষেতে-মিলগেটে-অলিতে-গলিতে।" বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এইসব আবৃত্তি শুনতাম। এটি খুব কঠিন কবিতা হয়ে গেল আমার নরম মনের পিতার জন্য। তবুও আমি লিখতে থাকলাম। গ্রামে বাড়ি গেলে বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম কেন আমি লিখি। তিনি ভেতরে ভেতরে অজানা আশংকায়

বিপদের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। পরবর্তীতে রাতে তিনি কখনো শান্তিতে ঘুমাতে পারতেন না। সাউন্ড স্লিপ যাকে বলে, আমার বাবার জীবনে তা কখনো ঘটেনি।

মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন তার বিখ্যাত বিরসা মুন্ডা উপন্যাসে, "আদিবাসীরা তখনি বিদ্রোহ করে যখন বাইরের লোক এসে আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেয়, জঙ্গল কেটে আদিবাসীরা যেসব জমি তৈরি করে চাষবাস করছে, তাদের যখন সে-জমি থেকে ছলেবলে-কৌশলে উচ্ছেদ করা হয়। বনজ সম্পদ, যেমন কাঠ, মধু, ফল, পাতা, কন্দ জোগাড় করে জীবন চালানো, পশুপাখি মেরে খাওয়া, এসব অধিকার যখন চলে যায়। যখন মহাজনরা নিরক্ষর ও সরল, আইনের মারপ্যাচ না জানা আদিবাসীদের ঋণের জালে বেঁধে ফেলে। যখন আদিবাসীদের এলাকায় খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ এসব নেবার জন্য বড় বড় শিল্প আর ব্যবসা গড়ে ওঠে। কিন্তু তা থেকে যত টাকা আসে, তার কিছুই আদিবাসী অঞ্চলের লোকজনের উন্নতির জন্য খরচ হয় না। যখন আদিবাসীদের সস্তায় কুলি খাটানো হয়, আর সে কাজও তারা সব সময়ে পায় না বলে দূর দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়। যখন তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্প সবকিছু একদিকে অবহেলা করা হয় আর অন্যদিকে তাদের ওপর অন্যরকম ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয়। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী সমাজের বাইরের মানুষদের উদ্দেশ্য করে আবার লেখেন, সিংভূম-রাঁচিতে কখনো কোনো মুন্ডা গ্রামে কি তুমি গেছ যখন শীতকালে সন্ধ্যায় আগুন জ্বেলে গোল হয়ে সবাই বসে, আর গান গায়? যদি তোমাকে দেখে ওরা গান না থামায়, তবে জানবে যে তোমাকে ওরা শত্রু মনে করে না। যদি তেমন সৌভাগ্য তোমার হয়, তাহলে তুমিও শুনতে পাবে এই গানটি। এটি কিসের গান? উলগুলানের গান। বিদ্রোহের গান।"

২০০৩ সালে প্রথম আলো'তে আমার দেশহীন মানুষের কথা কলামে আমি লিখেছিলাম, আমার মনে হয়, একটি 'জুম দেশে'র স্বপ্ন দেখতেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, মহাপুরম গ্রামের এক অসাধারণ যুবক। আমি এখনও বিশ্বাস করি, তাঁর মতো করে সাধারণ জুমিয়া মানুষের জন্য তেমন করে কেউ ভাবেননি, জুমিয়া কৃষকের দুঃখ তাঁর মতো করে কাউকে স্পর্শ করেনি। চিরবঞ্চিত জুম্ম জনগণের ওপরে শাসকশ্রেণীর বিরামহীন শোষণ তাঁকে যেন বিচলিত করে তুলেছিল। তাঁর বুকের গভীরে মানুষের মুক্তির জন্য লড়াইয়ের স্বপ্ন ছিল, দৃঢ় আদর্শ ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি চেয়েছিলেন একটি শোষণহীন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে, যেখানে পাহাড়ী মানুষেরাও মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে। কী চেয়েছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা? জন্মভূমি পাহাড়ে অরণ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার? আর এখন?

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির একযুগের বেশি সময় চলে গেল। এক যুগ দীর্ঘ সময় মানুষের জীবনে। শাসকশ্রেণী সহজে পাহাড়ী মানুষের মুক্তি দেবে না। বরং শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনার পালা দীর্ঘতর হতে থাকবে। আজ আবার সেই সময়ের মতো, 'রাডার' যুগের তরুণ দল দরকার, যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল বুক তুলে দাঁড়াবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর একদল তরুণ পাহাড়ী নানাদেশে ছড়িয়ে গেছেন। অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি নিয়েই গেছেন প্রায় একশ' জন। ওরা ফিরে এসেছেন কেউ কেউ, বাকীরা পথে আছেন। ওদের যে কী বিশাল দায়িত্ব পাহাড়ের ভবিষ্যতের জন্য, তা আমি কেমন করে বলি।

শহীদ মনির

লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা

১৯৫৮ সালে কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের কারণে পাহাড়ে এবং পাহাড়ী আদিবাসী মানুষের সার্বিক জীবনে পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনে। হাজার হাজার আদিবাসী মানুষ উদ্বাস্তু হয়। শত শত বছরের প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে এবং বন্য হিংস্র জীবজন্তুর সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই সংগ্রাম করে চেঙ্গী, মেয়োনী ও কর্ণফুলী উপত্যকায় আদিবাসী মানুষের জনপদ গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তান সরকার হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে লক্ষাধিক পাহাড়ী আদিবাসী নিজ বাস্তুভিটা ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ধানের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। এই জনপদগুলি শুধুমাত্র নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়নি, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দিক থেকে চরম সংকটের মুখোমুখি হয়। এ রকম একটি মানবিক বিপর্যয় কাঁধে নিয়ে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি থানার কাচালং ভেলীতে নতুন পাহাড়ী জনপদের পত্তন শুরু হয়। বিজাতীয় বিদ্বেষ ও রাষ্ট্রীয় রোষাণলে দগ্ধ আদিবাসী মানুষের একটি অংশকে এই বাঘাইছড়ি থানার উপর দিয়ে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে বয়ে যাওয়া কাচালং নদীর দু'কূলে সরকারী উদ্যোগে রিজার্ভ ফরেস্টে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। নামে মাত্র ক্ষতিপূরণে পুনর্বাসিত আদিবাসী মানুষেরা নতুন করে জঙ্গল পরিষ্কার করে বন্য হাতী, বাঘ, ভালুক, শুকর ও বিষধর সাপের সাথে লড়াই করে আবার নবজীবন আরম্ভ করে, যেমনটি আদিকালে মানুষ জীবন জীবিকা নির্বাহের প্রথা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তোলে। পুনর্বাসিত এই মানুষেরা কঠোর পরিশ্রম করে বিশ বছরের মধ্যে কাচালং ভ্যালীকে মানুষের বাস উপযোগী করে তোলে, যা অনুসরণীয়। অতি অল্প সময়ে এই আদিবাসী মানুষগুলি তাদের অতীতের উৎপাদন বিষয়ক সকল অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কাচালং ভ্যালী এই জনপদকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম বাঁধা ও বিপত্তিকে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, আবার নূতন করে জীবন শুরু করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ, বাঘাইছড়ি থানার কাচালং ভ্যালীর এই নূতন জনপদ। এই জনপদের প্রতিটি নর-নারী পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী ভূমিকা রাখে।

১৯৭৪ সালের ২২ নভেম্বর আমি জোন কম্যান্ডারের দায়িত্ব (শান্তিবাহিনীর সামরিক অঞ্চল) প্রাপ্ত হয়ে গুইমারা জোন হতে বাঘাইছড়ি জোনের নূতন এই জনপদে আসি। এই বাঘাইছড়িতে আমি অনেক আগে ছোট কালে আত্মীয় কুটুমের বাড়ীতে দু'তিনবার আসি। তখনকার বাঘাইছড়ির সাথে বর্তমান বাঘাইছড়িকে তুলনাই করা যায় না। যেন আকাশ-পাতাল ফারাক! নূতন জনপদ হলেও বাঘাইছড়ি থানা অন্যান্য ভেলীর জনপদের তুলনায় কোন অংশে পিছিয়ে নেই। বরং কোন কোন দিক থেকে নজর কাড়ার মতো অগ্রসর। বাঘাইছড়ি এই জনপদের একটি গ্রাম। বাঘাইছড়ি নামে ছড়ার নামের অনুকরণে বাঘাইছড়ি গ্রামের নাম। আবার এই ছড়ার নামেই বাঘাইছড়ি থানার নাম। বাঘাইছড়ি গ্রামের অবস্থান নূতন জনপদের ঠিক মাঝখানে। এই গ্রামের মানুষেরা লংগদু থানার বরকলক গ্রাম থেকে কাপ্তাই বাঁধের উদ্বাস্তু হয়ে বাঘাইছড়িতে চলে আসে। বরকলক গ্রামে তাদের এম ই স্কুল ছিল। তাদের 'শিক্ষা চেতনা' কাপ্তাই বাঁধের পানিতে বিসর্জন না দিয়ে সাথে করে নিয়ে আসেন। বাঘাইছড়ি গ্রামে প্রাইমারী ও জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রী। 'শিক্ষা চেতনা'র উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতায় আজ বাঘাইছড়ি একটি উচ্চ শিক্ষিত মানুষের গ্রামে পরিণত হয়েছে। গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে একটি নীরব প্রতিযোগিতা ছিলো- কে বেশী ছেলে-মেয়েদের আরও শিক্ষিত করতে পারে। প্রান্তিক গরীব কৃষক পরিবারগুলি পর্যন্ত তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যার্জন থেকে বঞ্চিত করতো না। বাঘাইছড়ি গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে প্রশস্ত জায়গায় প্রাইমারী ও জুনিয়র হাইস্কুল এবং দুই স্কুলের মাঝ বরাবর ফুটবল খেলার বড় মাঠ। মাঠের পূর্ব ও উত্তর পার্শ্বে ছোট ছোট দোকানের সারি। এই গ্রাম ও অন্যান্য গ্রামের লোকজন সকাল ও বিকাল বেলায় নিজেদের উৎপাদিত শাক শবজি, মাছ ও মাংস বিক্রয় করতে আসেন। প্রত্যেকদিন মাঠে ফুটবল খেলা হয় এবং গ্রামের সকলে খেলায় অংশগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত পাঠ দান ছাড়াও বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া গ্রামে একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক দল ছিলো। সুদিন মাসে ফসল ঘরে তোলার পর এই সাংস্কৃতিক দল যাত্রাগানের আসর বসায়। বাঘাইছড়ি এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে চিত্ত বিনোদনের জন্য যাত্রার আসরে প্রচুর লোকের সমাগম হতো।

গ্রামে একটি ক্লাব ছিল। সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীরা এই ক্লাবের সদস্য ছিল। কল্যাণমূলক কাজসহ ক্রীড়া অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতো। অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এই ক্লাবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। বাঘাইছড়ি গ্রামের এরকম সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে গড়ে উঠা কাচালং ভ্যালীর শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ মনির এই বাঘাইছড়ি গ্রামের ছেলে। তার আসল নাম বুদ্ধ রঞ্জন চাকমা। বরকলক গ্রামে তার জন্ম হলেও সেই বাল্যকাল, বিদ্যাভ্যাস শুরু এই বাঘাইছড়ি গ্রামে। সে গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করে মারিশ্যা মডেল টাউনের কাচালং হাইস্কুলে ভর্তি হয় এবং ১৯৭৪ সালে এই স্কুল থেকে এস এস সি পাশ করে।

মা-বাবার সাত ছেলে-মেয়ের শহীদ মনির তৃতীয় সন্তান। নিম্ন মধ্যবিত্ত হওয়া সত্বেও বাবা সুধীর কুমার চাকমা ও মা লতজবা দেবী তাঁদের অন্যসব ছেলেমেয়েদের কমবেশী লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। শহীদ মনির (বুদ্ধ রঞ্জন) এস এস সি পাশ করার পর রাঙ্গামাটি সরকারী মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন সার্বিক পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হচ্ছিলো। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতিকে আরও এক ধাপ অবণতির দিকে ঠেলে দেয়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ নেয়।

কর্মসূত্রে সমগ্র বাঘাইছড়ি থানার প্রতিটি গ্রামে সাংগঠনিক কাজে আমাকে দিনের পর দিন সফর করতে হয়েছে। এই থানার প্রতিটি গ্রাম ছিল আন্দোলনের এক একটি দুর্গ। এই দুর্গগুলি অপরাজেয় ও অভেদ্য করার লক্ষ্যে প্রতিটি নরনারীকে সংগঠন ভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ করার কাজে মনোনিবেশ করি এবং আমার যৌবনের সমস্ত শক্তিকে নিংড়ে দিয়েছি তাদের জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনার বীজ অংকুরোদগম করার জন্য। বাঘাইছড়ি থানার সর্বস্তরের জনগণ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে সত্যি সত্যি আন্দোলনের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-সংগ্রাম করেছিলো এবং শত শত ছাত্র-যুবক সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো। বাঘাইছড়ি গ্রাম ও সেই আন্দোলনের মহাযজ্ঞে সামিল হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

আমি বাঘাইছড়ি গ্রামে যতবার এবং যখনি গিয়েছি ততবারই লক্ষ্য করেছি, গ্রামের নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রী সকলে অতি আগ্রহভরে অঙ্গ-সংগঠনগুলির কাজে এগিয়ে আসে। গ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব অত্যধিক শক্তিশালী ছিল। বয়ঃবৃদ্ধ নেতৃত্বের ব্যক্তিরা প্রথমে এসে দেখা করতেন। সমাজের এবং সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সমাধানের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা করতেন। দেশ-বিদেশের সামগ্রীক পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনে কতটুকু ছাপ ও প্রভাব ফেলছে না ফেলছে- ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিতেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা চাইতেন। তাঁদের জানার আগ্রহ মিটলেই তবে তারা বাড়ীতে ফিরতেন। অনেক সময় বাড়ীতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেতো। এরপর ছাত্র-যুবকরা সারাক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। রাতে ঘুমানোর সময় আমরা সকলে পাহারা দিতাম। তারা সবাই যুব সমিতির সদস্য ছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মিলিশিয়া বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য ছিলো। দিনরাত আমাদের মধ্যে কথাবার্তা ও আলোচনার অন্ত ছিলো না। বিশেষতঃ সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। বাঘাইছড়ি তথা সমগ্র কাচালং ভ্যালীর ছাত্র-যুব সমাজ তখন সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ ও সদা প্রস্তুত ছিলো। শহীদ মনির তাদের মধ্যে একজন। তাদের গ্রামে অবস্থানকালে সে সবসময় আমার কাছে ও পাশে থাকতো। সে ও তার সমবয়সীরা গ্রামের ক্লাব ও যুবসমিতির নেতৃত্বে ছিলো। তাদের সাথে আমার বয়সের তেমন বেশী ফারাক ছিলো না। আর তাই তারা আমার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতোই মেলামেশা করতো। তারা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য অধীর আগ্রহে আমার সাথে সলাপরামর্শ করতো। সামরিক শাখা শান্তিবাহিনীতে যোগ দিতে অনেকে তখন প্রস্তুত ছিলো।

১৯৭৬ সালে সশস্ত্র আন্দোলনের বন্দুক গর্জে উঠলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বিদ্রোহ দমনের নামে অত্যাচার ও নির্যাতনের খর্গহস্ত নেমে আসে। ছাত্র-যুব সমাজ সরকারের অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব 'গ্রীন সিগন্যাল' দেওয়ায় শত শত ছাত্র-যুবক অধিকার আদায়ের এই প্রতিরোধ যুদ্ধে সামিল হয়। বাঘাইছড়ি গ্রামের ছাত্র-যুব সমাজের একটি বিরাট অংশ এবং কাচালং ভ্যালীর প্রতিটি গ্রাম থেকে শহীদ মনিরের পথ অনুসরণ করে এ যুদ্ধে যোগদান করে।

শহীদ মনির (বুদ্ধ রঞ্জন) ব্যক্তি হিসেবে সদা প্রাণ উচ্ছল ও হাস্য রসিকতায় ভরপুর ছিলো। সামরিক প্রশিক্ষণের সময় সাথী বন্ধুরা কঠোর অনুশীলনে কান্তিতে কাহিল হয়ে পড়লে সে হাসি, গান, কৌতুক ও অভিনয় করে সবাইকে উজ্জীবিত ও মাতিয়ে রাখতো। তখন কেউ আর বিরস মনে থাকতে পারতো না, হাসি-খুশীতে সবাই মেতে উঠতো। সে খুবই নিখুঁত অনুকরণপ্রিয় ছিল। ক্লাসে ওস্তাদদের কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গী অবিকলভাবে অভিনয় করে দেখাতো। সে মূকাভিনয় করতো শান্তিবাহিনীর সদস্যদের দৈনন্দিন জীবনের টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে। সে দেশাত্মবোধক গান গাইতো। লড়াইয়ে কোন কোন সাথী কিভাবে লড়াই করেছে বা আত্মসমর্পণকারী প্রতিপক্ষের কোন সৈনিকের সাথে কোন সাথী কিভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলেছে (আমাদের অনেকে বাংলা ভাল করে বলতে পারতো না) সে সব অনুকরণ করে অভিনয় করতো। ব্যারাকের সাথী বন্ধুরা তার সবাক অভিনয় দেখে হেসে লুটোপুটি খেতো। এ জন্য সাধারণ ভলান্টিয়ার (সৈনিক) থেকে কম্যান্ডার, সকলের কাছে সে প্রিয়জন ছিলো। সবাই তাকে ভালোবাসতো। সে প্রথম সামরিক প্রশিক্ষণের পরেই ল্যান্স করপোরেলের (সহকারী সেকশন কম্যান্ডার) দায়িত্ব পায়। সে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম লড়াইয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। সেই লড়াই হতে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি-এই তিন থানায় সামরিক ক্যাম্পেইন প্ল্যানের অধীনে যতগুলি সশস্ত্র লড়াই হয়েছে, শহীদ মনির প্রতিটি লড়াইয়ে বীরত্বের ও সাহসিকতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে

লড়েছিলো। প্রতিটি লড়াইয়ে সাথীদের সাথে 'টিম ওয়ার্কে' সে খুবই পারদর্শীতার পরিচয় দেয় ও লড়াইয়ে কম্যান্ডারের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখে। এ জন্যে তার করপোরেল ও সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি হয়। শহীদ হওয়ার আগে তাকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে প্রমোশন দেওয়ার সুপারিশ পাঠানো হয়েছিলো। শহীদ মনির জুরাছড়ির একটি সফল লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। এই লড়াই তার সর্বশেষ লড়াই ছিলো। এই লড়াইয়ে 'ই' ও 'এফ' কোম্পানী ও ৫নং সেক্টরের রিজার্ভ ফোর্সের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। লড়াইয়ের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা থেকে এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণে শহীদ মনির অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এই লড়াইয়ে শহীদ মনির 'বিজয়' দেখেছে, বিজয় ছিনিয়ে এনেছে, কিন্তু 'বিজয়ের পতাকা' নিয়ে ব্যারাকে ফিরতে পারেনি। সে দিনের লড়াইয়ে প্রচন্ড গোলাগুলির মধ্যে প্রতিপক্ষ কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের কম্যান্ডারসহ সকলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। কোন ধরনের প্রতিরোধ করতেই পারেনি প্রতিপক্ষ। এই লড়াইয়ের প্রধান কম্যান্ডার 'ভিক্টরী সিগন্যাল' দেন এবং গোলাগুলি বন্ধ হয়। লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সেকশনের মধ্য হতে চার্জিং গ্রুপ পূর্বের ব্রিফিং অনুসারে চার্জিং-এ নেমে পড়ে। শহীদ মনির একটি চার্জিং গ্রুপের নেতৃত্বে ছিল। তখন সে চার্জিং করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিলো। এই সময় প্রতিপক্ষের একজন সৈনিক মরার ছল্ ধরে একটি বড় পাথরের আড়ালে পড়েছিলো। ঐ সৈনিকের আকস্মিক ব্রাশ ফায়ারে মনির শহীদ হয়। মনিরের একজন সাথী সঙ্গে সঙ্গে ঐ সৈনিককে খতম করে দেয়।

আজ ১০ নভেম্বর, আমাদের জুম্ম জাতির জাতীয় শোক দিবস। আজকের এই দিনে শহীদ মনিরকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে যারা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, সেই সকল শহীদের জানাই লাল সালাম।

হাজার তারার এক তারা: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

শরৎ জ্যোতি চাকমা

স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধানে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠী এই দেশের অধিপতি শ্রেণীর জাতিগত পরিচিতি বাঙালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। লারমার তীব্র আপত্তির সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ১৯৭২ সালে তৎকালীন সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদ জাতীয় সংসদে পাশ হয়। দেশের উচ্চ বর্গীয় বাঙালি জাতি হিসেবে নিজের কিংবা নিজ অঞ্চলের জাতিসমূহের পরিচয় মেনে নিতে পারেননি বিধায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংসদ কক্ষ পরিত্যাগ করে গহীন অরণ্যে কঠোর সংগ্রামী জীবন বেছে নিয়েছেন যে ব্যক্তি তিনি আমাদের সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

পার্বত্য জনপদে প্রগতির প্রথম প্রদীপ তিনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী জুম্ম জাতির স্বীকৃতি এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে অধিপতি শ্রেণীর শোষকের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের প্রবাদ পুরুষ এই ব্যক্তিত্বকে কুচক্রী মহল বাঁচতে না দিলেও তাঁর আদর্শকে মূলোৎপাটন করতে পারেনি। অধিকারহীন পাহাড়ী জনপদের মানুষ এখনো তাঁর জয়গান গায়।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে দু'চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমার পরিবার গহীন অরণ্যে। আমি আবেগ অনুভূতিহীন এক শিশু। বড়রা লারমাকে নিয়ে আলাপ করলেও তা ধারণ করা আমার পক্ষে কষ্টকর। লারমারা আমাদের স্বাধীনতা এনে দেবে বড়দের মুখ থেকে এমন কথা শোনা যেত। দিন-মাস-বছর অতিবাহিত হতে পার্থিব জগতের ভাবনা চিন্তাগুলো আমাকে পীড়া দিতে থাকে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুর দিন আসলে বড়রা কাজ করতে যায় না। গাছের পাতা ছিঁড়ে না। পায়ে জুতা সেন্ডেল ব্যবহার করে না। বিহারে গিয়ে প্রার্থনা করে। মোমবাতি জ্বালাই। আকাশ প্রদীপ আকাশে উড়িয়ে দেয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করে। মনের মধ্যে অনেক জিজ্ঞাসা কেন এই দিনে এমন করা হয়? আমার বোনেরা বলতো এই দিনে লারমাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু অনেক মানুষ তো মরে যায়। তাদের জন্য তো কিছুই করা হয় না আর লারমার জন্য করা হয়- আমি বুঝতাম না। আমার বোনেরা বলতো- লারমা স্বাধীনতা এনে দেবে তাই। লারমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করলে আমরা ফেলে আসা বসতভিটায় ফিরে যেতে পারবো। সেটেলার বাঙালিরা জায়গা জমি কেড়ে নিতে পারবে না। অরণ্যের গহীনে আমাদের পালিয়ে যাযাবরের মত দিনাতিপাত করতে হবে না। কথাগুলো বলে আমার বড় বোনেরা আমাকে বুঝাতো। তারা যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে দেখেছে তা কিন্তু নয়। শুনে তারাও বলে। আমার বোনেরা ছোট কাল থেকে সংগ্রামী। কারণ তারা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কথা বলতে পারে। তবে তাদের জুম দেশে এখনো স্বাধীনতা আসেনি। তাদের মুক্তিদাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। এককালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শধারী অনেকেই বর্তমানে বেঈমানীর চূড়ায়। ক্ষমতালিপ্সু চিন্তায় তারা প্রগতির পথ থেকে অনেক দূরে। প্রগতির পথে বাঁধা হয়ে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে দিয়েছে।

১০ নভেম্বর ২০১১ অন্ধকারাচ্ছন্ন জুম দেশের প্রগতির প্রথম প্রদীপ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। এই কিংবদন্তির প্রাণ প্রদীপ যারা নিভিয়ে দিয়েছে সেই ঘাতকদের নিন্দা করার ভাষা আমার নেই। শোকে মূহ্যমান লাখো জুম্ম জনতা জ্যোতিপ্রভা লারমা এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমাদের সান্তনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই।

এত লোকের অশ্রু কোথায় জমিয়ে রাখিবো,
জ্যোতিপ্রভা আর সন্তু লারমাদের মন কষ্ট লাঘব হবে কেমনি।
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা-
তুমি একবার এসে দেখে যাও, অঘোচালো তোমার রেখে যাওয়া সংগ্রাম
বিভেদপন্থার মূলোৎপাটন ঘটেনি
সুধাসিন্ধু, রূপায়ণ, পেলেরা এখনো অত্যাচারী
তারা তোমার ছোট ভাই সন্তু লারমার কথা রাখেনি।

১৯৮৩ সালে নেতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে জুম অঞ্চলের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আকাশের অগণিত নক্ষত্রমন্ডলীর উজ্জ্বলতা মলিন হয়ে শোকাতুর। দিশেহারা অসহায় জুম মানুষ। অভ্যন্তরীণ বিভাজন শোষকের অত্যাচারে যখন বিপর্যস্ত পার্বত্য জনপদ তখনি প্রতিদিনের সূর্য হিসেবে অসংখ্য আলোকরশ্মি প্রসারিত করে আবির্ভূত হন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। গৃহযুদ্ধ অবসান হলে সন্তু লারমার নেতৃত্বে আন্দোলনের দীপ শিখা জ্বলে উঠে পার্বত্য চট্টগ্রামে। সেই দীপ শিখার আলোক রশ্মি পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্র জ্বল জ্বলে হয়ে দীপ্যমান হয়ে থাকবে। এমনতর প্রত্যাশা ছিল জুম দেশের মানুষের।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রবর্তিত আন্দোলনের দীর্ঘ সময়ের ত্যাগের ফসল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। এই চুক্তি যুদ্ধরত পার্বত্য জনপদের উজ্জ্বলতম আলো। কিন্তু উজ্জ্বলতম আলোকে কেন্দ্র করে এই জনপদে জন্ম দেয়া হয় শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনকারী জুম্ম স্বার্থ বিরোধী একটি সন্ত্রাসী সংগঠন- ইউপিডিএফ। জেএসএস মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সৃষ্ট দীপ্যমান একটি রাজনৈতিক দল। ইউপিডিএফ জেএসএস'রই সুবিধাভোগী কতিপয় ক্ষমতালোভী উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরই সৃষ্ট একটি নয়া আঁতাত। যা প্রগতির রাস্তায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে, দাঁড়াচ্ছেও। প্রশ্ন হলো এই বাঁধা কার স্বার্থে? আমি জানি এই বাঁধা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। কারণ প্রগতির রাস্তা রুদ্ধ করা যায় না। কথাটি প্রসিত বাবুসহ ইউপিডিএফ বন্ধুদের মনে ধারণ করার আহ্বান জানাই।

সংশোধনবাদীতায় পড়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার হাতে গড়া সুধাসিন্ধু, রূপায়ণ, পেলেরাও সময়ের পালাবদলে পরিবর্তন হয়ে যায়। যে সংশোধনবাদ বিশ্বের প্রগাতর বিপ্লবের পথে কাঁটা তা অনুস্মরণ করে দলচ্যুত হওয়া বেমানান। দুর্ভাগ্য আমাদের এই বিপ্লবের পথে এসব পরগাছা সংশোধনবাদীদের তৎপরতাও কম নয়। পার্বত্য জনপদে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অধিপতি শ্রেণীর ছত্রছায়ায় খোদ জুমিয়া সমাজেরই অনেকেই ভুল পথে ধাবিত হয়েছে। ভুল পথে ধাবিত হওয়া অংশের বিপ্লব বিরোধীতায় আমরা অনেক সময় হতাশ হয়ে পড়ি। যদিও এই হতাশ হয়ে পড়াটাও একটি ভুল চিন্তা। মহাত্মাগান্ধির ভাষায়- প্রগতি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে স্বৈরাচার থাকবে, হত্যাকারী থাকবে এবং এক সময় মনে হবে তারা বোধহয় অপরাজেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পতন হতে বাধ্য (দ্য ভয়েস অব হোপ, অংসান সুকি)। আমাদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখি সামন্ত-চিন্তার মানুষেরা এই আন্দোলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৩ সালের গৃহযুদ্ধে বিভেদপন্থী চক্রদের পতন হয়েছে। নব্য সৃষ্ট ইউপিডিএফ এবং সংশোধনবাদীদের পতনও সময়ের দাবী। কারণ ইতিহাসে সত্য এবং ভালবাসার জয় সবসময়ই হয়েছে।

ক্ষমা করো ভুলে যাও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অমরবাণী। একটি বিপ্লবী পার্টির আন্তঃপার্টি সংগ্রাম পরিচালনায় একটি মহৎ তত্ত্ব। নেতা একজন মানবতাবাদী মানুষ, ক্ষমাশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি যাদের ক্ষমা করে মহত্ব দেখিয়েছেন ওরা তাকে হত্যা করেছে। নেতাকে হত্যাকারী তার মানবতাবাদী থিওরী অকার্যকর হয়েছে তা বলছি না। তবে শত্রুর সাথে যুদ্ধের ময়দানে মা অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার শামিলও হতে পারে। আবার আমি যদি অন্যদের ক্ষমা না করি তারা আমাকে ক্ষমা করবে কিভাবে। সংঘাত নিরসন পারস্পরিক ক্ষমা প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই সম্ভব। দিবালোকের মত সত্য যে, এই সংঘাত যত দীর্ঘ স্থায়ী হবে জুম অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি নড়েবড়ে হবে। অথচ শোষকের কাছ থেকে অধিকার পেতে অভ্যন্তরীণ ভিত্তি মজবুত হওয়া চাই। জুম অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ ভিত্তি সুসংগঠিত না হওয়াতে দেশের শোষকেরা নানাভাবে নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। জুম্ম জনগণকে দ্বিখণ্ডিত, ত্রিখণ্ডিত করার পরও চতুর্খণ্ডিত করার চেষ্টায় রয়েছে শোষকশ্রেণী। আর এই চতুর্খণ্ডের অংশটা হলো আমাদের সমাজের কথিত নাগরিক সমাজ। এই সমাজ প্রগতিকে ভয় পায় বুর্জোয়া চেতনার পূজারী নিজ স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী। মুখে মুখে ইউপিডিএফ, জেএসএস ও সংশোধনবাদীদের মধ্যকার ঐক্যের কথা বলে অথচ ঐক্যের ফাটল এরাই ঘটায়। ফলতঃ পার্বত্য অঞ্চলে নাগরিক সমাজের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলেও সংঘাতে বিধ্বস্ত এই জনপদে সত্যিকার চিন্তাশীল নাগরিকের অভাব বোধ অত্যধিক।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিপ্লব শুরুর প্রাক্কালে এই অঞ্চলের সামন্ত নেতৃত্বের যথেষ্ট বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এম এন লারমার প্রগতিশীল চিন্তা তৎকালীন শোষকের ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন করতে পারলেও শোষকের শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম জোরদার করার আগে নিজ জনগোষ্ঠীর সামন্তীয় চিন্তার বিরুদ্ধে তাকে বেশী সোচ্চার হতে হয়েছে। তার পরেও ক্ষমা করো, ভুলে যাও তত্ত্বের যথাযথ বাস্তবায়নে অবিচল এম এন লারমা। তিনি হয়ত অনুধাবন করতেন সংশোধনবাদী যারা তার দলেরই, বিভেদপন্থী যারা তার দলেরই, সামন্ত যারা তার জুম অঞ্চলেরই মানুষ। আর শোষিত বঞ্চিত যারা তাদের জন্যই তিনি সংগ্রাম শুরু করেছেন। এই সংগ্রাম কখনো উত্থান কখনো পতনের দোলাচলে চলমান দীর্ঘ সময় ধরে।

এম এন লারমাসহ অগণিত মানুষের আত্মত্যাগে অর্জিত অধিকার সমূহ পার্বত্য জনপদের মানুষ ভোগ করতে পারছে না। তার একমাত্র কারণ এই সমাজে শোষকেরা বিভেদপন্থী সুবিধাবাদী চক্র সৃষ্টি করছে। সংশোধনবাদী অংশের উত্থান ঘটিয়েছে। সামন্ত শ্রেণীর আন্দোলন বিমুখতা এবং মধ্যবিত্ত পেটি বুর্জয়া শ্রেণীর আন্দোলন সুবিধাবাদিতার সকল আয়োজনে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ফলতঃ উদীয়মান পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী অবাস্তব রঙ্গ মঞ্চে অভিনয়ের চেষ্টায় পথ চলে বিপ্লবী চিন্তাকে নমস্কার জানিয়ে দিচ্ছে।

কাউকে আঘাত করা বা পীড়া দেওয়া আমার লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী। ডেকেভ হ্যাভেল, ভেলভেট রেভ্যুলেশন অব চেকোস্লোভাকিয়ার অহিংসবাদী নেতা Political activist হওয়ার প্রথম শর্তের কথা বলেছেন, "আমি বিশ্বের অগ্রগতির জন্য অপেক্ষা না করে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার চর্চা করি কিংবা অন্তত এ সম্পর্কে আমি আমার মতামত প্রকাশ করি।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংগ্রামী চিন্তা আর জুম্ম জনগণের চলমান সংগ্রাম পর্যালোচনার প্রয়াসেই মূলত আমার দু'এক লাইন লেখা। পার্বত্য অঞ্চলের চলমান আন্দোলনে রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিপতি শ্রেণীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর হয়ে পড়েছে। তাই সমাজ পরিবর্তনের এই আন্দোলনে নানাবিধভাবে বাঁধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিদ্যমান তথাকথিত উঁচু-নিচু শ্রেণীর মধ্যকার বৈষম্যপূর্ণ অবস্থানের পরিবর্তন সাধন করতে না পারলে মেহনতি মানুষের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করবে। নিঃস্বতার মধ্যেও সংগ্রাম; সংগ্রামের মাধ্যমে নিঃস্বতার বিলোপ সাধন তখনই সম্ভব যেই না নিপীড়িত শ্রেণী প্রগতির আদর্শে ধাবিত হবে। আর অধিপতিরা দাপট দেখাবে নিপীড়িতদের থেকে কেউ যদি তাতে তোষামোদী শুরু করে তাহলে শোষণ মুক্তি সুদূর পরাহত। যার কারণে শোষিত শ্রেণীকে বেশী করে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। পিছিয়ে ফেলে রাখা নিপীড়িত শ্রেণী হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষকে মনে রাখতে হবে সমাজের অধিপতিদের দল চায় না মজুরদের দল জানুক তাদের প্রতিটি বঞ্চনার কারণ। তারা শোষিত শ্রেণীকে শোষণের কারণকে পূর্বজন্মের কর্মফল বিশ্বাস করিয়ে ঈশ্বর বন্দনায় নিয়োজিত রেখে স্বর্গের রাস্তায় কে আগে কে পরে হবে তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রাখতে চায়। শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শোষিতের বঞ্চনার কারণ যে ঈশ্বর প্রদত্ত নয় বরং অধিপতি শ্রেণীর শোষণের যাতনা আর তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র রাস্তা ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানো তা পরিষ্কারভাবে এই জুম্ম জাতিকে দেখিয়ে দিয়েছেন। নেতার নির্দেশিত রাস্তায় আমরা কতটুকু অগ্রগাম তা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। স্বাধীনতার ৪০ বছরে অধিপতি শ্রেণী নানা কায়দায় শোষণের মাত্রা বাড়িয়েছে। শোষকের এমনতর আচরণেও যদি এ অঞ্চলের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের সচেতনতা না আসে তাহলে অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল দরজা বন্ধ হয়ে জাতিসমূহকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করার শামীল।

অন্ধকার তাড়িয়ে আলোর পথ নির্দেশক, হাজার তারার এক তারা
মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
লাল সালাম তোমায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের পথিকৃৎ মহান নেতা এম এন লারমা

বিনয় কুমার ত্রিপুরা

১০ নভেম্বর জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও শোকাবহ দিন। জুম্ম জাতির শহীদ দিবস, জাতীয় শোক দিবস। হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানিয়া সেই অচিন্তনীয় ১০ নভেম্বর বছর ঘুরে আবার এলো। আজকের এই দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা, গভীর শোক আর ভালবাসায় সিক্ত হবে শহীদ বেদী। প্রতিবছর শহীদের স্মরণে যথাযথ মর্যাদায় প্রভাতফেরী, পুষ্পস্তবক অর্পণ, স্মরণসভা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফানুস উড়ানোসহ নানা কর্মসূচী পালিত হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পথ প্রদর্শক, জুম্ম জাতির মুক্তির দিশারী, স্বপ্ন ও সাহসের প্রতীক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর তাঁর আটজন সহযোদ্ধাসহ বিভেদপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে শাহাদাৎ বরণ করেন।

শোকের এই দিনে ইতিহাসের পাতা মেললে দেখি- আত্মত্যাগী বীর শহীদের অবদান। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে অধিকার আদায়ের জন্য জীবন দেওয়ার ইতিহাস। আজ জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত আপোসহীন সাংসদ বিপ্লবী মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। কাল-কালান্তরকে পিছনে ফেলে চেঙ্গী, শঙ্খ মাতামুহুরী নদীর জল অনেক গড়িয়ে গেছে। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে জুম্ম জনগণ জাতীয় শোক দিবস পালন করে আসছে। জীবন-মৃত্যু চিরায়ত সত্য। কিন্তু এমন কিছু মৃত্যু; যা অনাকাঙ্ক্ষিত। বিশ্বাসঘাতকতা, নির্মমভাবে হত্যা, অকাল প্রয়াণ মেনে নেওয়া কষ্টের। জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্কট মুহূর্তে আশা জাগানিয়া আদর্শবাদী স্বপ্নদ্রষ্টা মহান নেতা এম এন লারমা জুম্ম জনগণের মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বহু বাঁধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে তিনিই জুম্ম জাতির মুক্তির অপ্রতিরোধ্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের নবতর অধ্যায়ের সূচনা করেন। অনুপ্রেরণাদানকারী তাঁর আদর্শিক চেতনায় আজও আমরা স্বপ্ন বুনি। তিনি জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক নিরন্তর আপোসহীন সংগ্রামীর ভূমিকায় ছিলেন। জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার মহান দায়িত্বে তিনি জাগতিক মোহকে যে ত্যাগ করেছেন এ আদর্শ আমাদের অনন্তকাল অনুপ্রাণিত করে যাবে।

এই লেখাটি যখন লিখতে শুরু করি তখন বিকেল পাঁচটা। আকাশ মেঘে ঢাকা। মেঘের গর্জন, ঝড়ের পূর্বাভাস। হঠাৎ ঝম-ঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির শব্দ; মেঘ চমকায়, বজ্রপাত হয়। অ-নে-ক দূরে সবুজ পাহাড়, আঁকা-বাঁকা মেঠোপথ, আর খুব কাছেই কাপ্তাই হ্রদের স্বচ্ছ জল। যে জলে মিশে আছে বহু রক্ত ও অশ্রু জল। অন্ধকার নেমে আসে। বয়:জ্যেষ্ঠদের কাছে শুনা কথাগুলো এলোমেলো ভাবতে থাকি- ১৯৬০ সাল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে আরও একটি বিভীষিকাময় কাল। তাই বলা হয়ে থাকে- 'কাপ্তাই বাঁধ, মরণ ফাঁদ'। মহান নেতা এম এন লারমা শুরু থেকে কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করেন। দিশেহারা জুম্ম জনগণের জীবনে বয়ে আসা উদ্বাস্তুর মর্মস্পর্শী ঘটনাগুলো মহান নেতা এম এন লারমাকে নিশ্চয়ই গভীরভাবে মনে নাড়া দিয়েছিল। তাই তিনি উৎকণ্ঠিত জুম্ম জনতাকে আন্দোলনের দিকনির্দেশনা দিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁরই আহ্বানে ছাত্র-জনতা রাজপথ, গ্রাম-গঞ্জে, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এক 'জলন্ত মশাল' তাঁর সেই মশাল থেকে লাখো আদর্শের-অনির্বাণ অগ্নিশিখা নিয়ে আগামী প্রজন্ম নিজেদের উজ্জীবিত করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম এগিয়ে নেবেই। যারা নির্ভীক, তারাই শপথ নিয়ে এগিয়ে যাবে, মুক্তির জয়গান গেয়ে, ছিনিয়ে আনবে বিজয়। তারা অপ্রতিরোধ্য-দুর্বার, তারা জীবনের জন্য, জীবন তাদের নয়। মহান নেতার উক্তি-"যারা মরতে জানে পৃথিবীতে তারা অজেয়। যে জাতি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না, পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না।" এম এন লারমা'র জীবন-দর্শন থেকে আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি- মানবিক আদর্শের চূড়ান্ত সমীকরণে আদর্শিক সংগ্রাম মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণীয় হয়ে থাকে। একজন প্রকৃত বিপ্লবীর আদর্শের মৃত্যু নেই। তিনি জানতেন একজন প্রকৃত বিপ্লবীর গুণাবলী কী। তাই তিনি বলেছিলেন, "ক্ষমাগুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তিত হওয়ার গুণ- এই তিনগুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।" মাটি ও মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত মহান নেতা এম এন লারমাকে বাদ দিয়ে কি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস রচনা করা যায়? বীর শহীদের আত্মত্যাগের মহিমা কি কখনো ইতিহাস থেকে মুছা যায়? এম এন লারমা'র সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের সবার পরিজ্ঞাত। তাই তিনি অমর হয়ে থাকবেন কাল থেকে কালান্তরে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা চিরঞ্জীব এক নাম। তিনি এখনো তরুণ্যের পুজারী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে চলমান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এম এন লারমার প্রদর্শিত আদর্শ ছাড়া সফল হতে পারে না। জুম্ম জনগণকে প্রগতিশীল আদর্শে উজ্জীবিত করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া প্রয়াত মহান নেতার এক আদর্শিক অক্লান্ত প্রয়াস। আমরা দেখেছি, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সত্য একদিন উদ্ভাসিত হয়। যে অপশক্তি জাতীয়

মুক্তি আন্দোলনকে পরাভূত করতে এম এন লারমাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল; বিভেদপন্থী-ঘাতকেরা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের জয়যাত্রাকে মাঝপথেই স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছিল; তারা আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ হয়েছে। ইতিহাস কি কাউকে মার্জনা করে? করে না। জুম্ম জাতির ইতিহাসে তাদের নাম বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী, বিভেদপন্থী হিসেবে চিরদিন ঘৃণিত হয়ে থাকবে। তাদের উত্তরসূরী দোসরা এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের বুক থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এখনও তারা বিভেদপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জাতীয় অস্তিত্বকে সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং শাসকগোষ্ঠীর একটি বিশেষ মহলের লেজুড় হয়ে হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠছে। কিন্তু ইতিহাসের রূঢ় বাস্তবতা হল- সাময়িককালের জন্য দৃশ্যতঃ আদর্শহীন, প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তিকে কার্যকর ও শক্তিশালী মনে হলেও সময়ে তা বালির বাঁধের মতো ধ্বসে যাবেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারহারা জুম্ম জাতির সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহান নেতা এম এন লারমা অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে যে অবদান রেখেছেন তাঁরই প্রদর্শিত আদর্শিক সংগ্রামের পথ বেয়ে অর্জিত অধিকার ভোগী এ জাতির হৃদয়ে তিনি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এম এন লারমা'র আদর্শের 'প্রদীপ' (পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি) জুম্ম জাতিকে অনন্তকাল পথ দেখাবে এবং সংগ্রামের মহান ও গৌরবময় ইতিহাস আগামী প্রজন্মকে আন্দোলনের সঠিক দিকনির্দেশনা দেবে। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং একজন সংসদ সদস্য হিসেবে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন নির্যাতিত-নিষ্পেষিত, শোষিত-বঞ্চিত, গরীব-দুঃখী, মেহনতী মানুষের আলোর দিশা। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষ মুক্তি পাক- এ ছিল তাঁর আমৃত্যু লালিত স্বপ্ন।

জানা যায়, বিভেদপন্থী ঘাতকদের হামলায় তিনি যখন প্রথমে পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। পরে ঘাতকরা আবার গুলি করতে উদ্ধত হলে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "...বন্ধুরা আমাকে মেরে যদি তোমাদের জাতীয় মুক্তি বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ফিরে পাও তাহলে মারো এবং দেশ ও জাতির ভালমন্দ দেখাশোনা করিও..."। মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে দেশ-জাতির কথা চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছিলেন- "আমি একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই জাতির প্রতিনিধি আমি। আমার বুকের ভিতর কি জ্বালা, তা আমি বুঝাতে পারব না।"

মহান নেতা এম এন লারমা ছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদী একজন দেশপ্রেমিক মহান বিপ্লবী নেতা। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নকালে বাংলাদেশ গণপরিষদে দেয়া তাঁর বক্তব্যে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার কথাই বারবার ব্যক্ত হয়েছে, "...মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের দেওয়া হয়নি ...যেমন দেওয়া হয়নি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষকে। ...আমি বলছি আজকে যারা রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাঁদের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। ...আজকে যাঁরা কল-কারখানায় চাকা ঘুরাচ্ছেন, যাঁদের রক্ত চুঁইয়ে আমাদের কাপড়, কাগজ তৈরি হচ্ছে, সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের কথা এখানে (সংবিধান) নেই।"

তিনি আরো বলেছিলেন, "বাংলাদেশের এক কোণায় রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু কিসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসকে এখানে স্থান দেওয়া হয়নি? আমরা জানি, ইতিহাস বিকৃত করা যায় না। কিন্তু আমরা কি দোষ করেছি? কেন আমরা অভিশপ্ত জীবন-যাপন করবো?" আদিবাসী জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে দু'পায়ে দলিত করে জাত্যাভিমানী, উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী শাসকগোষ্ঠী এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসকের মতোই রাজনৈতিক জাতিগত সহিংসতা ও দমন-পীড়ন, নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে। শাসকগোষ্ঠী বার বার জুম্ম জাতির ইতিহাসকে অপব্যাখ্যা দিয়ে ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অবমাননা ও আত্মপরিচয়ের অধিকারকে খর্ব করে চলেছে। অপরদিকে আদিবাসী জুম্মদের নির্মূলীকরণের হীন উদ্দেশে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের নগ্ন থাবার জাতিগত সহিংসতা এখনও বন্ধ হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিল তিল করে গড়ে ওঠা রক্তস্নাত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে এম এন লারমা'র নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ লাভ করে। দীর্ঘ দু'দশকের অধিক সময় ধরে চলে ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী চুক্তি বাস্তবায়ন না করে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। শত-শত শহীদের আত্মত্যাগ, বহু রক্ত, ঘাম ও মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে চুক্তির মধ্য দিয়ে জুম্ম জাতি যে অধিকারগুলো পেয়েছে, বর্তমানে সমাজের কিছু স্বার্থবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদীরা সেই গৌরবময় সংগ্রামী ইতিহাসের কাছে দায়স্থ হয় না। তারা আজ লজ্জাহীন স্বার্থপরতায় বুঁদ হয়ে আছে। নিজেদের স্বার্থরক্ষায় জাতীয় স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে চলেছে। অপরদিকে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এখনো আমাদের চারপাশে ইউপিডিএফ নামে, সংস্কারপন্থী হিসেবে ক্ষমতালিপ্সু, চরম স্বার্থপর, সুবিধাবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল, দালালদের আস্ফালন দেখা যায়। শাসকগোষ্ঠীর দালাল জুম্ম জাতীয় বেঈমান, যারা এখনও তথাকথিত সুশীল সমাজের সমাজসেবক-বুদ্ধিজীবী, জনপ্রতিনিধি পরিচয়ে জুম্ম জাতির সাথে প্রতারণা ও ভন্ডামী করে চলেছে। তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। আর অধিকারকামী জুম্ম জনতা সমাজের ওই দালালদের নির্মূল করতে শিখুক। বিভেদপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, কুচক্রী, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবরা নিপাত যাক। ১০ নভেম্বর '৮৩ অমর হোক। বিপ্লবী মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বিনম্র শ্রদ্ধা, লাল সালাম।

একটি স্বপ্নকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ১০ই নভেম্বর'৮৩

বাচ্চু চাকমা

সর্ব প্রথমে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অমূল্য অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত মেহনতি জুম্ম জনগণের অন্যতম মুক্তির দিশারী স্বপ্ন ও সাহসের একটি নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ২৮তম মৃত্যু দিবসে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি তাঁর আর্দশকে, যে আদর্শ দিয়ে জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এম এন লারমাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে দিয়ে যারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে সেই কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশদের স্বপ্ন কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এম এন লারমার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তাঁর নীতি ও আদর্শের কোন মৃত্যু হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণ এম এন লারমার আদর্শকে এখনও বুকের মধ্যে লালন করে চলেছে। তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিয়ত জুম্ম জনগণ, ছাত্র ও যুবসমাজ স্বপ্ন দেখেছে একটি শোষণহীন-বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার। ৮৩ সালের যে ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে সামনে দিকে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের আদিবাসীরা। ৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর দিনগুলোর কথা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জনসংহতি সমিতির সংগ্রামী সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেন- "১০ই নভেম্বরের দুঃসহ মুহূর্তগুলো আমার এখনও মনে ভাসে, অন্তরকে বিদ্ধ করে যার যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

১০ই নভেম্বর যে আক্রমণ চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ এর ষড়যন্ত্রে হয়েছে। এই চার কুচক্রী ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। তারা জুম্ম জাতির সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে আরও তাঁর সহপাঠী/সহযোদ্ধা অনেক সংগ্রামী বন্ধুকে। প্রিয় মানুষকে হারানোর যন্ত্রণা কত করুণ, কত মর্মান্তিক, কত বেদনা বিদুর তা জুম্ম না হয়ে সহজে অনুভব করা যাবে না। তবে এম এন লারমাকে হারিয়ে জুম্ম জাতির সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের সংগ্রাম চিরকালের। যেমনি করে চেঙ্গী, মাইনী, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কাচালং, লোগাং নদীগুলো বয়ে যায়, পাহাড় যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সেই রকম আমাদের সংগ্রাম চিরকালের। মানুষের অধিকার নিয়ে এই মাতৃভূমিতে আমরা বেঁচে থাকতে চাই। মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নতুন সমাজ গড়ার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।

এম এন লারমার স্বপ্ন- "মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, পাহাড়ের উপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বাধীনভাবে আমরা জুমচাষ করতে পারবো। জুম্ম নারীরা ক্ষেতে-খামারে নিরাপদে কাজ করতে পারবে। দীঘিনালার পথে যেতে যেতে বা লামার পথে যেতে যেতে আমাদের কোন জুম্ম নারীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে না। এম এন লারমা এমন সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখতেন যেখানে আগামী দিনের পাহাড়ী শিশুরা তাদের নিজেদের জীবন নিয়ে, ভাষা নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে বিকশিত হতে পারবে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।" আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানে নিজের জীবনের উপর অধিকার তিনি সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন।

আগামী দিনগুলোতে এম এন লারমা এই পাহাড়ের বুকে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু প্রিয় পাঠক, পাহাড়ের শিশুরা তো বার বার এই পাহাড়ে ফিরে আসবে। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আগামী দিনের শিশুরা শান্তিতে, নিরাপদে বাস করতে পারে, সেই অধিকারটুকু আমাদের দিয়ে যেতেই হবে। কাপ্তাই হ্রদের জল আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা হতাশায় ভুগী যখন দেখি, কাপ্তাই হ্রদের ফলে হাজার হাজার একর ধানী জমি পাহাড়ী গ্রাম পানি তলে তলিয়ে গেছে। ১৯৬০-৮৩-৮৮-৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জুম্ম জনগণ বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মানে জুম্ম জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। স্বপ্ন পূরণের একদিন ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে জুম্ম জনগণ যে স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপ্নকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছে পাহাড়ে পাহাড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ইউপিডিএফ এর পেশি শক্তির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। আমরা যারা স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখেছি, তারা আজ অবধি শত্রুর আঘাতে আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মানবেতর জীবন ধারন করতে বাধ্য হচ্ছে। জীবনকে বাজি রেখে এই জুম্ম জণগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এখনও তারা নিরন্তর গতিতে এগিয়ে চলছে।

১৯৯৭ সালের পরবর্তী সময়ে মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি, বাঘাইছড়ি, রামগড় এর মতো অনেক বর্বরোচিত নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমাদের পাহাড়ী শিশু সন্তানেরা অনেক কঠিন বাস্তবতার মধ্যে বড় হচ্ছে। জুম্ম জনগণ শাষিত শ্রেণীর মানুষ। সর্বহারা অধিকার হারা, আমরা অসহায়! পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের উপর সব সময় ষড়যন্ত্রের ফাঁদ তৈরী করে রেখেছে শাষকগোষ্ঠী। জুম্ম জনগণের স্বপ্নকে তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতে চায়। ৮৩ সালের যে ষড়যন্ত্র, সেই ষড়যন্ত্রকে জুম্ম জনগণ কখনও ভুলতে পারে না। এম এন লারমার স্বপ্ন আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু পুরোটা বাস্তবায়িত হতে

এখনও অনেক সংগ্রাম, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন। সেজন্য এম এন লারমার একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই "আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে অন্ততঃ তিনটি প্রজন্ম পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন করে যেতে হবে।" এখনও পর্যন্ত একটি প্রজন্মের আন্দোলন চলছে। এভাবে আরও দুটি প্রজন্মকে আন্দোলন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ষড়যন্ত্র এখানে শেষ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে পাহাড়ী মানুষের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নকেও ধ্বংস করার ফাঁদ তৈরী করে রেখেছে শোষকগোষ্ঠী। '৮৩ সালের ন্যায় '৯৭ সালের চুক্তি-পরবর্তী সৃষ্টি হওয়া সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ জুম্ম জনগণের আরও একটি স্বপ্ন ধ্বংসের হোলি খেলায় মেতে উঠেছে। '৮৩ সালের গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশদের প্রেতাত্মা হিসেবে পরিচিত, শাষকগোষ্ঠীর সৃষ্টি করা এই সংগঠনের কর্মকান্ড সম্পূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম স্বার্থ বিরোধী। একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে কালো চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করছে, অপরদিকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নামে সাধারণ অসহায় জুম্ম জনগণকে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্ম অব্যাহত রেখে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে জনসংহতি সমিতির সদস্যবৃন্দ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। তাদের জীবন কেমন চলছে? কেমন আছে তারা? তাদের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, ভাবি, আমার খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু এভাবে আর কত দিন? আর সময় নেই। ষড়যন্ত্রকারীদের পরাজয় অনিবার্য। বিজয় আসবে যদি ষড়যন্ত্রকারীদের ধ্বংস করতে পারি।

কাজাক্‌সা

চিংলামং চাক

১৯৭৯ সালে পৃথিবীতে বড় ধরনের সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। সঠিক দিন-তারিখ মনে নেই। দুপুর প্রায় ২ টার দিকে সূর্য গ্রহণ শুরু হয়ে বিকাল ৫টার দিকে শেষ হয়। এ সময় রাতের মতো অন্ধকার হয়ে আকাশে তারা পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। ঠিক সেই বছরে আমাদের গ্রামে প্রায় ১০০ জনের অধিক শ্রমণ বা প্রবজ্যা গ্রহণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিরাট আকারে আয়োজন করা হয়েছিল এবং দিনটি ছিল একেবারে পরিপূর্ণ পুর্ণিমা রাত। সে সময় আমার বয়স প্রায় ১৪/১৫ বৎসর হবে। সে দিনই আমাদের গ্রামের বৌদ্ধ বিহারে শান্তিবাহিনীর একদল সদস্য অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হয়ে মিটিং করার জন্য এসেছিলেন এবং ঐ শুভ দিনটিই ছিল বাইশারী চাক পাড়া অঞ্চলে শান্তিবাহিনী সদস্যদের প্রথম আগমন।

সেদিনই গ্রামের মুরুব্বী, পুরুষ, মহিলা, যুবক-যুবতীদের এক কৌতুহলী ব্যাপার হয়েছিল শান্তিবাহিনী সদস্যদের একপলক দেখার জন্য। মিটিং-এ তাদের বক্তব্য শোনার জন্য হৈ-চৈ পড়ে যায়। উচ্চারণগতভাবে চাকদের ভাষার স্বর একটু উচ্চ স্বরে হয়। তাই অন্য ভাষাভাষি শান্তিবাহিনীর সদস্যরা যারা অধিকাংশই চাকমা তারা খুবই চিন্তিত ও আতংকিত হয়ে উঠে এই ভেবে যে, তাদের নিজেদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ বাঁধলো কিনা কিংবা তাদের (শান্তিবাহিনী সদস্যদের) আগমনকে কেন্দ্র করে তাদের (চাক গ্রামবাসীদের) মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলো কিনা। কয়েকজন শান্তিবাহিনী সদস্যকে সেদিন দেখলাম মিটিং ও তাদের নিরাপত্তার জন্য খুব তৎপর। শান্তিবাহিনীতে যোগদান করা মংসাঅং চাকও ছিল তাদের সাথে। তার কাছে জিজ্ঞাসা করে অন্য শান্তিবাহিনী সদস্যরা জানতে পারলেন যে, শান্তিবাহিনী সদস্যদের একনজরে দেখার জন্য হৈ হুল্লা করছে এবং ভাষার উচ্চস্বরের কারণে শব্দটা বেশী হচ্ছিল। তখন শান্তিবাহিনীরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হলেন।

চাক ভাষায় শান্তিবাহিনীকে "কাজাক্‌সা" বলা হতো। "কাজাক্‌সা" অর্থ রাঙ্গামাটি বা লাল মাটি। যেহেতু শান্তিবাহিনীর জন্ম রাঙ্গামাটিতে এবং তারা অধিকাংশই রাঙ্গামাটি থেকে আসা লোকজন, তাই তারা তাদেরকে "কাজাকসা" নাম দিয়েছিল। ঐ নাম রাখাতেই বাঙালিরা, বিডিআর ও সেনাবাহিনী সদস্যরা বুঝতে পারতো না।

আদিবাসী চাক জনগণ ১৯৭০ ও ১৯৭২ সালে এম এন লারমা ও শান্তিবাহিনীর কথা শুনেছে। কিন্তু এম এন লারমা তথা শান্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি তা তাদের নিকট স্পষ্ট ছিল না। শুধু লোকে বলতো যে কাইংসা নদী বা কাপ্তাই বাঁধের ফলে জুম্ম জনগণের গ্রাম, জমি পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং হাজার হাজার জুম্ম ভারতে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয়েছে। আরো শুনতো যে, শেখ মুজিবর রহমান জুম্মদেরকে বাঙালি হয়ে যেতে বলেছিল এবং এম এন লারমা তার প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই ১৯৭৯ সালে প্রথম শান্তিবাহিনী আগমনে সুমন বাবু, রুপেশ বাবু, রশ্মি বাবু, উগ্র বাবু, ও কেতু বাবুসহ অনেকে ছিলেন। আমাদের গ্রামের বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে সেই পরিপূর্ণ শুভপূর্ণিমা দিনে মিটিং শুরু হয় প্রায় রাত ৮ টার দিকে। প্রথমে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে এলাকার ভালমন্দ খবর জেনে নিলেন ও একের পর একজনকে বক্তব্য দিতে বললেন।

এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সবাই বলতে শুরু করলেন চাকদের জুমভূমি, গো-চারণ ভূমি, ছনখোলা, ব্যক্তি মালিকানা ভূমি, প্রথাগতভাবে ভোগদখলীয় ভূমি বহিরাগত বাঙালিরা জোর করে দখল করে নিচ্ছে, তারা যাবে কোথায়, বাঁচবে কিভাবে। জেনারেল জিয়াউর রহমান বহিরাগত বাঙালীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে 'আর' কবুলিয়তের (R মানে Refugee) মাধ্যমে তারা চাকদের জমি জবরদখল করছে। গ্রামের কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল লোক মদ পান করে ঝগড়া করে আর অনেকেই জুয়া খেলে সমাজকে কলুষিত করছে। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বক্তব্যের পর শান্তিবাহিনী সদস্যদের তরফ থেকে বক্তব্য শুরু করলেন। তাদের বক্তব্যে তারা যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্যে আমার যতটুকু মনে পড়ে সেগুলো হচ্ছে- জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পার্টি এবং পার্টি সশস্ত্র শাখা হিসেবে শান্তিবাহিনী গঠন করা হয়েছে। অত্র এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম চালানোর জন্য এবং এলাকাবাসীর অধিকার রক্ষা করার জন্য তারা সেখানে এসেছে বলে তারা জানান।

তারা আরো বলেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সত্য কিন্তু জুম্ম জনগণের অধিকার স্বীকার করা হয়নি। অধিকন্তু শেখ মুজিবর রহমান জুম্মদেরকে বাঙালি হয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। চাকরা বাঙালি হতে পারবেন কিনা তারা জিজ্ঞাসা করেন। সবাই সমস্বরে চাক গ্রামবাসীরা 'না' উত্তর দেয়। তারা আরো বললেন, জিয়া সরকার বহিরাগত বাঙালীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদেরকে ধ্বংস করতে চায়। চাক গ্রামবাসীরা যে দুঃখের কথা বলেছে সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সকলের একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হবে বলে তারা জানান। তারা আরো জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পাঁচ দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। শাসকগোষ্ঠী জুম্মদেরকে অধিকার দিতে চায় না। সুতরাং অধিকার আদায় করে নিতে হবে।

অপর একজন বক্তব্যে বললেন যে, জুম্মদের সমাজ জুম্মদেরকেই পরিবর্তন করতে হবে। সমাজে মদ-জুয়ার প্রভাব থাকলে সেই সমাজ সুন্দর হতে পারে না। মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অধিকার সচেতন হতে হবে। শান্তিবাহিনী সদস্যদের বিরুদ্ধে অপারেশনের দোহাই দিয়ে গ্রামে পুলিশ, বিডিআর ও আর্মি আসতে পারে এবং গ্রামবাসীর উপর বিভিন্ন প্রকার শারিরীক-মানসিক নিপীড়ন-নির্যাতন চালাতে পারে। তিনি আরো বলেছিলেন- অধিকার পেতে হলে এবং জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে পুলিশ, বিডিআর, আর্মিদের অত্যাচার সহ্য করতে হবে। অপরদিকে শান্তিবাহিনী সদস্যরা যেন নিরাপত্তায় থেকে আন্দোলন সংগ্রাম যাতে চালিয়ে যেতে পারে এবং আন্দোলন-সংগ্রাম যাতে বাঁধাগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। কেতু বাবু ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, জুম্ম জাতির মুক্তির আন্দোলনে ছাত্র ও যুব সমাজকে এম এন লারমার সৈনিক তথা জুম্ম সৈনিক হতে হবে।

সেদিন প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত মিটিং হয়। শান্তিবাহিনী সদস্যদের আগমনের পর থেকে পর্যায়ক্রমে সমাজে মদ-জুয়া বন্ধ হয়ে যায়। সকলের কাছে "কাজাকসা" প্রশংসনীয় হলো। বাইশারী এলাকার মারমা, ম্রো, সকলের গ্রামে গ্রামে শান্তিবাহিনী সদস্যদের মিটিং শুরু হয়। সকলেই রাজনৈতিক সচেতনতা, নিজের বাঁচার অধিকার, সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব, শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, জুম্ম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়া, মানুষে মানুষে নিপীড়ন-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার কথা ভাবতে শুরু করে। দু-এক মাসের মধ্যে বাইশারী এলাকা থেকে চাক, মারমা প্রায় ২০/৩০ জন যুবক শান্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। শান্তিবাহিনী সদস্যদের জন্য ভাত দিয়ে আসা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতার জন্য পুরুষের পাশাপাশি মহিলা ও কিশোর-কিশোরীরাও এগিয়ে আসলো। সে সুবাদে ভাত দিয়ে আসার জন্য আমি যেতাম। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্র, কথা-বার্তা, চলন-বলন ইত্যাদি আমাকে অবাক করে ফেললো এবং গভীরে গিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগ্রামের বিকল্প নেই।

পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর দিনে জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত প্রয়াত মহান নেতা এম এন লারমার উপর গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের হামলায় মৃত্যুর সংবাদ শুনে ১৯৭৯ সালের সেই শৈশবকালের শান্তিবাহিনী ও সংগ্রামে আমার অনুভূতির উপর চরমভাবে আঘাত হানলো। তখন আমার কাছে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হলো। জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রপথিক এম এন লারমাকে হত্যা করে কি পেতে চায় কুচক্রীরা? জুম্ম জাতিকে সংগ্রামের ডাক দেয়া কি তাঁর অপরাধ? পার্টি ও শান্তিবাহিনীর ভবিষ্যত কি হবে? জুম্ম জাতির পরিণতি কি হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

১০ নভেম্বর ১৯৮৩ সন জুম্ম জাতির জন্য একটা শোকাবহ দিন। বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে এম এন লারমাকে হত্যা করে জুম্ম জাতিসহ মেহনতি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করলো কুচক্রীরা। পরবর্তীতে খবরাখবর আসতে শুরু করলো লাম্বা-বাট্যা গ্রুপের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। লাম্বা ও বাট্যা শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করলাম। তখন আমি রাঙামাটি পার্বত্য জেলার রাঙাপান্যা মোনঘর শিশুসদনে অধ্যয়নরত ছাত্র। সেসময় ১৯৮৪ সনে দীঘিনালাস্থ বোয়ালখালী দশবল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমে পড়ালেখার জন্য চলে যায়। গভীর রাতে প্রায় ১২টা হবে লাম্বা গ্রুপের এক সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সাথে দেখা ও কথা বলার সুযোগ হয় অনেক ক্ষণ।

পরে জানলাম, গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ নামে পার্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি সুবিধাবাদী চক্র দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের খপ্পড়ে পড়ে পার্টির মতা কুক্ষিগত করা এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামকে বিপথে পরিচালনার উদ্যোগে এক বিভেদপন্থী চক্রান্তের অবতারনা করে। তারা তথাকথিত দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ে সস্তা শ্লোগান তুলে কর্মীবাহিনী ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। সেই থেকে তাদের নাম 'বাট্যা' গ্রুপ নামে পরিচিতি লাভ করে। পক্ষান্তরে এম এন লারমা ও বর্তমান নেতা সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্টিকে 'লাম্বা' নামে আখ্যায়িত করে।

পরবর্তীতে ঐ শান্তিবাহিনী দাদা থেকে খবর পেলাম গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ নেতৃত্বাধীন আদর্শচ্যুত চক্র নির্মূল হয়েছে। অনেকেই শাসকগোষ্ঠীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে আর অনেকেই ভারতে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র কখনোই জয়যুক্ত হতে পারে না। তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ হয়ে যায়। বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীরাও চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

অপরদিকে এম এন লারমা ও বর্তমান নেতা সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্টি ন্যায় ও সত্যের পথে এবং জনগণের অধিকারের পক্ষে ছিল বলে তারা জয়যুক্ত হতে পেরেছে। গৃহযুদ্ধের রক্তপিচ্ছিল পথে জুম্ম জনগণ পার্টি প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা এম এন লারমাকে হারালেও গৃহযুদ্ধ-উত্তর কালে দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নামক জুম্মদের অধিকার সনদে স্বাক্ষরে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুগে যুগে সুবিধাবাদীরা সুযোগ বুঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তারা শাসকগোষ্ঠীর সাথে গাঁটছড়া

বেঁধে নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালে প্রথমে ইউপিডিএফ এবং পরে সংস্কারপন্থী খ্যাত আদর্শ-বিচ্যুতিরা পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। তারা পার্টির নেতৃত্বকে চিরতরে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে সামনে থেকে গলাটিপে হত্যার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র যেভাবে এম এন লারমাকে হত্যা করেছে নব্য চক্ররাও বর্তমান নেতা সন্তু লারমাকে হত্যা করতে তৎপর রয়েছে। উল্লেখ্য, ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ ইউপিডিএফ ও আদর্শ-বিচ্যুত সংস্কারপন্থীরা যৌথভাবে পরিকল্পনা করে সন্তু লারমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ি যাবার পথে হামলা করে। বিভেদপন্থীদের মতো তাদের ষড়যন্ত্রও সফল হবে না, হতে পারে না। বিভেদপন্থীদের মতো তারাও ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ হতে বেশী দেরী নেই।

আজ ১০ নভেম্বর ২০১১ সাল। এম এন লারমার স্বপ্ন এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এবং জুম্ম জনগণের অধিকার এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর আজ ১৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আসুন, এই শোকাবহ দিনে দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে এম এন লারমাসহ যারা জুম্মজাতির অধিকারের জন্য শহীদ হয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন তাঁদের অমূল্য আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নতুন করে শপথ গ্রহণ করি; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করে এম এন লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি; সর্বোপরি জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াই।

সাদাসিধে কথা

কারও মনে দুঃখ দিয়ো না...

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মে মাসের শেষের দিকে আমি দেশের বাইরে, ইন্টারনেটে খবরের কাগজ পড়ি। একদিন পত্রিকায় একটা খবর পড়ে আমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। জাতিসংঘের কোন একটা অধিবেশনে বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি ঘোষণা দিয়েছেন, বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই (ডেইলি স্টার, ২৮ মে)! মাত্র অল্প কয়দিন আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে- প্রথমবারের মতো আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, প্রতিবন্ধী কোটার সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী কোটায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করেছি। দেশের বাইরের নেপালি ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে এসেছি, অথচ দেশের চাকমা, মারমা, ম্রো, সাঁওতাল বা গারো ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারি না; সেটা নিয়ে আমাদের দুঃখবোধ ছিল। আদিবাসী কোটায় তাদের পড়াতে পারব, সেটা নিয়ে আমাদের একধরনের আত্মতুষ্টি ছিল, কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। দেশে যদি আদিবাসী নেই, তাহলে আদিবাসী কোটায় আমরা কাদের ভর্তি করেছি? শুধু কি তাই, কত হই চই করে শিক্ষানীতি করা হয়েছে, আমিও সেই কমিটির একজন সদস্য, সেই শিক্ষানীতিতে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা লিখে এসেছি। তাহলে আমাদের সেই কথাগুলো কার জন্য?

দেশে থাকলে বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যেত। বিদেশে এখন পরিচিত দেশের মানুষ শুধু আমার স্ত্রী। কাজেই তার সঙ্গেই আমি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি তাকে বোঝালাম, ফার্স্ট সেক্রেটারি নিশ্চয়ই অনভিজ্ঞ মানুষ, এক কথা বলতে গিয়ে আরেক কথা বলে ফেলেছেন। জাতিসংঘের অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা পকেট থেকে ভুল কাগজ বের করে ভুল ভাষণ দিয়ে ফেলেন বলে শুনেছি। এটা সম্ভবত সে রকম একটা কিছু। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এ রকম বেফাঁস একটা কথা বলে ফেলার জন্য তাঁর চাকরি চলে যায় কি না, সেটা নিয়েও আমরা একটু দুশ্চিন্তা অনুভব করলাম।

সপ্তাহ খানেক আগে খবরের কাগজ পড়ে আমার আবার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি আবার সেই কথাগুলোই বলেছেন, আরও অনেক স্পষ্টভাবে। বিভ্রান্তির বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। আমাদের দেশের যেসব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর জন্য আমার অনেক শ্রদ্ধাবোধ, ডা. দীপু মনি তাঁদের একজন। রাজনীতি করার আগে তিনি যেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, সে রকম আর কেউ আছেন কি না তা আমার জানা নেই। তিনি যদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী না হয়ে একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা হতেন, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর বাসায় হাজির হয়ে বিষয়টা বুঝতে চাইতাম। এখন আমি জানি, এর মধ্যে বোঝাবুঝির কিছু নেই। অনেক ওপরের পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, নিচের পর্যায়ে এখন স্টিম রোলার চালানো শুরু হয়েছে, কারও কিছু করার নেই।

কিন্তু তাই বলে কি আমরা আমাদের দুঃখ বা শোকের কথা বলতে পারব না? প্রথমত, আদিবাসী কথাটা ডিকশনারিতে কীভাবে ব্যাখ্যা করা আছে, সেটা দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুল -কলেজের বির্তকের শুরুতে ডিকশনারি বা এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে ব্যাখ্যা দেয়। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সেটা করতে হয়- আমি জানতাম না। শুধু কৌতূহলের জন্য আমি ডিকশনারিতে ক্রসফায়ার শব্দটির অর্থ খুঁজেছি। র‍্যাব যখন বিনা বিচারে, সন্দেহভাজন কাউকে গুলি করে মেরে ফেলে, সেটা হচ্ছে ক্রসফায়ার- ডিকশনারিতে সেটা লেখা নেই। আমার বাসায় আরবি ডিকশনারি নেই, থাকলে রাজাকার শব্দটির অর্থ খুঁজে দেখতাম। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী বা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মতো দেশদ্রোহী মানুষ যাঁরা স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পদলেহী হয়ে এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন রাজাকার- সেই কথাটি ডিকশনারিতে লেখা থাকবে না। আমি যত দূর জানি, সেখানে রাজাকার শব্দের অর্থ লেখা আছে সাহায্যকারী। কাজেই সব শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য ডিকশনারিতে যেতে হয় না। অনেক শব্দ আছে যার অর্থ ডিকশনারিতে বেঁধে দেওয়া অর্থ থেকে অনেক বেশি ব্যাপক। আদিবাসী ঠিক সে রকম একটা শব্দ। আমরা বহুদিন ধরে এই শব্দটা ব্যবহার করে আসছি। হঠাৎ করে দেশের সরকার তাদের নিজস্ব একটা অর্থ দিয়ে এটাকে বেঁধে ফেলতে পারবে না। যদি তার চেষ্টা করা হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা খুব দুর্ভাবনায় পড়ে যাব।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পরপরই জাতিসংঘের আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্য রাজা দেবাশীষ রায় প্রথম আলোতে একটা লেখা লিখেছিলেন (২৯ জুলাই ২০১১)। সেখান থেকে আমরা জানি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক কিছুই ঠিক বলেননি। একজন মানুষ একটা ভুল তথ্য দিতে পারেন, সেটা পরে শুদ্ধ করে নিলে ঝামেলা মিটে যায়। এবারের বিষয়টি আরও চমকপ্রদ-বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, তারা বাংলাদেশ সরকারের ব্যাখ্যাটা

মেনে নেবে না, বহুদিন থেকে সর্বজন স্বীকৃত যে ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে আছে, সেটাই তারা মেনে চলবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পুরো বক্তব্যটা আসলে মধুর বক্তব্য নয়, তাঁর ভেতরে কেমন জানি হিংসা হিংসা ভাব। তাঁর বক্তব্য দিয়ে মনে হচ্ছে পুরো দেশটাকেই একটা হিংসুটে, নীচ, সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হলো। আমরা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই, এটা মোটেও আমাদের দেশের মানুষের কথা নয়। আমাদের দেশের মানুষ রীতিমতো যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে যখন এই দেশ স্বাধীন করেছিল, তখন সবচেয়ে বড় বিষয়টিই ছিল যে এই দেশের সব মানুষ সমান। এই দেশের মানুষকে আমরা সংবিধানে স্বীকার করে নেব, তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকারটুকু দেব।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেছেন, জনসংখ্যার মাত্র ১ দশমিক ২ শতাংশ মানুষকে বিশেষ আর উন্নত পরিচয় দিতে গিয়ে বাকি ৯৮ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষের অধিকার হরণ করা যাবে না। আমরা তো সবাই একসঙ্গে ছিলাম, হঠাৎ করে কেন আমাদের একে অন্যের প্রতিপক্ষ তৈরি করা হলো? কেন বোঝানো হলো তাদেরকে কিছু একটা দিতে হলে সেটা আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দিতে হবে? শুধু কি তাই, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পাহাড়ি মানুষের জন্য একধরনের তাচ্ছিল্য আর অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন, তারা বাঙালিদের মতো এখানকার খাঁটি অধিবাসী নয়, ইতিহাসের কোনো এক সময় 'অর্থনৈতিক' সুযোগ-সুবিধার জন্য এই দেশে 'রাজনৈতিক' আশ্রয় নিয়েছে মাত্র। আমেরিকা-ইউরোপে আদম ব্যাপারিরা যেভাবে লোকজন পাঠিয়ে দেয়, তারা ছোটখাটো কাজ করে টাকা-পয়সা কামাই করে এবং চেষ্টা করে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে পাকাপাকিভাবে থাকার জন্য– ব্যাপারটা ঠিক সে রকম। আমি জানি, তাঁর এই বক্তব্যে পাহাড়ি মানুষেরা মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। ব্যাপারটির সত্য-মিথ্যা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলছি না- হঠাৎ করে কেন এটা এভাবে বলা হলো, আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করছি। আমরা তো চেষ্টা করি আমাদের কথাবার্তায় কাজকর্মে কাউকে আঘাত না দিতে। হঠাৎ করে কেন গায়ে পড়ে কিছু মানুষকে অপমান করা হলো?

আমি বিষয়টি ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাইনি। তখন হঠাৎ করে খবরের কাগজে ছোট একটা খবর পড়ে আমার মনে হলো, আমি পেছনের কারণটি অনুমান করতে পারছি। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী হিসেবে অসম্ভব দক্ষতা নিয়ে কাজ করে এসেছে। আমি জানি তাদের এই কাজ শুধু দায়িত্ব পালন নয়, তার থেকে অনেক বেশি আন্তরিক। সে জন্য কোনো একটি দেশ তাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকেই স্থান করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমি শুনেছি, আমাদের সেনাবাহিনীর লোকজন সে দেশে এত জনপ্রিয় যে তারা যদি সে দেশে ইলেকশনে দাঁড়াতে পারত, তাহলে বিপুল ভোটে বিজয় পেতে পারত। এই খবরগুলো জেনে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সবার ভালো লাগে।

এর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও সত্যি, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক পাহাড়ি মানুষ আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়েছে। বিষয়টা দেশের মানুষের কাছে গোপন ছিল। শান্তিচুক্তির ঠিক আগে আগে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের ২ তারিখ সব পত্রপত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি ছাপানো হয়েছিল। সেই ঘটনাপঞ্জি যারা পড়েছে শুধু তারাই জানে, সেই এলাকায় মানবতার বিরুদ্ধে কী ভয়ংকর অপরাধ করা হয়েছিল। শান্তিচুক্তির পর হঠাৎ করে সব বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা সত্যি নয়। আমরা জানি, তার পরও পাহাড়ি মানুষেরা নানা ধরনের বিচ্ছিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। শুধু যে পত্রপত্রিকায় পড়েছি তা নয়, আমি নিজের কানেও তাদের কাছ থেকে তার কিছু বর্ণনা শুনেছি।

আদিবাসী বির্তক শুরু হওয়ার পর আমি খবরের কাগজে দেখেছি, জাতিসংঘে আলোচনা করা হচ্ছে, সেনাবাহিনীর যেসব সদস্য আদিবাসীদের সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, তাদের যেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে না দেওয়া হয়। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেনাবাহিনী যে শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসক দিয়ে ফেলেনি, তার পেছনেও এই শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দেওয়ার সুযোগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কাজেই এখন যদি আদিবাসীর ওপর অত্যাচার করাটা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দেওয়ার জন্য একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার সবচেয়ে সহজ সমাধান হবে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া, এই দেশে আদিবাসী বলেই কিছু নেই। যদি আদিবাসী না থাকে, তাহলে তাদের ওপর অত্যাচারটা করার প্রশ্নই তখন থাকবে না। অত্যন্ত জটিল একটা সমস্যার এর থেকে সহজ সমাধান আর কী হতে পারে?

এটি আমার একটি অনুমান, যদি সরকার বা সেনাবাহিনীর কেউ আমার অনুমানটিকে ভুল প্রমাণ করিয়ে দেন, তাহলে আমার থেকে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।

২.

আমি যখন যুক্তরাষ্ট্র বেল কমিউনিকেশন্সে কাজ করি তখন মাঝেমধ্যেই আমাদের গ্রুপের সবাই দল বেঁধে পিতজা (শব্দটা পিজা বা পিজজা নয়, আসলে পিতজা) খেতে যেত। একদিন সে রকম একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে হঠাৎ করে আমি লক্ষ্য করলাম, আমাদের গ্রুপে সাদা চামড়ার আমেরিকানের সংখ্যা বলতে গেলে নেই। সেখানে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ভারতীয়, বাংলাদেশি (আমি), চায়নিজ, কোরিয়ান, গ্রিক এককথায় পৃথিবী সব দেশের মানুষ আছে। আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এত দ্রুত পৃথিবীতে এত

ওপরে উঠে গেছে, তার একটা কারণ হচ্ছে সারা পৃথিবীর সব কালচারের মানুষ এখানে পাশাপাশি থাকে। ডাইভারসিটি বা বৈচিত্র্য হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটা সম্পদ।

দেশে ফিরে এসে আমি এই বৈচিত্র্যের অভাবটি খুব বেশি অনুভব করেছি। আমাদের সবাই দেখতে এক রকম, আমরা প্রায় সবাই এক ভাষায় কথা বলি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ভিন্ন দেশ নেপালের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পড়িয়ে আসছি, কিন্তু আমার নিজের দেশের একজন সাঁওতাল, গারো বা ম্রো ছাত্রছাত্রীকে এখানে পড়াতে পারিনি- সেটা আমার অনেক বড় দুঃখ। কয়েক বছর আগে আমি রাঙামাটির একটা স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানে পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। সেখানে হঠাৎ করে ল করলাম, একটা ছোট পাহাড়ি শিশু একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা বই এবং সে খুব সাহস করে আমার কাছে আসতে পারছে না। এটি আমার জন্য একটি খুবই পরিচিত একটা দৃশ্য। আমি তাকে কাছে ডাকলাম এবং হাতে ধরে রাখা আমার লেখা কোনো একটা কিশোর উপন্যাসে অটোগ্রাফ করে দিলাম। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, সে ম্রো শিশু এবং সে যেখানে থাকে তার আশপাশে কোনো স্কুল নেই বলে রাঙামাটির এই স্কুলে হোস্টেলে থেকে পড়ে। বইমেলা চলার সময় কোনো কোনো দিন বাংলা একাডেমীর বটগাছের নিচে বসে বসে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে অটোগ্রাফ দিয়েছি। কিন্তু সেই একটি ম্রো শিশুর বইয়ে অটোগ্রাফ দিতে আমি তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, আমি এই দেশের আদিবাসী একটা শিশুর কাছে পৌঁছাতে পেরেছি।

শৈশবে আমার বাবা বান্দরবানে পুলিশ আফিসার হিসেবে ছিলেন। আমি সেখানকার স্কুলে পড়েছি। আমাদের স্কুলে অল্প কয়েকজন বাঙালি ছেলেমেয়ে ছিল। বেশির ভাগই ছিল পাহাড়ি। আমার মনে আছে, আমার সেই পাহাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে শঙ্খ নদের তীরে কিংবা বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাষার খানিকটা দূরত্ব ছিল, কিন্তু সেটি মোটেও কোনো সমস্যা ছিল না। শুধু ভাষা নয়, তাদের গায়ের রং, মুখের ছাপ, পোশাক, আচার-আচরণ সেগুলোও ভিন্ন ছিল, কিন্তু সেই শৈশবে আমি নিজের মতো করে আবিষ্কার করেছিলাম, এই ভিন্নতাটুকুই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বড় হয়ে বুঝেছি, বৈচিত্র্যটাই হচ্ছে সৌন্দর্য। সবচেয়ে বড় কথা, আমার সেই পাহাড়ি বন্ধুরা আর আমরা কিন্তু একই মানুষ।

তাই আমার খুব দুঃখ হয়, যখন দেখি এই দেশে আমার সব অধিকার আছে, অথচ আমার শৈশবের সেই বন্ধুরা এই দেশে সংবিধানে একটুখানি অধিকারের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে, তারা সেটা পাচ্ছে না। শুধু যে পাচ্ছে না তা নয়, একেবারে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাদের অবহেলা করে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। বিষয়টা কেমন করে নিষ্পত্তি হবে আমি জানি না। আমি শুধু একটা জিনিস জানি, এই দেশের সব মানুষ যখন কোনো একটা কিছু চায়, তখন তারা সেটা আদায় করে নিতে পারে। আর দেশের মানুষের কোনো একটা কিছু চাওয়া শুরু হয় এই দেশের তরুণ প্রজন্ম দিয়ে। তাই আমার খুব ইচ্ছে, এই দেশের তরুণ প্রজন্ম বিষয়টা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করুক। তাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন একজন গারো, সাঁওতাল কিংবা ম্রো সহপাঠী নেই, সেই প্রশ্নটা সবাইকে করতে থাকুক। সারা পৃথিবী যখন 'ডাইভারসিটি' নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে, তখন আমরা কেন সেটাকে চাপা দিয়ে চোখের আড়াল করতে চাইছি, সেটা জানার চেষ্টা করুক। আমরা বাঙালিরা শতকরা ৯৮ দশমিক ৮ ভাগ থেকেও মাত্র ১ দশমিক ২ ভাগ আদিবাসী মানুষের দায়িত্ব নিতে পারব না, সেটা তো হতে পারে না।

৩.

আদিবাসীদের নিয়ে এই বির্তকটুকু দেখে আমি একটু আতঙ্ক অনুভব করেছি। তার কারণ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, সেখানে ৯৮ দশমিক ৮ শতাংশ বাঙালি যে বাকি ১ দশমিক ২ ভাগ মানুষ থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টা কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যখন কোনো জাতি নিজেকে অন্যদের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণভাবে, তার ফল হয় ভয়ানক। জার্মানির নাৎসিরা ভেবেছিল, নানকিংয়ে জাপানিরা ভেবেছিল, ফিলিস্তিনে ঐশ্বরিক অধিকার পাওয়া ইসরায়েলিরা ভাবে। সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে নরওয়ের গণহত্যাকারী সেই উন্মাদ, যার ধারণা তার খাঁটি জাতিটাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। আমরা দুর্নীতিপরায়ণ, অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ জাতি, আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই- আমি মোটেও সে কথা বিশ্বাস করি না। আমি প্রায় অনুভব করতে পারি, আমাদের নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে যাচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এটাও বিশ্বাস করি না, দেশের ৯৮ দশমিক ৮ ভাগ মানুষ হিসেবে এই দেশে আমার অধিকার বেশি।

আদিবাসী বির্তক দেখে আমি হয়তো দুর্ভাবনা অনুভব করেছি, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এই দেশের আদিবাসীরা একটা আঘাত পেয়েছে, তাদের ভেতরকার অনুভূতি হচ্ছে দুঃখ।

আমি জানি না সরকারকে কোনো কথা বলা যায় কি না। যদি যেত, তাহলে আমি তাদের ওমর খৈয়ামের কবিতার একটি লাইন শোনানোর চেষ্টা করতাম-

'কারও মনে দুঃখ দিয়ো না, করো বরং হাজার পাপ–'। হাজার পাপ করার থেকেও কারও মনে দুঃখ দেওয়া যে অনেক বেশি নির্মম, এই সহজ কথাটা বোঝা কি এতই কঠিন?

.....

মুহম্মদ জাফর ইকবাল: লেখক। অধ্যাপক শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্রষ্টব্য: এই লেখাটা দৈনিক 'প্রথম আলো'য় ৯ আগস্ট ২০১১ প্রকাশিত হয়। পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য পুনর্মুদ্রণ করা হলো- তথ্য ও প্রচার বিভাগ।

যুক্তি তর্ক গল্প

আদিবাসীদের ভয় কেন?

আবুল মোমেন

রবীন্দ্রনাথের একটি বহুশ্রুত গানে আছে 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না/ হায় ভীরু মন হায় রে'। প্রেমিক মনে এমন ভীরুতা থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু দেশ চালানোর মতো শক্তপোক্ত কাজে এমন হলে চলে না। মনে হয়, বাঙালি মনস্তত্ত্বের গভীরে 'হারাই হারাই' ভাবটা খুব জাগ্রত, তাকে উতলা করে রাখে। এই বুঝি ইমান নষ্ট হলো, বুঝি ইসলাম গেল, এই বুঝি সার্বভৌমত্ব গেল, বুঝি ভারত নিয়ে গেল দেশ ইত্যাদি। এই উতলা মনের হদিস যারা জানে, তারা দরকার পড়লে যেকোনো ইস্যু কাজে লাগিয়ে বাঙালি মনকে নাজুক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। ভীরু মন তো যেকোনো উপলক্ষেই জান বাঁচাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে।

আমরা যুদ্ধ জয় করে দেশটা স্বাধীন করেছি, মানুষের মন জয় করে এ দেশের মানুষ ইসলামের জয় পতাকা উড়িয়েছে হাজার বছর আগে। উর্দু আর উর্দুভাষীর আগ্রাসন ঠেকিয়ে বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয়ও বেশি দিনের কথা নয়। তবু তটস্থ থাকে যেন আমাদের ভয়কাতুরে মন।

দুটি ফ্রন্ট থেকেই এতকাল এ ভয়ের আগ্রাসন চলেছে- ইমান ও ইসলাম হারানোর ভয় এবং ভারতের কাছে সার্বভৌমত্ব খোয়ানোর ভয়। সাধারণত ভারত-রাষ্ট্র এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সম্প্রদায়-সংস্কৃতি লক্ষ্য করে এ ভয়ের সংস্কৃতিচর্চা করেছে আওয়ামীলীগ বিরোধী সব দল, বর্তমানে যার নেতৃত্বে বিএনপি। একই মনস্তত্ত্ব থেকে এতকাল বিএনপি দেশের ক্ষুদ্র জাতিগুলো নিয়েও একটা ভয়ের সংস্কৃতি চালু রেখেছিল, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি রাজনৈতিক শক্তিকে ভারতীয় জুজুর ভয় দেখিয়ে চাপে রাখা। বলা বাহুল্য, এ রাজনীতির মূল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল আওয়ামীলীগ।

আওয়ামীলীগ তার প্রতিপক্ষের রাজনীতির অনেকটাই ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে, যেমন- রাষ্ট্রধর্ম। এবার আদিবাসী ইস্যুতে বিএনপির চেয়েও যেন কঠোর অবস্থানে গিয়েছে তারা। একসময় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে আমরা উপজাতি বলতাম। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নৃতত্ত্বের চর্চা ভালোভাবে চালু হওয়া এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের অধিকারের বিষয় সামনে চলে আসায় এ ক্ষেত্রে অনেক নতুন সংজ্ঞা, ধারণা ও ব্যাখ্যা সবার বিবেচনায় এসেছে ও গৃহীত হয়েছে। শিশু, কন্যাশিশু, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ ইত্যাদি নানা রকম অবস্থা, অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে অধিকার সুরক্ষার প্রয়াসগুলো সামনে এসেছে। এভাবেই আদিবাসী ধারণাটি এসেছে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে আলাদা ঘোষণা তৈরি হয়েছে। শিল্প-বিপ্লবোত্তর আধুনিক বিশ্বের একটি বড় সমস্যা হলো, একদিকে যেমন জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে মানবজগতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। আজ পৃথিবীতে প্রতি ১৫ দিনে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে। তারও চেয়ে সংকট হলো, ইংরেজি ভাষার ব্যাপক আগ্রাসন ও আধিপত্যের ফলে বিশ্বের অনেক ভাষার চর্চা হ্রাস পাচ্ছে এবং ফলে সেসব ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। চীনের মতো একটি প্রায়-মহাদেশ তার সাংগীতিক ঐতিহ্যের অনেকখানি হারিয়ে ফেলে পশ্চিমা বাদ্যযন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। জাপানে এ প্রবণতাই প্রধান। আফ্রিকার বহু দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারেনি। কোনোটি ফরাসিভাষী, কোনোটি পর্তুগিজ আর কোনোটি ইংরেজিভাষী দেশে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমা ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের চরম ও নিষ্ঠুর প্রকাশ ঘটেছে দুই আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে। এসব অঞ্চলে আক্রমণকারী দখলদারেরা সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থানীয় আদিবাসীদের গণহারে হত্যা করে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। আজ এসব ভূমিপুত্র বা আদিবাসী অতি সংখ্যালঘু হিসেবে সেসব দেশে টিকে আছে। একদিকে জনসংখ্যার স্বল্পতা, দারিদ্র, নিজস্ব ভাষায় আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সমস্যা; আর অন্যদিকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর শক্তিশালী ক্ষমতাধর বেগবান সংস্কৃতির চাপের ফলে যেকোনো রাষ্ট্রে এই আদিবাসীদের অবস্থান খুবই দুর্বল। প্রতিবেশী সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর আয়তনগত স্বাভাবিক প্রভাব, শিল্প-সাহিত্যের সমৃদ্ধিগত প্রভাব এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার চাপ মিলে স্বল্প জনসংখ্যার আদিবাসী মানুষ মারাত্মক সাংস্কৃতিক চাপের মধ্যে পড়ে যায়। বাংলাদেশের ৩০-৪০ টি আদিবাসী গোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, এ রাষ্ট্রে তাদের বিকশিত হতে হলে বাংলা ভাষা ও অনেকাংশ বাঙালি সংস্কৃতির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। রাষ্ট্র ও বৃহত্তর সমাজ যদি এ ক্ষেত্রে সচেতন না হয়, সমব্যথীর মন নিয়ে তাদের পাশে না দাঁড়ায় তাহলে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

এমন এক বাস্তবতায় এসে পৌঁছেছি আজ, যখন মানুষের মৃত্যুও আমাদের মনে বাজে না, যদি না তা স্বজনের মৃত্যু হয়। ভাষার মৃত্যু, সংস্কৃতির বিলুপ্তি সম্পর্কে আমরা ততটা সংবেদনশীল নই। বাঘ নিয়ে কিছু প্রচারণা চলছে, গাছ রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ছে, নদী বাঁচানোর জন্যও আমরা আজকাল কথা বলছি। অথচ আমাদের প্রতিবেশী ৩০-৪০ টি ভাষা ও সংস্কৃতিকে হারিয়ে যেতে দিতে আমাদের আপত্তি নেই।

আমরা বুক ফুলিয়ে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়ার কথা বলি, গর্ব করি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে, কত না আবেগ দিয়ে গাই 'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা'। সেই আমরাই কিনা গারো ছেলেটি, মারমা মেয়েটি, খাসিয়া যুবতীটি, তঞ্চগ্যা কিশোরটি, পাংখো বৃদ্ধাটির প্রাণের ধন মায়ের ভাষাটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছি না। আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা কি এতই উগ্র যে তা চাকমা ভাষা আর গারো জীবনের কান্না শুনতে পায় না?

অনেক দিন ধরেই দেশে দেশে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে দুর্বলের তথা প্রান্তিকজনের বেদনা অগ্রাহ্য করে চলেছে। জাতিসংঘের একটি হিসাবে বলা হচ্ছে, এভাবে পৃথিবীর ৭২ টি দেশে ৩০-৩৫ কোটি আদিবাসী রয়েছে, যারা আবার প্রায় পাঁচ হাজার ভিন্ন জনজাতিতে বিভক্ত। আদিবাসী জনগোষ্ঠী যেন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের খনি। বিশ্বের দেশে দেশে মানবদরদি, সংস্কৃতিচেতন বিশ্ব নাগরিকদের সোচ্চার হতে হয়েছে সংখ্যাগুরুর অসচেতনতা ও আগ্রাসনে ক্ষয় পেতে থাকা, হারিয়ে যেতে বসা জনগোষ্ঠীর জন্য। তাদেরই কণ্ঠস্বর পৌঁছেছে জাতিসংঘ অবধি। আর তা থেকে আদিবাসী ইস্যু, তাদের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন উঠেছে। পৃথিবীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষার এ আয়োজন এক দিনে হয়নি। ১৯৮২ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ইকোসক) তৈরি করে আদিবাসীবিষয়ক কর্মদল (ডব্লিউজিআইপি), যার ভিত্তি একটি বিশেষজ্ঞ দলের দীর্ঘ গবেষণা। ১৯৮৫ সালে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় ঘোষণা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে খসড়াটি চূড়ান্ত হয়। এটি সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও তাদের প্রতি বৈষম্য রোধসংক্রান্ত কমিটি পর্যালোচনা করে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠী কনভেনশন ১৯৮৯ গ্রহণ করে। আরও কয়েক ধাপ পেরিয়ে ঘোষণাটি ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। ১৪৩ টি দেশ পক্ষে, চারটি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়, আর ১১টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে, যার একটি বাংলাদেশ।

সংক্ষেপে আদিবাসী হলো সেসব জনগোষ্ঠী, যারা ঔপনিবেশিক শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্ট 'আধুনিক' সংস্কৃতির আওতার বাইরে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ভিত্তিতে জীবনধারা পরিচালিত করে চলেছে। স্বভাবতই তারা বিশেষ জনগোষ্ঠী। মনে রাখা দরকার, বাঙালি কোনো নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নয়, ভাষাজাতি; যেমন- আর্য ও দ্রাবিড়। চাকমা, মারমা, মণিপুরিরাও ভাষাজাতি, তবে ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত তারা। বাংলা হলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীরই একটি ভাষা। আর চাকমা, মারমা, মণিপুরি, খাসিয়া, ত্রিপুরিদের ভাষা সম্ভবত ভোটচেনিক ও মন্-খমের ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। সাঁওতাল-ওঁরাওদের ভাষা অস্ট্রিক ভাষার অপভ্রংশ উপভাষা। বাংলা এ অঞ্চলের মূলত বদ্বীপ সমতলের মানুষের ভাষা, যারা যুগ যুগ ধরে সব মিশ্রণ-রূপান্তর-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এখানে বসবাস করছে। তারা এখানকার ভূমিপুত্র, এখানকার অধিবাসী।

কিছু মানুষ, যারা দুর্গম বনাঞ্চলে গণ্ডিবদ্ধ ও সুরক্ষিত জীবন কাটিয়েছে, তারা এসব সম্প্রদায়ের বাইরে ছিল। সমতলে গারো-সাঁওতাল-ওঁরাও-মুন্ডা প্রভৃতি এ রকম মানুষ, যাদের আদিবাসী বলতে হবে। আর পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চলে ঐতিহাসিক কালে- অনেকের মতে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে- এসে আশ্রয় নিয়েছিল ভোটচৈনিক ভাষাগোষ্ঠীর ও নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলয়েড মহাজাতিভুক্ত মানুষ। মিশ্রণের বাইরে থেকে তারাও আদিবাসী। সাধারণভাবে আহরণজীবীর যাযাবর বৃত্তির পর্ব শেষ হয়ে বসতি স্থাপন শুরু হয় কৃষি আবিষ্কারের পরে। এ অঞ্চলের মতো উর্বর সুগম সমতল ভূমিতে দলে দলে (প্রাচীরকালে দক্ষিণবঙ্গ অবশ্য সমুদ্র থেকে ওঠেনি) নানা জাতের মানুষ এসে বসতি করেছে। ইতিহাসে সাংস্কৃতিক পরিচয়ে প্রথম পাই অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর কথা, যারা নৃতাত্ত্বিকভাবে ছিল নিগ্রোয়েড মহাজাতির নানা সংযোগী বর্গের মানুষ। এরপর আসে ভাষাজাতি দ্রাবিড়রা, তারপর আর্যভাষীদের আগমন ঘটে। এসব মিশ্রণের ভেতরে দিয়ে গেছে সমতলের কৃষিজীবী মানুষ, যারা আজ বাংলা ভাষার সূত্রে বাঙালি নামে পরিচিত। খুঁজলে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় উপাদানও সহজেই মিলবে।

আদিবাসী বা ইনডাইজেনাস শব্দটি এসব বদ্ধ ও অনেকটাই অবিমিশ্র সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্যই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তারা বৃহৎ সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর পাশে ক্ষুদ্র তো বটেই, তারও চেয়ে শঙ্কার কথা হলো, বৃহত্তের অসচেতনতার ফলে তাদের সংস্কৃতি, জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, বসতি এমনকি জীবনও হুমকির সম্মুখীন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের অবস্থানটা এভাবেই দেখছে, এমনকি সমতলের আদিবাসীরাও এভাবে অস্তিত্বের হুমকি অনুভব করছে। কারণ যে আমরা নিজেদের মাতৃভাষার প্রশ্নে এত আবেগপ্রবণ, এত আপসহীন, তারাই কিনা ক্ষুদ্র প্রান্তিক মানুষগুলোর সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের

অধিকার ও দাবি বুঝতে চাইছি না। যদি তারা এই শঙ্কা ও আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন-সংগ্রামের কথা বলে, তখন তো আমরা একদিকে পুরো অঞ্চলে বাঙালি এবং মুসলিম সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও আগ্রাসন চালানোর ব্যবস্থা করি; আর অন্যদিকে তাদের আত্মবিকাশ ও অধিকারের আন্দোলন দাবিয়ে রাখার জন্য সামরিক অভিযানের আশ্রয় নিই।

সাংস্কৃতিক বিকাশ ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে জবরদস্তির কোনো সুযোগ নেই, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটবে। আমাদের আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও কালের নিয়মে এ পরিবর্তন ঘটে চলেছে, কিন্তু কীভাবে কখন কতটা হচ্ছে ও হবে, সে তো একাডেমিক চর্চার বিষয়, প্রশাসনের কাজ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা ও ন্যায্য অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

দেশের রাষ্ট্রশক্তির মারমুখী রক্ষণশীলতা দেখে বলতে হয়, ৯৮ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ বিশাল বিজয় অর্জনের পরও কেন ভয় পাচ্ছে, কাকে পাচ্ছে, সেটা ঠিক বোধগম্য হলো না।

.....

আবুল মোমেন : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।

দ্রষ্টব্য : এই লেখাটা দৈনিক 'প্রথম আলো'য় ১৩ আগস্ট ২০১১ প্রকাশিত হয়। পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য পুনর্মুদ্রণ করা হলো- তথ্য ও প্রচার বিভাগ।

আদিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বাঙালী জাতীয়তাবাদ

রোবায়েত ফেরদৌস

নির্বাচনী ইশতেহার, আওয়ামীলীগ যাকে দিন বদলের সনদ আখ্যা দিয়েছিল, আদিবাসী বিষয়ে সেখানে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল এরকম: "ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লংঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠী এবং দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।" (নির্বাচনী ইশতেহার, অনুচ্ছেদ ১৮.১ ও ১৮.২) তো খতিয়ে দেখা যাক, গেলো ৩০ জুন পাশকৃত পঞ্চদশ সংশোধনীতে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি কতোটে মিললো? সংবিধানের ৬(২) ধারায় যুক্ত হয়েছে, "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" এর মানে কী? এর মানে খুউব সোজা– এখন থেকে বাংলাদেশে বাঙালী ভিন্ন বসবাসরত অপরাপর জাতিসমূহ যেমন হাজং, কোচ, বানাই, মারমা, চাকমা, গারো, সাঁওতাল, উঁরাও, মুন্ডা, খাসিয়া, মণিপুরী, খুমি, খিয়াং, লুসাই, বম, ম্রো কিংবা রাজবংশীরা চিহ্নিত হবেন বাঙালী জাতি হিসেবে। এর মধ্য দিয়ে আবারও ১৯৭২-এর সংবিধানের সেই ঐতিহাসিক ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করা হলো। এর ফলে গেলো ৪০ বছর ধরে নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান কিংবা বিশ্বরাজনীতির জ্ঞানের যে বিকাশ হয়েছে তাকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলকে এই সত্য কে বোঝাবে যে, বাংলাদেশের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে না আর পৃথিবীর মানুষ নিয়ম করে বিটিভি দেখে না। একজন চাকমার জাতিগত পরিচয় কখনো বাঙালী হতে পারে না- এই ঐতিহাসিক আর নৃবৈজ্ঞানিক সত্যকে বোঝাতে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর মানবেন্দ্র লারমা তৎকালীন সংসদকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তখন তাদের সবাইকে বাঙালী হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। চল্লিশ বছর পর সংশোধিত সংবিধানে আবারও একই ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হলো যে, বাংলাদেশের জনগণ সবাই জাতি হিসেবে বাঙালী হবেন। পাকিস্তান আমলে পশ্চিমারা আমাদের বলতেন পাকিস্তানি জনগণের জাতি হচ্ছে একটিই- মুসলমান জাতি। আমরা তা মানিনি, আমরা বলেছি, আমরা জাতি হিসেবে কখনই মুসলিম না, জাতি হিসেবে আমরা অবশ্যই বাঙালি। সরকার ও সাংসদগণ সংবিধান সংশোধনের সময় জাতি ও জাতিয়তা প্রশ্নে বিশ্বের সমসাময়িক জ্ঞান থেকে বিযুক্ত হয়ে কাজ করেছেন যা মুর্খতারই নামান্তর; আর এটাই সবচেয়ে বড় হতাশার জায়গা- যে বাঙালী ২৪ বছর পাকিস্তানের জাতিগত/ভাষাগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের জাতিগত/ভাষাগত পরিচয় অর্জন করেছে, স্বাধীন বাংলাদেশে সেই বাঙালীরাই আদিবাসীদের ওপর জাতিগত/ভাষাগত নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। যে বাঙালী ২৪ বছর পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে গণতন্ত্র অর্জনের জন্য, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই বাঙালীরাই আদিবাসীদের ওপর সামরিক আধিপত্য বজায় রেখেছে। একসময়কার নির্যাতিত বাঙালী অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতার প্রশ্নে এখন নির্যাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এটাই বোধহয় ইতিহাসের বক্রাঘাত।

আমাদের প্রত্যাশা ছিল শাসকগোষ্ঠী সংবিধানে এই সত্য মেনে নেবে যে, বাংলাদেশ একটি বহু ভাষা, বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির এক বৈচিত্রপূর্ণ দেশ এবং এর মধ্য দিয়ে সকল জাতির পরিচয়, অধিকার ও সংস্কৃতিকে স্থান দেবে: এভাবেই রাষ্ট্র হয়ে উঠবে সবার; কিন্তু দেখি আশার সে রুটিতে লাল পিঁপড়ে। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার যে বহুত্ববাদী নীতি বা বৈচিত্র্যের ভেতরে যে সংহতি তাকে নির্লজ্জভাবে পরিহার করে সংবিধানে ৯ অনুচ্ছেদে যুক্ত করা হয়েছে, "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট বাঙালী জাতি"র মতো অসত্য বাক্য। বাংলাদেশ কোনো একক ভাষা বা একক জাতির রাষ্ট্র নয়। বাংলাদেশে বাঙালী ছাড়াও আরো জাতির মানুষ বাস করে এবং তারা বাংলায় নয়, তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলেন। সংশোধিত সংবিধানে এদেশে বসবাসরত অন্য ভাষাভাষীর মানুষের মাতৃভাষাকেও পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছে। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলেও অন্য ধর্মগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করেছে কিন্তু দেশের অন্য জাতিসমূহের ভাষার অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের সংবিধান ভয়ঙ্কর শব্দহীন এবং নিশ্চুপ।

একুশ আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে। খুবই ভালো খবর; তবে যে বিষয়টি খোলাসা করা দরকার তাহলো ২১ ফেব্রুয়ারির এই স্বীকৃতি, বাংলা ভাষার কোনো স্বীকৃতি নয়। এই স্বীকৃতি নিজের ভাষার জন্য বাঙালি জাতির 'লড়াই' এর স্বীকৃতি। অর্থাৎ ভাষা বা বাংলা ভাষা এখানে স্বীকৃতি পাচ্ছে না বা এতে প্রমাণ হচ্ছে না বাংলা ভাষা সারা পৃথিবীতে 'বিশেষ' মর্যাদার কোনো ভাষা; বরং এতে স্বীকৃতি পেয়েছে ভাষার জন্য বাঙালি জাতির লড়াই। বাঙালি জাতি এর মধ্য দিয়ে 'মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াকু মানুষ' হিসেবে পৃথিবীর বুকে 'বিশেষ' মর্যাদা পাচ্ছে। আর ভাষার প্রশ্নে এই স্বীকৃতির সত্যিকারের অনুবাদ হলো – পৃথিবীর সব মাতৃভাষাগুলোর রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া। ভাষার সঙ্গে ভাত বা জীবিকার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, তাই আদিবাসীদের ভাষায় শিক্ষাদান বা তাদের ভাষা বিকাশে রাষ্ট্রের করণীয় নির্ধারণ আজ জরুরি। বাংলাদেশে বসবাসরত ৪৬টি জাতিগোষ্ঠীর নাগরিকগণ প্রায় ৩০টির মতো ভাষায় কথা বলেন; এসব ভাষার কোনটির কী অবস্থা তা জানার জন্য রাষ্ট্র তরফ থেকে দ্রুত ভাষা জরিপের কাজটি সম্পন্ন করা উচিত, তাদের ভাষা বিকাশের জন্য আদিবাসী ভাষা একাডেমি প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া উচিত। আমরা হয়তো এই সত্যটিই জানিনা যে, বাংলার পরে বাংলাদেশে দ্বিতীয় কথ্য ভাষা হচ্ছে সাঁওতাল।

বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লাখ আদিবাসী বাস করেন এবং তাদের কাছে সবচেয়ে অবমাননাকর শব্দ হচ্ছে 'উপজাতি'; আদিবাসীদের কাছে এটি 'বাতিল', 'পশ্চাৎপদ' ও 'পরিত্যাজ্য' একটি শব্দ। সংবিধানে উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করে প্রকারান্তরে তাদেরেকে অপমান করা হয়েছে; উপরন্তু বাংলাদেশে বসবাসরত বাঙালী ছাড়াও অপরাপর জাতির পরিচয়কে তুলে ধরতে যেয়ে একইসঙ্গে উপজাতি, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধা ব্যবহার করা হয়েছে - যা নিতান্তই হাস্যকর এবং এগুলোর স্পষ্ট কোনো সংজ্ঞায়ন সংবিধানে নেই। এর মধ্য দিয়ে আদিবাসী পরিচয় নির্মাণে পবিত্র (?) সংবিধানে এক ধরনের দ্বিধা আর তালগোল পাকানো হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানে আদিবাসীদের পরিচয়, অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও অধিকারের স্বীকৃতি আছে। যেমন, আমেরিকা, কানাডা, বলিভিয়া, মেক্সিকো, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি দেশে আদিবাসী সাংবিধানিক স্বীকৃতি শুধু নয়, আদিবাসী ভূমি অধিকার ও টেরিটরির মালিকানা পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়েছে। কোনো কোনো দেশে উচ্চতর আদালতের রায় ও নির্দেশনা আছে আদিবাসী অধিকার রক্ষার জন্য। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে আদিবাসীদের আইনগত অধিকার ও চুক্তি রয়েছে রাষ্ট্র ও আদিবাসীদের মধ্যে। মালয়েশিয়ার আদিবাসী 'ওরাং আসলি'দের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন হয়েছিল ১৯৫৪ সালে 'অ্যাবরিজিনাল পিপলস্ এ্যাক্ট' নামে। এমনকি মালয়েশিয়ার হাই কোর্ট আদিবাসীদের পূর্বপুরুষের অধিকৃত ভূমি রক্ষার জন্য রায় দিয়েছিল ২০০২ সালে। ফিলিপাইনে সাংবিধানিকভাবে আদিবাসীরা স্বীকৃত এবং ইনডিজিনাস পিপলস্ রাইটস অ্যাক্ট আছে তাদের। তাছাড়া আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কমিশন আছে ফিলিপাইনে। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও রাশিয়াতে আদিবাসীদের নিজস্ব পার্লামেন্ট আছে। গ্রীনল্যান্ড ডেনমার্কের উপনিবেশ হলেও সেখানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি আছে। আফ্রিকার অনেক দেশে আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও বৈচিত্রের স্বীকৃতি আছে। কোথাও কোথাও বৈষম্যহীনতার কথা বলা আছে। এশিয়ার মধ্যে কম্বোডিয়া, ভারত, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, নেপাল, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, লাওস প্রভৃতি দেশে আদিবাসীরা হয় সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অথবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন ও পলিসি দ্বারা স্বীকৃত। ইন্দোনেশিয়ায় তৃতীয় সংশোধনের সময় সাংবিধানিকভাবে আর্টিক্যাল ১৮ আদিবাসীদের অস্তিত্বকে সম্মান প্রদর্শন শুধু করেনি, তাদের প্রথাগত অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। (সূত্র: ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজিনাস অ্যাফেয়ার্স)

বাংলাদেশে হাজং, কোচ, বানাই, মারমা, চাকমা, গারো, সাঁওতাল, উঁরাও, মুন্ডা, খাসিয়া, মণিপুরী, খুমি, খিয়াং, লুসাই, বম, ম্রো ও রাজবংশীসহ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী বরবাস করেন। তাঁরা তাঁদের স্বকীয়তা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য দিয়ে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভুলে গেলে ভুল হবে যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ সকল আদিবাসীদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অবদান। নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রেখে আদিবাসী জনগণ যাতে সকলের মত সমান মর্যাদা ভোগ করতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য।

আমরা মনে করেছিলাম, চল্লিশ বছরে ভূ-রাজনীতির গতিপ্রকৃতি যেমন পাল্টেছে, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, মন-রুচিও অনেক অনেক পাল্টেছে, তাই এখন যে সংবিধান রচিত হবে তা কেবল ধর্মনিরপেক্ষ হলেই চলবে না, একইসঙ্গে ভাষানিরেপে, জাতিনিরপেক্ষ ও লিঙ্গনিরপেক্ষ হতে হবে। ভুলে গেলে ভুল হবে যে, বাঙালির একক জাতিয়তাবাদের দেমাগ ইতোপূর্বে আদিবাসীদের জন্য রাষ্ট্রীয় শান্তির ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যাই কেবল পয়দা করেছে, কোনো সমাধান বাতলাতে পারেনি। শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে এরকম ধারণা কাজ করে যে একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলতে না পারলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জোরদার হয় না। আমরা মনে করি একক জাতীয়তাবাদের প্রাবাল্য একটি ভুল প্রেমিজ; বরং একটি দেশের

জনবিন্যাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও কৃষ্টির বহুমুখী বিচিত্র রূপই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে; এটিই বৈচিত্রের ঐকতান বা বহুত্ববাদ- বিউটি অব ডেমোক্রেসি। একক জাতিসুলভ দাম্ভিকতা বাদ দিয়ে দ্রুত এই সত্য বুঝতে পারলে রাষ্ট্রের জন্য বরং ভালো যে, বাংলাদেশ কোনো এক জাতি এক ভাষা আর এক ধর্মের রাষ্ট্র নয়; এটি অবশ্যই একটি বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু ধর্মের রাষ্ট্র; সংবিধানেও এর ইঙ্গিত আছে কারণ সংবিধানে দেশের নাম পিপলস রিপাবলিক বলা হয়েছে, বেঙ্গলি রিপাবলিক বলা হয়নি; আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন দাবি থেকে আমরা তাই এক চুলও সরে আসতে পারি না। খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যে, বিচ্ছিন্নতবাদী আসলে কারা? যারা সংবিধানের ভেতর তাদের যথাযথ স্বীকৃতির জন্য লড়াই করছে তারা? নাকি যারা এই স্বীকৃতি না দিয়ে তাদেরকে দূরে ঠেলছে তারা? আমরা মনে করি সংবিধান কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়, আমরা চাইলে আবারো একে সংশোধন করতে পারি, ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীও তাই বলেছেন। সেই আত্মম্ভর আশায় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিসমূহ আবারো তুলে ধরছি:

- দ্বিধা দোলাচল আর অস্পষ্টতার কুয়াশা সরিয়ে সংবিধানে স্পষ্ট করে বসবাসরত ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে 'বাংলাদেশ একটি বহু ভাষা, বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির এক বৈচিত্রপূর্ণ দেশ '- এই বাক্যের সংযোজন করা হোক।
- সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিধিসহ অপরাপর সাম্প্রদায়িক শব্দ, বাক্য ও অনুচ্ছেদসমূহ সংশোধন করে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সংবিধানে সংযোজন করা হোক- "পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি বিশেষ শাসিত আদিবাসী অঞ্চলের মর্যাদা পাবে।"
- সংসদীয় আসনসমূহসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসীদের জন্য জাতীয় সংসদের আসন ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা হোক।
- আইএলও-এর ১০৭ ও ১৬৯ নং কনভেনশন এবং ২০০৭ সালে গৃহীত জাতিসংঘ আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র মোতাবেক আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।
- সাংবিধানিকভাবে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতামুখী অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলোকে বলতে চাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এগিয়ে চলার জন্য এবং আদিবাসীদের সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টিকে আবারো নতুন করে ভাবুন। সংবিধানের ত্রুটিপূর্ণ সংশোধনের প্রতিক্রিয়া আদিবাসীরা দেখাতে শুরু করেছেন, গণমাধ্যমে আমরা তার প্রতিফলন দেখছি। ত্রিশ লাখ মানুষের মনে যে ক্ষোভ আর হতাশা সঞ্চারিত হচ্ছে, দ্রুত তা আমলে না নিলে এখান থেকে অতীতের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে, যা আমরা কেউই চাইনা। আমরা এখনও মনে করি বাংলাদেশ একটি বহু জাতির সম্মানজনক অংশীদারিত্বের রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হওয়ার স্বপ্নকে ধারণ করতে সক্ষম হবে। আমরা চাই দেশে বসবাসকারী সকল জাতির সমান মর্যাদার ভিত্তিতে নতুন করে রচিত হোক আগামীর সংবিধান।

.....

রোবায়েত ফেরদৌস : সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। robaet.ferdous@gmail.com

দ্রষ্টব্য: এই লেখাটা দৈনিক 'সমকাল'-এ ৭ আগস্ট ২০১১ প্রকাশিত হয়। পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য পুনমুদ্রণ করা হলো- তথ্য ও প্রচার বিভাগ।

আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের অধিকার এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি

ধীর কুমার চাকমা

৩১ অক্টোবর ১৯৭২ সাল জুম্ম জাতীয় জীবনে একটি কালো দিবস। সেদিন স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী আদিবাসী জুম্ম জনগণকে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঙালীতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। তখন সংবিধান বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী) করার উপর বাংলাদেশ গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারী আওয়ামীলীগের সদস্য আহম্মদ রাজ্জাক ভূঁইয়া গণপরিষদের বিবেচনাধীন সদ্য রচিত বাংলাদেশ সংবিধান বিলের উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সাথে সাথে তার প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বজ্রকঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠলেন "স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ বাঙালী নই। তিনি ঐদিন আবেগঘন কণ্ঠে বলেছিলেন– "আমি ...আমার বাপ, দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলেন নাই আমি বাঙালী। ...আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালী বলে নয়।"

আজ থেকে ৩৯ বছর আগে তখন সবেমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদের অধিবেশনে এম এন লারমা উক্ত উদ্ধৃত ভাষণ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রথম নির্বাচিত জুম্ম সাংসদ ছিলেন মানবেন্দ্র নারয়ণ লারমা ও চাইথোয়াই রোয়াজা। এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল থেকে এবং চাইথোয়াই রোয়াজা দক্ষিণাঞ্চল আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৭০ সালে মাত্র ৩১ বছর বয়স্ক নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, তারপর ১৯৭৩ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের আশা-ভরসার প্রতীক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল কোন শাসনামলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও উন্নয়ন নামক শব্দ দুটি ছিল আজানা। রাজাদের রাজত্ব ছিল; ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর হাতে রাজনৈতিক শাসনক্ষমতা ছিল। কিন্তু জুম্ম জনগণের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছাড়া কিছুই ছিল না। তাই সবেমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনামলকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ইতিবাচক হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল। পাকিস্তান ও ব্রিটিশ আমলে যা হয়নি নতুন বাংলাদেশ সরকারের আমলে গণতান্ত্রিক উপায়ে জুম্ম জনগণ তাদের অধিকার পূরণের ব্যাপারে ছিল সীমাহীন আশাবাদী। তাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতির সমিতির পতাকাতলে জুম্ম জনগণ সমবেত হয়েছিল। আজ মহান নেতা এম এন লারমার ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। ২৮টি বছর আগে তাঁর জীবদ্দশায় '৭২ সাল ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা কাল।

দেশ গঠনের শুরুতেই গণতন্ত্রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের উপর বাঙালী জাতীয়তাবাদ চাপানো হয়েছিল। '৭২-এর সেই কালো দিবসের অবসান না হতেই আবারো সন্নিবেশিত হলো আরো একটি কালো দিবস; বিগত ৩০ জুন ২০১১ তারিখে। সেদিন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের আদিবাসীদের দ্বিতীয় বারের মতো আবারো 'বাঙালী' বানানো হলো যার বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণ প্রতিবাদ করেছিল। ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এ সংগ্রামের অবসান হয়েছে। কিন্তু সরকার কথা দিয়ে কথা রাখেনি। উপরন্তু আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার আদিবাসীদের সকল আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান পাস করে দেশের আদিবাসীদের হতাশ করেছে ।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংসদ ভবনের ভিতর এই "জাতি সমস্যার" সমাধান মিলেনি। অথচ সমাজতান্ত্রিক সমাজ তথা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয়েছিল। যেমনি রচিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধান। জমিদারতন্ত্র ও পুজিতন্ত্রের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল লেনিনের দেশে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের সংবিধান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি দিয়েছিল। মহান নেতা এম এন লারমাও সবেমাত্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আপামর মেহনতি জনগণের জন্য ভিন্ন আঙ্গিকে অনুরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছিলেন। চেয়েছিলেন সমগ্র দেশের মেহনতি মানুষের জীবন-জীবিকার অনুকুল একটি সংবিধান, যে সংবিধান দেশে জাতি সমস্যার সমাধানসসহ সমগ্র দেশের খেটে খাওয়া মানুষের শোষণ ও

বঞ্চনার অবসান ঘটাতে ক্ষসম। কিন্তু তা হয়নি। বাংলাদেশের সেই সংবিধান জাতিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উপহার দিতে পারেনি। পারেনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে। বিপরীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলেন। আর ইতিপূর্বে তার সরকার কর্তৃক এম এন লারমার দাবী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় বারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহকে বাঙালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো। ফলে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি দেশের আদিবাসীদের যেটুকু ন্যূনতম বিশ্বাস ও আশা ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে যায়।

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এই চার মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ঘোষণাকে বাংলাদেশের আপামর জনগণ আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণসহ দেশের আপামর আদিবাসীরাও অভিনন্দন জানিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনেক আদিবাসী মুক্তি বাহিনীর প্রদত্ত সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। তা সত্ত্বেও নতুন এই রাষ্ট্রের সংবিধানে আদিবাসীদের ঠাঁই হলোনা। মেহনতি মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশের সংবিধানে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের চরিত্র মোটেই পাল্টায়নি। শাসকগোষ্ঠীর হাত বদল হয়েছে মাত্র। কারণ ঘোষিত চার মূলনীতির অন্তরালে একদিকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শাসন-শোষণ বজায় রাখার জন্য ক্ষমতার রাজনীতি অপরদিকে শাসিত-শোষিত জনগণের সকল প্রকার শাসন-শোষণ মুক্তির রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এ দু'টি ধারা প্রতিনিয়ত স্পষ্টতর হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ চায় সকল প্রকার জাতীয় নিপীড়ন-নির্যাতনের অবসান করে বৈষম্যহীন সমাজ অপরদিকে বাংলাদেশের উগ্র বাঙালী জাত্যাভিমানী শাসকগোষ্ঠী চায় পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র দেশে উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠা। যার কারণে দেখা গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের দমন-পীড়ন কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালের গোড়া থেকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের পর থেকে তখন আন্তর্জাতিক সীমান্ত শহর রামগড় মহকুমা (বর্তমানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা) এর বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি দিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিল। পানছড়ির মঙ্গু আদামে (তখনকার অমলে পানছড়ি উপজেলাধীন লতিবানস্থ এম এন লারমার নিজ গ্রাম এলাকা) ও দীঘিনালা উপজেলাধীন বোয়ালখালী বাজার ও হাসিনসনপুর গ্রাম ও সীমান্তাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক বিনা উস্কানীতে নিরাপরাধ জুম্ম হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। স্বাধীনতার ৩৯ বছর পর আবারো শাসকগোষ্ঠীর অতীতের সেই রুদ্র মূর্তি নতুনভাবে আবির্ভূত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে অধুনা আদিবাসীদের ভূমি বেদখল, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সদিচ্ছার অভাব, সর্বোপরি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান না করার মধ্য দিয়ে সেসব অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের বহিপ্রকাশ ঘটেছে। পরিশেষে উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও উগ্র মৌলবাদের সাথে আঁতাত করে সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাস করেছে।

এবারের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ থাকলেও তার সামগ্রিক প্রতিফলন সংবিধানের কোথাও ঘটেনি। অতীতেও একদিকে রাষ্ট্রের চার মুলনীতি অন্যদিকে একদলীয় শাসনতন্ত্র কায়েম করা এ দু'টি কর্মসূচী সমগ্র দেশে অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক সংকটকে ঘণীভূত করে তুলেছিল। এভাবে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠে যে সংস্কৃতি দেশে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র গড়ে উঠার পথ রুদ্ধ করে দেয়। আজ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সমর্থন ব্যতিরেকে কোন সরকার স্বাধীনভাবে দেশ চালাতে পারেনি। সেনাবাহিনীর মন রাখতে গিয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সংবিধানের অধীনে আগামীতে কোন স্থিতিশীল সরকার দেশ পরিচালনা করতে পারবে বলে মনে হয়না। কাজেই এই সংবিধান অপরিবর্তিত থাকলে এই সংবিধানের আওতায় আদিবাসী তথা আপামর মেহনতি জনগণের জীবনে উন্নতির প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল সংসদে আসার আগে সরকারের সাথে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনকারী একমাত্র রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একটি প্রতিনিধি দল ২৬ আক্টোবর ২০১০ তারিখে সংবিধান সংশোধন কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সাথে দেখা করে আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতি, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত আইনগুলোর আইনী হেফাজতসহ আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বিশেষ শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, আদিবাসী অধিকার সম্বলিত বিধানাবলী সংশোধনের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের মতামত ও সম্মতি গ্রহণ এবং আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারসহ ভূমি, ভূখন্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সম্বলিত ১৪ টি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সংবিধানের সেই পঞ্চদশ সংশোধনীতে ঐ প্রস্তাবমুলে কোন কিছুই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। ফলে '৭২-এর মতো আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী এবারেও আলোর মুখ দেখলো না। অথচ বর্তমান সরকারী দল

ক্ষমতায় আসার আগে নির্বাচনী ওয়াদা এবং ১৪ দলের ২৩ দফা জাতীয় কর্মসূচীতে ১৯ দফায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি এবং পাহাড়ে ও সমতলের আদিবাসী লোকদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাথে সকল বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তন করা হবে।"

১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, তারও আগে ষাট দশকে ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের আমলে বুনিয়াদি গনতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার পরিষদ (ইউনিয়ন কাউন্সিল) নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশে মহান নেতা এম এন লারমা জুম্ম জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার এই উদ্যোগ জুম্ম জাতির সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনের পাশাপাশি জুম্ম সমাজে জীবন জীবিকার পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। শিক্ষিত ও আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের আগ্রহ থেকে ভূমি অধিকার ও জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। দেশের আদিবাসী জুম্ম জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালে কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশের আদিবাসীদের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারেনি। চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আসার পর থেকে সরকারের অসহযোগিতার কারণে চুক্তি-উত্তর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তাদের মনোনীত প্রার্থীকে সংসদে পাঠাতে পারেনি। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলা থেকে নির্বাচিত সাংসদ যারা আছেন মহান নেতা এম এন লারমার মতো তারা কেহই এ পর্যন্ত বাংলাদেশের মেহনতি মানুষ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। পারেননি দেশের ৪৫ টির অধিক আদিবাসীদের আত্মপরিচয় দানের জন্য সাহসী ভূমিকা পালন করতে। বরঞ্চ সমগ্র দেশের আদিবাসীদের আত্মপরিচয় মুছে দেবার জন্য শাসকগোষ্ঠী যে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে তারা তাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের মধ্যে আদিবাসীদের জীবনের মূল্যবোধ অনুপস্থিত। তারা সরকার দলীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। মূলত তারা যে দলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন সে দলের দলীয় দলিল-পত্রে আদিবাসী হিসেবে আত্মপরিচয় দানের কথা লিপিবদ্ধ নেই। অনাগত দিনে জুম্ম আদিবাসীদের সমর্থিত না হয়ে দেশের যে কোন জাতীয় দলের ব্যানারে নির্বাচিত যে কোন সাংসদ তাই করতে থাকবেন। কাজেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য অচিরেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যে জরুরি তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

দেশে সত্যিই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হচ্ছে কিনা তা তলিয়ে দেখার জন্য জীবদ্দশায় এম এন লারমা একসময় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ (বাকশাল)-এ যোগদান করেছিলেন। কিন্তু আত্মপরিচয়কে জলাঞ্জলি দেননি। সরকারের প্রস্তাবিত উঁচু ইমারতে প্রলুব্ধ হয়ে নিজের পরিচিতি, স্বজাতির পরিচিতি ভুলে যেতে পারেননি। তাই তিনি বাঙালী বানানোর প্রতিবাদে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছিলেন। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের কথা তথা বাংলাদেশের আপামর মেহনতি জনগণের জীবনের কথা বাদ দিয়ে পাস হয়ে যাওয়া বিলে স্বাক্ষরও প্রদান করেননি। জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেছিলেন। পরিশেষে সংসদ ভবন ছেড়ে হাতিয়ার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ১০ নভেম্বর ৮৩-র ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু তাঁর কাঁধের হাতিয়ার কেড়ে নিতে পারেনি। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ব পর্যন্ত তার সুযোগ্য উত্তরসূরী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কাঁধে এ হাতিয়ার ঝুলেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আওতায় আজকের তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিনটি সংসদীয় আসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে জুম্ম জনগণ এবং মহান নেতা এম এন লারমা ও জুম্ম বীর শহীদদের মহান আত্মত্যাগের ফসল। তাদের এই ত্যাগ কোনদিন বৃথা যেতে পারে না ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে আজকের তিন পার্বত্য জেলার সাংসদরা সংসদে এম এন লারমার মতো বলিষ্ঠতা দেখাতে পারেননি। পারেননি দেশের আপামর জনগণ তথা আদিবাসী জুম্ম জনগণের হয়ে কথা বলার সেই মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ তথা সমতলের আদিবাসীরা মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ব্যতিরেকে দেশে কোন জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন পাহাড়ে কিংবা সমতলের আদিবাসীদের অধিকার ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করেনা।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাস হবার পর দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বিগত ৯ জুলাই ২০১১ অগণিত আদিবাসী আবাল বৃদ্ধ-বনিতা জাতীয় সংসদ কর্তৃক আদিবাসীদের এই আত্মপরিচয় দানের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের

প্রতিবাদে তিন পার্বত্য জেলা সদরে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে যোগদান করে। রাঙ্গামাটির প্রধান প্রধান সড়ক হাজারো আদিবাসী নর-নারীর বিক্ষোভ মিছিলে মিছিলে কয়েক ঘন্টা যাবৎ অরুদ্ধ ছিল। এই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আদিবাসীরা নাগরিক হিসেবে 'বাংলাদেশী' হতে পারলেও জাতি হিসেবে 'বাঙালি' হতে পারবেনা বলে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। সংবিধান থেকে 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী' শব্দগুলো বাতিলের জন্য জোর দাবী জানিয়েছিল। অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরও আজকে ১৯৭২ সালের ভুলের পুনরাবৃত্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ ও দেশের সকল আদিবাসীরা মেনে নিতে পারেনি ।

রাষ্ট্র যদি দেশের অভ্যন্তরে অধিকারকামী জনগণের সাথে অগণতান্ত্রিক আচরণ করে তাহলে তার দায় ভার রাষ্ট্রকেই বহন করতে হয়। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশকাধিক কালের সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর চাপানো সেরকম একটা সংগ্রাম এবং '৭২ সালে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক আচরণের পরিণতি। সেদিন নিছক নিরুপায় হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিলুপ্তপ্রায় আদিবাসী জুম্ম জনগণ জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এ সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল। পৃথিবীতে যে কোন জাতি সংখ্যায় ছোট হোক, বড় হোক তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করা প্রত্যেক জাতির মৌলিক অধিকার। বিশ্বের অধিকারকামী জনগণ এ অধিকার আদায়ের ভাষা ও নীতি-কৌশল অধিকার প্রদানকারী রাষ্ট্র থেকেই রপ্ত করে। সেটাই ইতিহাসের শিক্ষা। ইতিহাসের এ শিক্ষাকে দেশের আদিবাসীরা ভুলে যায়নি।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পাশে কেউ ছিলনা। কিন্তু পার্বত্য চুক্তি-উত্তর কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনতা আজ আর একা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন মূলত দেশের আদিবাসীদেরই আন্দোলন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের এক পর্যায়ে দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে আদিবাসীদের একটি সংগঠন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ১৩ জুলাই ২০০১ সালে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও সঞ্জীব দ্রং-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম গঠনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনে নুতন মাত্রা যোগ হয়। দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল হয়েছেন। সমগ্র বাংলাদেশে তার ব্যাপকতা বিস্তৃতি লাভ করে। বিগত ৪০ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান আন্দোলন আর আজকের গারো পাহাড়, খাসিয়া পুঞ্জির ভূমিহারা মানুষের আন্দোলন থেকে শুরু করে সমতলের আদিবাসীদের আন্দোলন একই সুত্রে গাঁথা তাতে কোন দ্বিরুক্তি নেই। এসব কারণে জাতিসংঘ ঘোষিত ১৯৯৫-২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রথম আদিবাসী দশক এবং ২০০৫-২০১৪ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় আদিবাসী দশককে বাংলাদেশের আদিবাসীরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সেজন্য আদিবাসী দশক শুরু থেকে প্রতি ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে আদিবাসীরা প্রতিপালন করে আসছে। এতে করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম আদিবাসী বিষয়ক ধারণাকে দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'আদিবাসী' সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক মঙ্গল কুমার চাকমার 'আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রসঙ্গে' রচিত প্রবন্ধের সারাংশ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। "...সরকার এযাবৎ এসব জাতিগোষ্ঠীসমূহকে 'উপজাতি' বা 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছে যা এসব জাতিগোষ্ঠীসমূহের নিকট কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন সংজ্ঞায় আদিবাসী বলতে বুঝায় যে, যারা উপনিবেশ স্থাপনকালে বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলের প্রথম বা আদিবাসীর বংশধর। যাদের প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের প্রধানতম সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা; যারা বর্তমান সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভূক্ত এবং ঝুঁকিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনগোষ্ঠী; যাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে যা সচরাচর দেশের সরকারী ভাষা থেকে পৃথক; ভূমির সাথে যাদের নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে, দেশের প্রচলিত আইনের চেয়ে তাদের প্রথাগত আইনের দ্বারা তাদের সামাজিক ও পারিবারিক বিরোধগুলো অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এসব সংজ্ঞা অনুসারে দেশের এসব জাতিগোষ্ঠী সমূহকে নিঃসন্দেহে আদিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। শুধু তাই নয়। দেশের অনেক আইনে যেমন- ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ত্ব আইন এবং ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯৯৫ সালের অর্থ আইন, ২০০৫ সালের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, সরকারী পরিপত্র ও দলিলে এবং আদালতের রায়ে এসব জাতিগোষ্ঠীসমূহকে আদিবাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে...।" এসব বাস্তব যুক্তিসিদ্ধ কারণ থেকে জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী ঘোষণাপত্র নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর সনদপত্র স্বরূপ।

প্রথম আদিবাসী দশকের মধ্যে আদিবাসীদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় আবার দ্বিতীয় আদিবাসী দশক ঘোষিত হয়েছিল যার মূল লক্ষ্য- সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রতি যাতে অধিক মনোযোগী হয় এবং জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা যায়। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে ২০০০ সালে

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরাম গঠিত হয়েছে যার সংখ্যা ১৬ যাদের মধ্যে আদিবাসী সদস্য সংখ্যা ৮ জন। পৃথিবীর ৭ টি অঞ্চলের জন্য এই ৮ টি পদ সংরক্ষিত। বর্তমানে এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় উক্ত জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্যপদ লাভ করেছেন। পরিতাপের বিষয় যে, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যেখানে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেখানে বাংলাদেশ সরকার বলেছে যে, "তার দেশে কোন আদিবাসী নেই।" রাষ্ট্রীয়ভাবে সেকথা প্রমাণের জন্য সংবিধান সংশোধন কমিটির সুপারিশমূলে বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং সমস্ত আদিবাসীদের বাঙালী হিসেবে আখ্যায়িত করে সংবিধান পাস করার পর সরকার তার আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। শুধু এখানেই শেষ নয়। দেশের বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়ে দাপ্তরিক দলিলপত্র থেকে 'আদিবাসী' নামক শব্দটা মুছে ফেলার নির্দেশ সহ দেশে 'আদিবাসী' বিষয়ক যে সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে সে সমস্ত প্রকল্প বাতিল বা স্থগিত করার জন্য অথবা প্রকল্প থেকে আদিবাসী শব্দটা মুছে ফেলার জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীর কাছে ইহা সুবিদিত যে, আদিবাসী সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ঘোষণার খচড়ায়-

১নং ধারায় বলা হয়েছে, জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত মৌলিক স্বাধীনতা এবং সকল মানবাধিকার পরিপূর্ণ ও যথাযথভাবে ভোগ করার অধিকার আদিবাসী জনগণের রয়েছে।

২নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আদিবাসী জনগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে মুক্ত এবং সমমর্যাদা লাভের অধিকারী বিশেষত আদিবাসী পরিচয়ের কারণে তাদের উপর কোনরূপ বৈষম্য করা যাবেনা।

৩নং ধারায় আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তাতে আদিবাসীরা বুঝতে পারছে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ছাড়া তাদের সামগ্রিক মুক্তি নেই।

১৬৬৬ সালে এদেশে মোঘলের আগমনের আরো অনেক আগে থেকে আজকের পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক ভূ-খন্ডে দশ ভিন্ন ভাষাভাষি এগারটি আদিবাসী জাতিসত্তা বসবাস করে আসছে। গারো পাহাড়ে খাসিয়া পুঞ্জিতেও স্মরণাতীতকাল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল, বর্তমানে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত আদিবাসীরা এদেশেরই ভূমিজ সন্তান। আজ সমগ্র বাংলাদেশে ৪৫ টির অধিক আদিবাসী জাতিসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে তারা সবাই স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শাসকগোষ্ঠীর মদতে তাদের ভূমি অধিকার, ভাষা, সাংস্কৃতিক অধিকার তথা আদিবাসীদের অস্তিত্বের উপর বিজাতীয় ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের পর থেকে তারা যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করতে বাধ্য হয়। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স্বাধীন রাজার আমলে ১৭৭২ সালে জুম্ম জনগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ১৮৫০ সালে ৩০ জুন সিধু ও কানুর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। ভারতে ঐতিহাসিক রিয়াং বিদ্রোহের কথা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীরা এখনো ভুলে যায়নি। যদিও সে বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হাজংদের টংক আন্দোলন ইতিহাসে জ্বল জ্বল করছে। অপর কোন জাতিকে ঘৃণা করা আদিবাসীদের স্বভাব নয়। আদিবাসীরা শান্তিপ্রিয় এবং এই মানবিক গুণের অধিকারী। এই নীতির প্রতি আদিবাসীদের বিশ্বাস আছে বলে মানব সভ্যতার বিকাশ ধারাকে সামনে রেখে আদিবাসীরা সামনে অগ্রসর হতে চায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও ইতিহাস প্রসঙ্গ

সজীব চাকমা

আদিবাসী প্রসঙ্গ

বস্তুতঃ বাংলাদেশে 'ইন্ডিজেনাস' বা 'আদিবাসী' কারা তা একটি মীমাংসিত বিষয়। কিন্তু তারপরও সরকার ও বাঙালী জাত্যাভিমানী-সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন একটি গোষ্ঠী জেনেও না জানার ভান করে আদিবাসী নিয়ে বিতর্কের অবতারনা করছে। বিষয়টিকে জটিল রূপ দিয়েছে। 'আদিবাসী' বিষয়টি উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ভুল বা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে সরকার আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকারকে অস্বীকার করতে চাইছে অথবা তার দায়দায়িত্ব থেকে সরে যেতে চাইছে। অন্য কোন দেশে এমন হয়নি। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ এবং গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শক্তি বলে দাবীদার আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত সংকীর্ণতার পরিচয় দিচ্ছে। আবার বলা যেতে পারে, সরকার বর্তমানে আদিবাসী বিষয়ে ও আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে বা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। অথবা আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সরকার যে চরম রক্ষণশীল, এমনকী প্রতিক্রিয়াশীল- তার মুখোশই উন্মোচিত হয়েছে। এ জন্য এই সরকারকে একদিন মাশুল দিতে হবে।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের আদিবাসীরা হুট করে নিজেরাই নিজেদেরকে 'আদিবাসী' বলে দাবী করে বসেনি। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯৩ সালকে 'বিশ্বের আদিবাসী জনগণের আন্তর্জাতিক বর্ষ', ৯ আগস্টকে 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' এবং ১৯৯৫ সাল হতে ২০০৪ সাল সময়কে 'বিশ্বের আদিবাসী জনগণের প্রথম আন্তর্জাতিক দশক' হিসেবে ঘোষণার পর থেকে বিশ্বের ও দেশের অপরাপর আদিবাসীদের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণও এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে আসছে। সেই থেকেই এই পরিচয়টি আরও অধিকতর সামনে এসেছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদেরকে অনেক আগেই 'আদিবাসী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, উক্ত শাসনবিধির তফসিলে উল্লেখিত বিভিন্ন আইনসমূহের মধ্যে দি ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২, দি ইন্ডিয়ান ফিনান্স এ্যাক্ট ১৯৪১, দ্য ফরেস্ট এ্যাক্ট ১৯৭২ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও 'আদিবাসী পাহাড়ী' (indigenous hillmen) শব্দটি উল্লেখ করা হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে, এমনকি সাম্প্রতিক কালেও সরকারের পক্ষ থেকে এবং সরকারী বিভিন্ন দলিলে বাঙালী জনগোষ্ঠী ব্যতীত বাংলাদেশে বসবাসকারী অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলোকে 'আদিবাসী' বলে অভিহিত করা হয়ে আসছিল। বর্তমান সরকারী দল আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও 'আদিবাসী' আখ্যাটি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রগতিশীল সাহিত্যিক প্রয়াত আহমদ ছফা ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত তার জীবনের প্রথম প্রবন্ধ 'কর্ণফুলীর ধারে'তে পাহাড়ী মানুষদের 'আদিবাসী' হিসেবেই অভিহিত করেছিলেন।

এ বছরের মে মাসে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের দশম অধিবেশনে জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল আহমেদ মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশে কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী নেই।' গত ২৬ জুলাই ২০১১ বিভিন্ন দেশের কুটনীতিক, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে এক ব্রিফিং অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি নাটকীয়ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে বিবেচনা না করতে এবং তার পরিবর্তে 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী', ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী', 'Ethnic Minority' হিসেবে অভিহিত করার আহ্বান জানান। দীপু মনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলায় কোন আদিবাসী নেই। ঐ এলাকার অধিবাসীরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী।' জানা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রাক্কালে বাংলাদেশের আদিবাসীদের যাতে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া না হয় তার জন্য সরকারী একটি বিশেষ মহল অত্যন্ত তৎপর ছিল।

বস্তুত সরকার এদেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলো 'আদিবাসী' নয় এই দাবীর পেছনে প্রধানত দু'টি যুক্তি উপস্থাপন করছে। প্রথমত, তারা এ অঞ্চলের আদিম বাসিন্দা নয়। তারা সবাই বাংলাদেশের ভূখন্ডের বাইরে থেকে এসেছে। বাঙালীরাই এদেশের প্রকৃত আদিবাসী। দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে, এ জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়, ভাবমূর্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকী সৃষ্টি করবে। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় যুক্তিই খোঁড়া এবং ভিত্তিহীন। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ধরনের আদিবাসী জাতির বসবাস রয়েছে। সে সমস্ত দেশের আদিবাসীদের ভূমি ও সম্পদের অধিকারসহ অনেক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে। সেই দেশের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়, ভাবমূর্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য কোন প্রকার হুমকী সৃষ্টি হয়েছে বলে তো নজির নেই। সম্ভবত বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশী তাদের জাতীয় পরিচয়, ভাবমূর্তি ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে ত্রস্ত থাকে। এটা এক ধরনের জনবিচ্ছিন্নতা অথবা জনগণের প্রতি অবিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ।

আর কথায় কথায় সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের ন্যায্য দাবীকে বা অধিকারকে ও আন্দোলনকে উপেক্ষা করা এবং দমন-পীড়ন করা বাংলাদেশ সরকারসমূহের একটা সাধারণ অপকৌশল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত এই সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনের কাজের অংশ হিসেবে জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবীকে পদদলিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে অনেক তান্ডবলীলা চালানো হয়েছিল। আর এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে 'জাতীয় পরিচয়, ভাবমূর্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকী সৃষ্টি'র অজুহাতটি সেই পুরানো অপকৌশলেরই অংশ বৈ কিছু নয়। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়, তারা ছিল অভিবাসী- এই যুক্তিতে জুম্মদেরকে বা অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে 'আদিবাসী' হিসেবে অস্বীকৃতি জানানো হচ্ছে।

সরকার মূলত আন্তর্জাতিক দলিলে গৃহীত 'ইন্ডিজেনাস' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'আদিবাসী' শব্দকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কেবল 'আদিম বাসিন্দা' বা 'প্রাচীন অধিবাসী' এই ধারণার সাথে গুলিয়ে ফেলছে বা অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে বাংলাদেশের ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস বিকৃতির অপপ্রয়াসও চালানো হচ্ছে। বস্তুত 'আদি বাসিন্দা' এই ধারণার সাথে 'ইন্ডিজেনাস' বা 'আদিবাসী' পরিচয় বা সংজ্ঞার মধ্যে মুখ্যত কোন সম্পর্ক নেই।

প্রসঙ্গক্রমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বর্তমান 'ইন্ডিজেনাস' বা 'আদিবাসী' এর সংজ্ঞা স্মরণ করা যাক। এখানে জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র জোসে মার্টিনেজ কোবো'র ১৯৮৪ সালে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি যা জাতিসংঘ 'ওয়ার্কিং ডেফিনিশন' হিসেবে গ্রহণ করেছে তা উল্লেখ করা যাক। এতে বলা হয়েছে যে- 'আদিবাসী সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী ও জাতি বলতে তাদেকে বুঝায় যাদের ভূখন্ডে প্রাক-আগ্রাসন এবং প্রাক-উপনিবেশিক কাল থেকে বিকশিত সামাজিক ধারাসহ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে যারা নিজেদেরকে উক্ত ভূখন্ডে বা ভূখন্ডের কিয়দংশে বিদ্যমান অন্যান্য সামাজিক জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। বর্তমানে তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আইনী ব্যবস্থার ভিত্তিতে জাতি হিসেবে তাদের ধারাবাহিক বিদ্যমানতার আলোকে তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভূখন্ড ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যত বংশদরদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মোট কথা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা বহিরাগত কর্তৃক দখল বা বসতিস্থাপনের পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট ভূখন্ডের মূল অধিবাসীর বংশধর।'

অপরদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কনভেনশন নং ১৬৯ এর সংজ্ঞা অনুয়ায়ী- 'স্বাধীন দেশসমূহের জাতিসমূহ- যারা এই মর্মে আদিবাসী হিসেবে পরিগণিত যে, তারা ঐ দেশটিতে কিংবা দেশটি যে ভৌগলিক ভূখন্ডে অবস্থিত সেখানে রাজ্য বিজয় কিংবা উপনিবেশ স্থাপন কিংবা বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ কাল থেকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বংশধর, যারা তাদের আইনগত মর্যাদা নির্বিশেষে নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ লালন করে চলেছে।'

বলাবাহুল্য, উক্ত সংজ্ঞায় কোথাও আদিবাসী হওয়ার জন্য আদি বাসিন্দা হওয়ার শর্ত নেই। আর প্রাক-আগ্রাসন ও প্রাক-উপনিবেশিক কাল থেকে এবং উপনিবেশ স্থাপন কিংবা বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণেরও বহু কাল আগে থেকে যে জুম্মরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছে তাতো দিবালোকের মত সত্য। আর জুম্মরাই যে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত প্রাচীন স্থায়ী অধিবাসী- ইতিহাসও তারই সাক্ষ্য দেয়। বস্তুতঃ আদিবাসী বলতে দেশে দেশে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অধিকারী সংখ্যালঘু বা প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীগুলোকেই তুলে ধরা হয়েছে। আর এটা কোন জাতিগত পরিচয়ও নয়। এই অভিধার মধ্য দিয়ে মূলত এ সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলোর সংকটময় প্রান্তিক অবস্থাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। আর 'ইন্ডিজেনাস' ও 'ট্রাইবাল'- উভয়ই সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেই তুলে ধরে।

উল্লেখ্য, সরকার ও জাত্যাভিমানীদের কাছে, 'উপজাতি' শব্দটিই অধিক পছন্দের। 'ট্রাইবাল' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত 'উপজাতি' শব্দটি এখন বিতর্কিত এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তবুও সরকারীভাবে প্রচলিত রয়েছে বলে জনগণ তা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর অতীতে মূলত নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যবহৃত হলেও এখন তার অর্থ অন্যভাবে বা অপমানজনকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা যতটা না নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তার চেয়ে বেশী রাজনীতিকগতভাবে এদেশের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী জাতিসমূহকে 'হেয় প্রতিপন্ন করা', 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক জ্ঞান করা', তাদের অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দমন করার উদ্দেশ্যেই তারা এটা চাপিয়ে দিতে চায়। না হলে তাদের স্বার্থটা কোথায়? এটা এক ধরনের বর্ণবাদী, জাত্যাভিমানী ও আগ্রাসী মানসিকতা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও অপপ্রচার প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে ইতিহাস বিকৃতির চর্চা একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত সংকীর্ণ ও কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই অপসংস্কৃতির উৎপত্তি। এই অপসংস্কৃতিটি বাংলাদেশের জনগণের মনে, মননে যথেষ্ট ক্ষতি করছে। এর

কাজ হলো মূলত একটি সংকীর্ণ ও কায়েমী স্বার্থ হাসিল করা, অপরের মত ও অধিকারকে অসম্মান ও অবদমিত করা, সত্য ও মিথ্যাকে গুলিয়ে দেয়া অথবা সত্যকে চাপা দিয়ে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যর্থ অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আর এই অপসংস্কৃতির অসুখে আক্রান্ত বাংলাদেশের সবকটি বড় রাজনৈতিক দল। আর এর দ্বারা সংক্রমিত অনেকেই। এটা দেশের গণতন্ত্রায়নে ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে ভেতর থেকে আঘাত হানছে।

এই ইতিহাস বিকৃতির অপসংস্কৃতি বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বস্তুত এটা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব নিয়ে ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ। সেই ষড়যন্ত্র আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে। আর সেই ষড়যন্ত্রের গতিবেগ আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যখন স্বয়ং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এদেশে কোন আদিবাসী নেই, আদিবাসী যদি কেউ থাকে তাহলে বাঙালীরাই প্রকৃত আদিবাসী। লক্ষণীয় ব্যাপার এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগুলোর দিকেই বেশী। নানা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে, বই বের করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে- পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা এদেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী নয়। এজন্য সত্যমিথ্যা মিশিয়ে অনেক উদ্দেশ্যমূলক ও আক্রোশমূলক কাহিনী বা বক্তব্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। সেসব বক্তব্য রীতিমত ইতিহাস বলে প্রচার করা হচ্ছে।

নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্তকর, পক্ষপাতমূলক ও মিথ্যা তথ্য ও ব্যাখ্যার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা যাক।

১। সম্প্রতি জনৈক জামাল উদ্দিন কর্তৃক লিখিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস' নামে একটি বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে-

'পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের চিরকালীন অখন্ড ভৌগলিক অঞ্চল। অতীতে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে এ অঞ্চল প্রতিবেশী রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু কখনো ভিন্ন দেশের অংশে পরিণত হয়নি, চিরকালই নামে চট্টগ্রাম এবং ভৌগলিক পরিচয়ে বাংলার আদি অখন্ড অঞ্চল হিসেবে ছিল এবং এখনও রয়েছে।'

'কুকি-চীন ভাষাভাষিদের পরে এ অঞ্চলের উত্তরাংশে সম্ভবত উত্তর দিক থেকে আসে বরো ভাষাভাষি ত্রিপুরাদের রিয়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা। ...রিয়াংদের পরে সম্ভবত চাকমারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে।'

'১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ এ প্রদেশের রাজস্ব সংগঠনকে পুনর্গঠন করেন। তখন বৃহত্তর চট্টগ্রাম (পার্বত্য অঞ্চলসহ) অঞ্চলটি ইসলামাবাদ চাকলায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।'

'উপজাতি বলতে এখন যাদেরকে বোঝানো হয়, তাদের পূর্ব পুরুষেরা বাইরে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এসে বসবাস করতে শুরু করে শ'দুয়েক বছর পূর্বে।'

'বাংলাদেশ ভূখন্ডে সাঁওতালদের আগমনকাল একশ বছরের মত।'

২। অপরদিকে জনৈক সাহাদত হোসেন খান কর্তৃক রচিত 'পার্বত্য উপজাতিদের আদি নিবাস' নামে অপর একটি বইয়ে আরও বেশী আপত্তিকর, উস্কানিমূলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত নিম্নমানসম্পন্ন এবং চরমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। তার কয়েকটি মাত্র তুলে ধরা হল-

'লিখতে গিয়ে দেখেছি যে, পার্বত্য উপজাতীয়রা আদৌ আদিবাসী নয়। কয়েকশ' বছর আগেও তারা এ দেশ এবং এ মাটির কেউ ছিল না। বাংলাদেশ নামের এ ভূখন্ডের সঙ্গে তাদের নাড়ির কোন সম্পর্ক নেই। তারপরও তাদের কোন কোন গ্রুপ বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তাদের এ অশুভ চক্রান্তে ইন্ধন যোগাচ্ছে বিদেশীরা। ...আমি পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। এ চুক্তি পুরোপুরি বাঙ্গালীদের স্বার্থ বিরোধী।'

'উপজাতীয়রা সুখে থাক একজন মানুষ হিসেবে এ কামনা আমারও। কিন্তু বাইরের ভূখন্ড থেকে এসে এখানকার মূল বাসিন্দাদের চেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করবে আমি তা সমর্থন করতে পারি না।'

'চাকমারা তাদের দাবী অনুযায়ী এ মাটির সন্তান কিংবা গারো নয়। বরং তারা হলো বহিরাগত ও শরণার্থী।'

'চাকমাদের আদিভূমি খুঁজে বের করা সত্যি অসম্ভব।'

'এসব বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চাকমারা হচ্ছে বহিরাগত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রিত একটি জনগোষ্ঠী যাদের ভাষা, ইতিহাস এমনকি পরিচিতি বিভ্রান্তিকর এবং অজানা। এটাই ভাগ্যের পরিহাস যে, এ ধরনের নাম পরিচয়হীন একটি সম্প্রদায় দেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।'

'শাব্দিক অর্থে চাকমা হচ্ছে একটি পার্বত্য যাযাবর সম্প্রদায় অথবা অজ্ঞাত বংশোদ্ভূত লোক যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকে তারা বিতাড়িত হয়।'

'পার্বত্য চট্টগ্রামে জনবসতির ইতিহাস নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও বইপত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু এসব লেখালেখির গভীরতা খুব কম। প্রকাশিত লেখালেখিগুলো গবেষণামূলক হলে নিঃসন্দেহে এ আখন্ডনীয় সত্য প্রমাণিত হতো যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানরাই হলো প্রথম বসতিস্থাপনকারী এবং বাংলাদেশ হলো এ ইতিহাসের বৈধ উত্তরাধিকারী।'

'চাকমা অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য কোন উপজাতি ইংরেজদের উপর হামলা চালায়নি।'

'পার্বত্য চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইলের মধুপুরে গারো পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতীয়রা বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানায় বসবাস করলেও প্রতিবেশী ভারত ও বাইরের রাষ্ট্রের প্রতি তারা কমবেশী দুর্বল। বাইরের দেশগুলোও তাদের মদদ দিচ্ছে। লক্ষ্য করলে একটি সত্য পরিষ্কার ধরা পড়ে যে, যারা বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানা পবিবর্তন করতে চায়, তাদের একজনও মুসলমান নয়।'

পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে, উক্ত লেখাসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ইতিহাসের উপর কীভাবে আঘাত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসের নামে কী মিথ্যার বেসাতি করা হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদেরকে কী হিংসার চোখে দেখা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চাকমাদেরকে সবচেয়ে বেশী আক্রমণ করা হয়েছে বিশেষ করে সাহাদত হোসেন খানের বইয়ে। আবার বইয়ের শুরুতে 'লেখকের কিছু কথা'য় লেখা হয়েছে, 'উপজাতীয়দের কেউ যদি আমার লেখায় আহত হন তাহলে আমি দুঃখিত। ...মানুষ হিসেবে তারা অত্যন্ত সরল।' কী সুন্দর কথা! আসলে এ সমস্ত লোকরাই আদিবাসীদের পিঠ চাপড়ে 'সহজ সরল' বলে ফোঁস ফোঁস করে গরল ঢেলে দেন। আর আদিবাসীরা সেই ছলনার গরলে গলে গিয়ে দিন দিন নিজ আবাসভূমিতে বিরল হয়ে যাচ্ছেন। আর 'যারা বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানা পরিবর্তন করতে চায়, তাদের একজনও মুসলমান নয়'- এই বক্তব্য দিয়ে অতি সুক্ষ্মভাবে দেশের বৃহত্তর মুসলমান জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী জুম্মদের বিরুদ্ধে উসকে দেয়ার একটা অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। এই বক্তব্য পড়লে মনে হবে যে, জুম্মরা স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য লড়াই করছে আর মুসলমানদের কাছ থেকে সেই ভূখণ্ড কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। এরকম জলজ্যান্ত মিথ্যাচার, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য আর কি হতে পারে!

৩। উক্ত বক্তব্য পড়ার সাথে সাথে পাঠকদের অবশ্যই স্মরণ হবে বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনির বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন- 'উয়ারী বটেশ্বরের পোড়াতত্ত্ব অনুযায়ী এ দেশের জনগণের ৪ হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী আছে, তারা ১৬ থেকে ১৯ শতকে সুলতানি ও মোগল আমলে মিয়ানমার কম্বোডিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আগমন করে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তাই তারা আদিবাসী নয়। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমির ফার্স্ট নেশন হিসেবে এ অঞ্চলের আদিবাসী হতে পারে না তারা। বরং তারা ঐতিহাসিকভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে অভিবাসনকারী জনগোষ্ঠী।'

৪। এ প্রসঙ্গে এখানে তানভির মোকাম্মেল এর 'কর্ণফুলীর কান্না' নামের প্রামাণ্য চিত্রটির একটি অংশ স্মর্তব্য। সেখানে এক সাক্ষাৎকার পর্বে ৭৯/৮০ সালে লংগদুতে বসতিকারী সেটেলার পাড়ার এক সেটেলার বাঙালী সাক্ষাৎকারে বলেছিল অনেকটা এরকম, 'এখানকার উপজাতিরা তো এসেছে বর্মা, থাইলন্ড, কম্বোডিয়া থেকে।' বলাবাহুল্য, ঐ নিরক্ষর বাঙালী যে বড় গবেষকের মত আদিবাসী জুম্মদের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে বক্তব্য দিলো, তা নিশ্চয়ই তার জানার কথা নয়। এটা যে শেখানো বুলি বা সুপরিকল্পিত অপপ্রচারণার নমুনা তা বলাই বাহুল্য।

বস্তুত এখানে ঐ বাঙালী সেটেলারটি, উল্লেখিত বইয়ে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপুমনির বক্তব্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আদিবাসী জুম্মদের ইতিহাস বিষয়ে ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। বরঞ্চ সকলেরই একটা জায়গায় মিল লক্ষণীয় যে, সবারই প্রচেষ্টা এটা প্রমাণ করা যে- জুম্মরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আদি বাসিন্দা নয়। তারাই বহিরাগত। বাংলাদেশ হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে কেবল বাঙালীরই দেশ। কী অদ্ভুত ইতিহাস বোধ বা ইতিহাস জ্ঞান।

আর উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও এর আদিবাসীদের ইতিহাস বিষয়ে যে বিভ্রান্তিকর ধারণাগুলো প্রচারে অপচেষ্টা করা হচ্ছে সংক্ষেপে সেগুলো হলো-

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চিরকালই চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অংশ। আর বাংলাদেশ হচ্ছে বাঙালীরই দেশ।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বহিরাগত। তারা দুশ' বছর আগে এদেশে এসেছে। এমনকি একশ বছর আগে এসেছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানরাই হলো প্রথম বসতিস্থাপনকারী এবং বাংলাদেশ হলো এ ইতিহাসের বৈধ উত্তরাধিকারী।

বলাবাহুল্য উক্ত অপপ্রচারণা বা বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনগণকে বিভ্রান্ত করে আদিবাসীদের রাজনৈতিক ও ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং এ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করে তাদের উপর যে নির্যাতন, নিপীড়নের স্টিম রোলার চালানো হয়েছে, অবৈধভাবে আদিবাসীদের ভূমি বেদখল করা হয়েছে বা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত যে আদিবাসীদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তাদেরকে সংখ্যালঘু করে ইসলামীকরণ করা হচ্ছে তার বৈধতা দান করা।

অপপ্রচার বনাম ইতিহাস

এখন দেখা যাক প্রকৃত ইতিহাস কী বলে। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কিছুই এখনও অনাবিষ্কৃত। তবে এই ইতিহাস উদঘাটন করা মোটেও অসম্ভব নয়। আর ধীরে ধীরে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হচ্ছে। আর বাঙালীর ইতিহাস প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ বলেছেন, 'বাঙালীর ইতিহাস আজো বলতে গেলে অনাবিষ্কৃত ও অলিখিত'। কাজেই ইতিহাসের চূড়ান্ত নির্ণয় করা কঠিন। তবে যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকেও একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। সেটা হচ্ছে- বাঙলা, বাঙালী, বাংলাদেশ ও চট্টগ্রাম এর ইতিহাসের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসকেও গুলিয়ে ফেলা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী জুম্মদের ইতিহাস শুরু করা হচ্ছে সেই বঙ্গ বা বঙ্গাল থেকে। সে কারণে বঙ্গ, বঙ্গাল বা বাঙালীর ইতিহাসকে নির্বিচারে বাংলাদেশের, চট্টগ্রামের বা পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস বলে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। অপব্যাখ্যাকারীদের ভাষ্যে বাংলার বা বাঙালীর ইতিহাস বলতে মূলত মুসলমান বাঙালীদের ইতিহাসই কল্পনা করা হচ্ছে। আর বাঙালীর ইতিহাস ও বর্তমানের বাংলাদেশের ইতিহাসের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেটা ভুলে যাওয়া হচ্ছে। সে কারণেই বাঙালী ব্যতীত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী অন্যান্য ভিন্ন জাতিসমূহের ইতিহাসকে বিবেচনাই করা হচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশের ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস বিবেচনার ক্ষেত্রে একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করা হচ্ছে। আর এই দোষে দুষ্ট হয়েই পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে আনছেন সুদূর নরসিংদীতে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উয়ারী-বটেশ্বরের কথা, যা মৌর্য যুগের জনপদ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মৌর্যরা এই জনপদের শাসক হলেও তারা বাঙালী নয়, 'বিদেশী' বলেই উল্লেখ করেছেন ড. আহমদ শরীফ। আর পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হলেও মৌর্য, গুপ্ত ও পাল আমলে এ অঞ্চল বাংলার শাসনভুক্ত ছিল না।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশে বৃহত্তর বাঙালী জাতি ছাড়াও আরও প্রায় অর্ধ শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। বাংলা ও বাঙালী থেকে বাংলাদেশের নামকরণ হলেও এদেশের সবাই যে বাঙালী নয় তা দিবালোকের মতই সত্য। আর ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই এসব ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এই অঞ্চলে বিচরণ বা বসবাস করে আসছে। কিন্তু তারপরও এসব জাতিসমূহকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতা ও গভীরতা সবচেয়ে বেশী দৃশ্যমান হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহের ক্ষেত্রে।

এদেশের বা এ অঞ্চলের ইতিহাস বিষয়ে লেখক ও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান লিখেছেন-

'এটা বলাবাহুল্য যে, আজ বাংলাদেশ যে অংশ-দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত সেই ভূখন্ডে 'বাংলাদেশ' বলে কোন রাষ্ট্র ছিল না।' (পৃঃ ২৭, বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ)

'১২০৪-৫ সালে যখন মুহাম্মদ ইখতিয়ারুদ্দিন বিন বখতিয়ার খলজি নদিয়া আক্রমণ করেন তখন বঙ্গের নির্দিষ্ট একটা রাজ্যনাম বা আঞ্চলিক নাম ছিল।'

'মোঘল বিজয়ের পর ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাঙ্গালার সীমানা নির্ধারণ করেছেন চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড়হি ৪০০ ক্রোশ, পূর্ব ও উত্তরে পাহাড়, দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে সুবা বিহার।'

'১৭ আগস্ট ১৯৪৭ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলা পূর্ববঙ্গে রয়ে যায়।'

তিনি আরও লিখেছেন- সৈয়দ আমীরুল ইসলাম তাঁর বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস-এ নরসিংদি অঞ্চলে বঙ্গের আদি অবস্থান বলে অনুমান করেছেন। কারণ নরসিংদি জেলার মধ্যে বঙপুর, বঙের টেক, বঙ্গার চর, বাঙালী নগর, বাঙাল গাঁও, উত্তর বাঙাল গাঁও, বাঙাল সাতপাড়া ইত্যাদি নাম রয়েছে, এর কাছেই কাপাসিয়া যেখানে কার্পাস তুলো জন্মাত।'

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদ ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন-

'বস্তুত ব্রিটিশ পূর্বকালে আজকের বাংলাভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল বলে প্রমাণ নেই। কাজেই বাংলার সার্বিক

ইতিহাসের ধারণা-কল্পনা সম্ভব নয়। আমরা যখন বাংলার আদি ইতিহাসের কথা বলি, তখন আমরা আবেগবশে সত্যকে অতিক্রম করে যাই, কেননা, জানা তথ্য আমাদের সে অধিকার দেয় না। পূর্বে যেমন রাঢ়, সুহ্ম, পুন্ড্র, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি নামে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত ছিল, কোন একক নামে বা একক শাসনে গোটা আধুনিক বাংলা কখনো অভিহিত বা প্রশাসিত ছিল না'

'বাংলার রাঢ়-বরেন্দ্র অঞ্চলই প্রাচীন। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অর্বাচীন। রাঢ় ছিল অনুন্নত ও অজ্ঞাত। তাই বরেন্দ্র নিয়েই বাঙলার ইতিহাসের শুরু। মানুষের আদি নিবাস ছিল সাইবেরিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। সেখান থেকেই নানা পথ ঘুরে আসে ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়-নিগ্রো, সাইবেরীয় নর্ডিক-মঙ্গোল। এরাই অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, শামীয়, নিগ্রো, আর্য, তাতার, শক, হুন, কুশান, গ্রিক, মঙ্গোল, ভোটচীনা প্রভৃতি নামে পরিচিত। আমাদের গায়ে আর্য-রক্ত সামান্য, নিগ্রো-রক্ত কম নয়, তবে বেশী আছে দ্রাবিড় ও মঙ্গোল রক্ত, অর্থাৎ আমাদেরই নিকট-জ্ঞাতি হচ্ছে কোল, মুন্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কুকী, তিব্বতী, কাছারী, অহোম প্রভৃতি।'

'পদ্মাতীরে 'বঙ্গ' অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করা চলে।'

'উনিশ শতক অবধি 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' নামে দু'ভাগে নির্দেশিত হতো এ বৃহৎ অঞ্চলটি। তুর্কিপূর্বকালে গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, পুন্ড্রও, বরেন্দ্র, বঙ্গ বঙ্গাল, সমতট এবং হরিকেল ও কামরূপ (অসম) নামে পরিচিত হত বিভিন্ন অঞ্চলে।' 'বঙ্গ- ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, হরিকেল- চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম।'

'আজ আমরা ভৌগোলিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালী এবং যে ভূখন্ডকে বাঙলা বা বাঙলাদেশ বলে জানি, তা আধুনিক কালের। প্রাচীনকালে এদেশে একক নামের ও অভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের কোন পরিচয় মেলে না।

মোটামুটিভাবে বলা যায় গৌড়, রাঢ় ও পুন্ড্র অঞ্চলই প্রাচীন জনপদ। এসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্বর বুনোমানুষ গোষ্ঠীজীবনে অভ্যস্ত ছিল।'

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন- 'প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। যুগে যুগে ইহার সীমা ও আয়তনের পরিবর্তন হইয়াছে....বঙ্গাল পূর্বে পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম ছিল। বঙ্গ ও বাঙ্গাল এই দুইটি নামই এক সময় দুইটি পৃথক দেশের নাম ছিল।'

উপরোক্ত তথ্য ও আলোচনা থেকে প্রমাণিত যে, বাংলাদেশ মানেই কেবল বাঙালীর দেশ নয়। অতীতের বিভিন্ন রাজ্য বা অঞ্চল নিয়েই আজকের এই বাংলাদেশ। পার্বত্য চট্টগ্রাম যে চিরকাল বর্তমান বাংলার বা বাঙালীর অধিকৃত ছিল না তাও সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের যে ইতিহাস-ঐতিহ্য তাতে বিভিন্ন জাতির মানুষের, ব্রাহ্মণ্যবাদী, বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানদের অবদান রয়েছে। আর বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম অন্যতম প্রধান ধর্ম হলেও ভারত উপমহাদেশে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে আরব মুসলমানদের কর্তৃক ভারত বিজয়ের পর থেকে। ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন, 'আমরা আগে ছিলাম animist, পরে হলাম pagan, তারও পরে ছিলাম হিন্দু-বৌদ্ধ, এখন আমরা হিন্দু কিংবা মুসলমান।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম বসতিস্থাপনকারী জুম্মরাই

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও অনুপস্থিত। অনেক সময় এর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্গ, বঙ্গাল, বাংলাদেশ বা চট্টগ্রাম বন্দর থেকেই শুরু করা হয়। ফলে এই ইতিহাস খন্ডিতই থেকে যায়। আর এ অঞ্চলে যে ১৪টি আদিবাসী জাতির বসবাস তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য যেমনি স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি তাদের অতীত ইতিহাস এখনও বেশ গবেষণা সাপেক্ষ। তবে অবশ্যই প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর পশ্চাতে আছে শত শত বছরের ঐতিহ্য ও কিংবদন্তী কাহিনী। তাদের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনের ইতিহাস প্রাচীনতর। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম কখন জনবসতি শুরু হয় তা এখনও সুস্পষ্ট নয়। তবে আজকে যারা নিজেদেরকে জুম্ম বা আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে চাইছে আর সরকার জোর করে যাদেরকে উপজাতি বা বাঙালী পরিচয়টি চাপিয়ে দিতে চাইছে তারাই যে এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীনতম বসতিস্থাপনকারী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভ্রমণশীল নানা মানবগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে থাকলেও অনেকেই শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি। ভারত বা প্রাচীন বাংলা কিংবা অন্য কোন সমতল ভূমির সভ্যতার মানুষ যারা ইতোমধ্যে স্থায়ী কৃষি সভ্যতা গড়ে তুলেছে, প্রাকৃতিক দুর্গম্যতার কারণে তারা এখানে কদাচিৎ আগমন করেছে বলে ধারণা করা যায়। বিভিন্ন সময় আরাকান, ত্রিপুরা ও বাংলার রাজশক্তির দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রভাবিত বা কর্তৃত্বাধীনে থাকলেও এই জনপদ বিকশিত হয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত যারা এখানে এই দুর্গম এলাকাটি আবাদ করে স্থায়ী আবাসভূমি গড়ে তোলে, সম্পূর্ণ নতুন এক সভ্যতার উন্মেষ ঘটায় তারা আদৌ বাঙালী নয়। তারা সংখ্যায় লঘু, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অধিকারী একাধিক জুম্ম জাতি।

খন্ডিতভাবে বলা হয় এ অঞ্চলের আদিবাসীরা বহিরাগত। তারা ত্রিপুরা, আরাকান, বার্মা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে এসেছে। যদিও আরও গবেষণা সাপেক্ষ তবুও যদি ধরেই নিই যে, তারা উক্ত অঞ্চল থেকেই এসেছে, তাতেও প্রমাণ করা যায় যে, এই সমস্ত আদিবাসীরা এ অঞ্চলের প্রথম বসতিস্থাপনকারী। তারাই এই অঞ্চলকে আবাদ করে বাসযোগ্য করে তোলে। আর তারা সেই সুদূর অতীতে যখনি এই অঞ্চলকে জনপদে পরিণত করে তখন চট্টগ্রাম জেলা বা বাংলাদেশ নামে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ছিল না। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আরাকান এই পাহাড়ী ভূখন্ডটি পাহাড়ী জীবনে অভ্যস্ত বিভিন্ন আদিবাসী জাতিসমূহেরই বিচরণ ক্ষেত্র। তুলনামূলকভাবে যারা সংখ্যায় বেশী, শক্তিশালী বেশী তারাই বিভিন্ন সময় এই অঞ্চলসমূহে এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। এমনকি বিভিন্ন সময় ঢাকা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, চট্টগ্রামসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলও এসব জাতিগোষ্ঠীর রাজ্যভুক্ত ছিল। পূর্ব থেকেই পার্বত্য অঞ্চলটি কার্যত চট্টগ্রামের বাইরে ছিল তারও নানা তথ্য পাওয়া যায়। বস্তুত ব্রিটিশরা আগমনের পর তারাই গোটা উপমহাদেশীয় অঞ্চলকে ধীরে ধীরে অধিকার করে স্থিতিশীলতা দান করেন, সংহত করেন এবং বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানার ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা বার্মা বা আরাকান থেকে, চীন বা হিমালয়ের পাদদেশ, এমনকি সুদূর ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল থেকে আগমন করেছে কিনা তার চেয়ে বড় বাস্তব বিষয় হচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এরাই হচ্ছে আদি ও প্রথম বসতি স্থাপনকারী। এজন্য শত শত বছরের ইতিহাসের দরকার হয় না, মাত্র শ'দুয়েক বছর পেছনে গেলে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ অঞ্চলের আদমশুমারীর ধারাবাহিক পরিসংখ্যান দেখলেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ- পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৪১ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ৯৭.০৬%, বাঙালী জনগোষ্ঠী ২.৯৪%; ১৯৫১ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ৯৩.৭১% আর বাঙালী জনগোষ্ঠী ৬.২৯%, ১৯৬১ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ৮৮.২৩% আর বাঙালী জনগোষ্ঠী ১১.৭৭। অপরদিকে স্বাধীনতার পর জাতিগত আগ্রাসন ও জুম্মদের ভূমি বেদখল করে অনুপ্রবেশের ফলে ১৯৯১ সালে এর অনুপাত দাঁড়ায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী ৫১.৪০% আর বাঙালী জনগোষ্ঠী ৪৮.৬০%।

আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীই যে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম বসতিস্থাপনকারী তার কয়েকটি যুক্তি ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নিম্নরূপ-

ক. চট্টগ্রাম প্রাচীনকাল থেকেই আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বন্দর ছিল। ফলে এটা কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নয় বরং শুরু থেকে নানা জনগোষ্ঠীর বা রাজ্যের মানুষের আনাগোনার ক্ষেত্র ছিল। আর নৈকট্যের কারণে এতে আরাকান, ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের বিচরণ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ফলে এই অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসী জুম্মদের আনাগোনা থাকা স্বাভাবিক।

খ. ড. আহমদ শরীফের লেখায় দেখা যায়, 'খ্রিস্টীয় চার-পাঁচ শতক অবধি আরাকান-চট্টগ্রাম একক অঞ্চলরূপে ছিল। চট্টগ্রাম গোড়া থেকেই সম্ভবত আরাকানী শাসনে ছিল। আর নয় শতকের শেষপাদে ৮৭৭ অব্দের পূর্বে কোন সময়ে সমগ্র সমতট আরাকানী শাসনভুক্ত ছিল।' এই সাক্ষ্য থেকেও এই অঞ্চলে আদিবাসী জুম্মদের বিচরণ থাকার সম্ভাবনা অধিক।

গ. বর্তমান ভারতের আসাম, অরুনাচল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ হয়ে ত্রিপুরা, মিজোরাম, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, আরাকান, বার্মা এ সমস্ত অঞ্চলের ভৌগলিক ও নৃতাত্ত্বিক মানচিত্রও যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী হিসেবে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আদিবাসী জুম্মদেরই বিচরণ থাকার সম্ভাবনা বেশী, বাঙালীর নয়।

ঘ. ড. আহমদ শরীফ তাঁর চট্টগ্রামের ইতিহাস বইয়ে উল্লেখ করেছেন- 'চট্টগ্রামের আর একজন রাজা ববলাসুন্দরের চার সন্তান ছিল: চন্দ্রবাহন, অতীতবাহন, বালবাহন ও সুন্দর হচি। এঁরা সবাই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চন্দ্রবাহন আরাকানে, অতীতবাহন চাকমাদেশে (পার্বত্য চট্টগ্রামে), বালবাহন বর্মায় এবং সুন্দর হচি আসাম-কাছার-ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন।'

ঙ. ড. আহমদ শরীফ আরও উল্লেখ করেছেন- 'পর্গার বিপর্যয়ের সুযোগে আরাকান-রাজ Mihnti প্রবল হয়ে উঠেন। তিনি চট্টগ্রাম জয় করেন। ...মার্কোপোলো এবং ১৩১৩ সনে স্যার জন হার্বার্ট চট্টগ্রাম পর্যটন করেন। ...Mihnti বা মেঙদির আমলে উত্তরবঙ্গের চাকমা রাজধানী মাইচাগির (১৩৩৩-৩৪) আরাকান অধিকারে আগে (আসে?)।' তাঁর লেখায় আরও পাই- 'ইলিয়াস শাহ বংশীয় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর রাজত্বকালে (আরাকানরাজ) মঙ সাউ মঙের ভাই মঙ খ্রী ওর্ফে আলি খান (১৪৩৪-৫৯) রামুর কিছু অংশ অধিকার করেন। ...রামুর যে অংশ আরাকানরাজের অধীনে গেল সে অংশ রাজারকূল আর যে অংশ চাকমা সামন্তের (?) অধিকারে রইল তা চাকমারকূল নামে আজো পরিচিত।'

চ. ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগীজ ইতিহাসবিদ Joao de Barros কর্তৃক ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত Descripcao do reino de Bengalla নামক একটি মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে কর্ণফুলী নদীর পার্শ্ববর্তী 'চাকোমাস' (Chacomas) নামক একটি স্থানের নাম চিহ্নিত আছে। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে Gastaidi নামক একজন ইউরোপীয় কর্তৃক অঙ্কিত BENGALA নামক মানচিত্রে চট্টগ্রামের দক্ষিণ দিকে এবং আরাকানের উত্তর দিকে একটি স্থানের নাম Chadma (চাডমা) হিসেবে পাওয়া যায়।

ছ. চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রথম চীফ Mr. Henry Verelst তাঁর এক ঘোষণায় (১৭৬৩ খ্রিঃ) তৎকালীন চাকমা রাজা শেরমুস্ত খান এর রাজ্যের বিবরণ দেন এভাবে- 'ফেনী নদী থেকে সাঙ্গু পর্যন্ত সকল পাহাড়ী এলাকা এবং নিজামপুর রোড থেকে কুকিরাজার পর্বতমালা পর্যন্ত।'

জ. ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুনু খাঁ দেওয়ানের নেতৃত্বে জুম্মদের যে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৭৭-১৭৮৭) সংঘটিত হয়েছিল যা ইতিহাসে 'তুলা বিদ্রোহ' নামে উল্লেখ রয়েছে। কর্ণফুলী নদীর উজান বেয়ে অভিযানে আসা ব্রিটিশ সৈন্যদের জুম্ম বিদ্রোহীরা এক দশক ধরে বার বার পরাজিত করেছিল। কিন্তু একপর্যায়ে জুম্মদের অভিজাত শ্রেণীর একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তৎকালীন রাজা জানবক্স খাঁ দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ১৭৮৭ সালের এক আক্রমণে জুম্মরা পরাজিত হলে কলকাতার ফোর্ড উইলিয়াম দুর্গে ব্রিটিশদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

উপরোক্ত তথ্য থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের কিয়দংশ জুড়ে কারা বিচরণ করেছিলেন এবং কারা রাজত্ব করেছিলেন। আর এই আদিবাসী জুম্মদের কর্তৃক মোগল এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রতিরোধ সংগ্রামও সেই সাক্ষ্য দেয়। সর্বশেষ পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বিশেষত্বকে এবং আদিবাসী জুম্মদের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে স্বীকার করেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন বহির্ভূত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে এবং শাসনের সুবিধার্থে প্রথমে চাকমা, পরে বোমাং ও মং এই তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে।

এখন আদিম বাসিন্দার ভিত্তিতে যে বাঙালীরা আদিবাসী হতে চায় তাহলে তাদের সুদুর বঙ্গ বা বঙ্গাল রাজ্যে বা অঞ্চলে চলে যেতে হয়। যেখান থেকে বাঙালী জাতির উৎপত্তি। আর আদি বাসিন্দার আরও যদি হিসাব কষি তাহলে পাহাড়ী-বাঙালী সবাইকে এই উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে সুদুর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বা তার আশেপাশের অঞ্চলে। মানবজাতির ইতিহাস তো তাই বলে।

আবদুল হালিম ও নুরুন নাহার বেগম তাঁদের 'মানুষের ইতিহাস প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন- 'পৃথিবীর সব দেশের মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। ...আধুনিক মানব সমাজের উৎপত্তি হয়েছিল একটা মাত্র উৎস থেকে। আদিম এ মানুষদের সংস্কৃতি ছিল পুরান পাথর যুগের শিকারী সমাজের সংস্কৃতি। এ যুগে মানুষ তার সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের দেহের বিবর্তন ঘটিয়ে যে সুসম্পূর্ণ মানব দেহের উদয় ঘটিয়েছিল, আধুনিক পৃথিবীর সব কটি জাতির প্রত্যেকটি মানুষ সে সুপরিণত মানবদেহেরই উত্তরাধিকার মাত্র। আদিম শিকারী মানুষ যে সমাজ সংগঠন এবং বস্তুগত ও ভাবগত সংস্কৃতি সৃজন করেছিল তার অনেক উপাদানে আজকের পৃথিবীর সবকটি জাতির ও সমাজের মূল ভিত্তিরূপে কাজ করছে। আদিম মানুষ যে ভাষার উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল সে ভাষা ও চিন্তাক্ষমতা, তার উদ্ভাবিত প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী এবং নানাবিধ সামাজিক আচরণ ইত্যাদি আজকের দিনের সব মানবগোষ্ঠীর সামাজিক আচরণের মূল ভিত্তিরূপে বিরাজ করছে। ...আদিম শিকারী সমাজের মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমশ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।'

ড. আহমদ শরীফ তাঁর 'বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' লেখায় উল্লেখ করেছেন- "আজকাল যে কথাটা স্বীকৃত হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমরা যদি অস্ট্রিক-মোঙ্গলদের বংশধর হই, তাহলে সেই অস্ট্রিক-মোঙ্গলরা চিরকাল এদেশে ছিল নির্জিত, নিপীড়িত। তাদের অধিকাংশ মানুষ এখও নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের– অস্পৃশ্য। তারা কখনও মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। তাদের মধ্যে যারা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেছে তারা সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি। ...আমরা দুই হাজার বছর ধরে বিজাতি, বিভাষী বিদেশীদের দ্বারা পীড়িত হয়েছি, নির্জিত হয়েছি। আমাদের স্বগোত্র স্বজাতি আজও নিরন্ন, নিপীড়িত, নিম্নবিত্ত ও মানবিক-মৌলিক অধিকার-বঞ্চিত। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে- হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-বাগদিরাই আমাদের স্বগোত্র, স্বজাতি, আমাদের ভাই। আমাদের দেহে তাদেরই রক্তের ধারা বহমান। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সাঁওতাল, কোচ, গারো, খাসিয়া, চাকমা আমাদের ভাই। আমরা যারা আমাদের গোত্র পরিচয় মুছে দিয়ে আমাদের জাতি পরিচয় লুকিয়ে বিদেশী, বিভাষী, বিজাতি শাসক শ্রেণীতে মিশে যেতে চেয়েছি, শাসকের সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করেছি, শাসকের পরিচয়ে আত্মপরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি, তারা ভুল করেছি, আত্মপ্রবঞ্চনা করেছি- তার জন্যে আমাদের দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। এটা আমাদের উপলব্ধিতে না আসলে ইতিহাস চর্চা হবে অর্থহীন।"

বিশিষ্ট লেখক মঙ্গল কুমার চাকমা তাঁর 'আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের অধিকার ও সরকারের অবস্থান' প্রবন্ধে যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, "'প্রথম বা আদি অধিবাসী' অর্থে যেভাবে আদিবাসী বুঝানো হয়ে থাকে, এশিয়ার ক্ষেত্রে তার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এশিয়ার ক্ষেত্রে 'প্রথম বা আদি অধিবাসী' বৈশিষ্ট্যের চেয়ে যাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হতে পৃথক, যারা রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করে, ভূমির সাথে যাদের নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক,

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা সাধারণভাবে মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে সেই অর্থেই আদিবাসী হিসেবে বুঝানো হয়ে থাকে। উক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলাদেশের মতো এশিয়ার অন্যান্য দেশে যেমন- নেপাল, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশেও এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। ...ঐতিহাসিক কাল থেকে যাদের উপর চরম বৈষম্য ও বঞ্চনা চলে আসছে তাদের সেই বিশেষ প্রোপটকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রদানের জন্য জাতিসংঘসহ বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশে সেসব অবহেলিত ও উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে।"

পরিশেষে এটাই আমরা বলতে চাই, জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল। আমাদের ইতিহাসের উৎপত্তি যেখানেই হোক না কেন, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভূমিকা ভালো হোক, গণতান্ত্রিক হোক, মানবতাবাদী হোক, আমাদের প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান সমমর্যাদা ও সমঅধিকার ভিত্তিক হোক এটাই কাম্য। তাতেই আমাদের সবার ভবিষ্যত, দেশের ভবিষ্যত সুন্দর ও নিরাপদ হতে পারে। আরেক জাতির ইতিহাসকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে এবং তার ঐতিহ্যগত ও ভূখন্ডের অধিকার কেড়ে নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রে কখনো শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা

এম কে চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজ। সমাজে সামন্ত শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি, শাসন-শোষণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনেকাংশে দুর্বল হয়ে আসলেও সামন্ত সমাজের শ্রেণীগত চিন্তা, সামাজিক বন্ধন, সাংস্কৃতিক আবহ সমাজে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে পরিব্যাপ্ত থাকতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে সামন্ত সমাজের ক্ষয়প্রাপ্তির পাশাপাশি সমাজ বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদী সমাজ বিকশিত হতে থাকলেও সনাতনী অর্থে জুম্ম সমাজে এখনো পুঁজিবাদ বিকশিত হয়নি বা পুঁজিবাদী সমাজের প্রারম্ভিক গোড়াপত্তনও এখনো সেভাবে হতে পারেনি বলা যায়। জুম্ম সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশ ততটা গভীর না হলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পুঁজিবাদী সমাজের উচ্চাভিলাষী ও ভোগবাদী সংস্কৃতি জুম্ম সমাজে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বিকশিত হচ্ছে এবং জুম্ম সমাজের বাহ্যিক অবয়বে তা অনেকটা গতিশীল মাত্রায় পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

সমাজ বিকাশের এমনি একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে জুম্ম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। জুম্ম সমাজে যারা ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, চাকুরীজীবী, আইনজীবী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ধনী কৃষক, মাঝারী কৃষক, এনজিও কর্মী, বিদেশে অভিবাসী তারা সাধারণভাবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। শোষিত-বঞ্চিত ও অধিকারকামী জুম্ম জনগণের মধ্যে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা অস্বীকার বা অবহেলা করার কোন উপায় নেই। সমাজে তারা বেশ প্রভাবশালী ও কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকটা নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। এমনকি মুক্তি সংগ্রামে এই শ্রেণী থেকে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

জুম্ম সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাধারণভাবে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ হলো তারা যারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল এবং যাদের কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ ও সম্পদ থাকে। দ্বিতীয় অংশে যারা রয়েছে তারা অর্থনৈতিকভাবে তেমন সচ্ছল না হলেও মোটামুটি পরিবারের ভরনপোষণের খরচ উপার্জন করতে পারে এবং তাদের মধ্যে আরো ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। তবে তাদের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর তৃতীয় অংশের লোকেরা অর্থনৈতিকভাবে তেমন সচ্ছল নয় এবং যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিনের পর দিন আরো খারাপের দিকে যেতে থাকে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথম অংশের লোকদের সংখ্যা সমাজে তেমন একটা নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তারা সবচেয়ে সংখ্যালঘু অংশ। যেহেতু অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তারা সবচেয়ে ধনী ও সচ্ছল, সেহেতু কিছু হারানোর ভয়ে তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে দূরে থাকে। তারা আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতি চরম সন্দেহের মনোভাব পোষণ করে। আন্দোলনে তাদের ভূমিকা থাকে দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল। তারা অনেকাংশে আন্দোলনের চরম বিরোধিতা করে থাকে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিতীয় অংশের লোকদের ভূমিকা মধ্যপন্থী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তারা সংখ্যায় সবেচেয়ে বেশী। তারা আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক এবং নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করে। তারা আন্দোলনের বিরোধিতা করে না। তবে সাধারণভাবে তারা দেশের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি থাকে খুবই ভীতশ্রদ্ধ। তারা শাসকগোষ্ঠীকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করে এবং তাতে করে আন্দোলন-সংগ্রামের সফলতা বিষয়ে তারা থাকে সন্দিহান। তবে আন্দোলন-সংগ্রাম যখন তুঙ্গে উঠে এবং উত্তাল হয়ে উঠে তারা তখন আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে।

আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তৃতীয় অংশের লোকদের জীবনযাত্রা তথা অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত অবনতি হওয়ার কারণে তারা মানসিকভাবে হয়ে পড়ে ক্ষতবিক্ষত ও বিক্ষুব্ধ। সেজন্য তারা বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজের প্রত্যাশা করে এবং এক পর্যায়ে আন্দোলন-সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই তৃতীয় অংশের লোকেরাই খেটে খাওয়া শোষিত-বঞ্চিত সাধারণ গণমানুষের সাথে একাত্ম হয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিতীয় অংশ বা মধ্যপন্থী অংশের সংখ্যাই যেহেতু বেশী, তাই আমাদের জুম্ম সমাজে মধ্যবিত্তের এই অংশটির ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই অংশটির মধ্যপন্থী চরিত্রের মধ্যে যেমন একদিকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে আবার অন্যদিকে তাদের মধ্যে একটা দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী চরিত্রও ক্রিয়াশীল থাকে কিছুটা জাতীয়তাবাদী চরিত্রের কারণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে মনে আন্দোলনের প্রতি একটা নৈতিক সমর্থন প্রদান করে। এই অংশটি বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে সমর্থন প্রদান করছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনেও সামিল হচ্ছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে প্রতিবাদ সমাবেশ, মানব বন্ধন, সেমিনার, কর্মশালা, সরকারের বিভিন্ন মহলসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবি-ক্যাম্পেইন চালানো ইত্যাদি কর্মসূচীতে সামিল হতে দেখা যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের এই কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে একটা

ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাদের মধ্যপন্থী চরিত্রের কারণে তাদের এই আন্দোলনমুখী কার্যক্রম মূলতঃ এক ধরনের নমনীয় কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাদেরকে এর থেকে অধিকতর কঠোর কর্মসূচীতে সামিল হতে সচেতনভাবে বিরত থাকতে দেখা যায় বা সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে দেখা যায়। এমনকি উল্লেখিত নমনীয় কর্মসূচীতে তাদেরকে লাগাতারভাবে বা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে অবিচল মানসিকতা নিয়ে যুক্ত থাকতেও কম দেখা যায়।

জুম্ম সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই যারা বর্তমানে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী, চাকুরীজীবী বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, ধনী বা মাঝারী কৃষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি, বিদেশে অভিবাসী তাদের অধিকাংশই বর্তমান সময়ে নানা সুবিধাবাদী ও আত্মমুখী ভূমিকা গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। তাদের মধ্যে একটা অংশকে দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো- যেগুলো সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারে- সেসব দলগুলোর সাথে যুক্ত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির কথা বলা যেতে পারে। এসব দলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি জুম্ম জনগণসহ আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ঘোর বিরোধী। তাদের মূল এজেন্ডাই হলো অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা। অপরদিকে আওয়ামীলীগ বুলিতে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী এবং জুম্ম জনগণসহ আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে দাবী করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আদিবাসী জাতিসমূহের জাতিগত পরিচিতিসহ তাদের মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আওয়ামীলীগের নীতি ও চরিত্রের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। যারা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, সেই দলে সদস্যভূক্ত হওয়াটা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী রাজনীতির সাথে জুম্ম মধ্যবিত্তদের যুক্ত হওয়ার পেছনে মুখে যেই যুক্তি দেখানো হোক না কেন তা চরম সুবিধাবাদিতা ও স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শাসন ক্ষমতায় থাকলে বা ক্ষমতায় যেতে পারলে অর্থ ও ধন সম্পদ লাভ করা যায়, চাল-গম পাওয়া যায়, চাকুরী-ঠিকাদারী ইত্যাদি হস্তগত হয়। আখেরে তাতে প্রচুর লাভ হয়ে থাকে। জুম্ম জাতীয় স্বার্থ জাহান্নামে যাক তাতে কি আসে যায়- এমনিতর চরম প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জুম্ম মধ্যবিত্তদের এই সুবিধাবাদী চরিত্রের অপর নাম হচ্ছে দালালীপনা। দালালীপনা করে বড়জোর দেশের শাসকগোষ্ঠীর কিছু উচ্ছিষ্ট লাভ করা যায় মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও তার আলোকে প্রণীত আইনানুযায়ী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন না দিয়ে নিজের দলের সেইসব জুম্ম তাঁবেদারদের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠী অগণতান্ত্রিকভাবে এসব জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করছে এবং তাঁবেদারী শুল্ক হিসেবে সেইসব তাঁবেদারদের অবাধে লুঠতরাজ চালাতে সুযোগ করে দিচ্ছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতায় বসে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন ভূমিকাই পালন করছে না। পক্ষান্তরে শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ডা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো অতি সম্প্রতি গত ৩ অক্টোবর ২০১১ অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের একযোগে যোগদান। যেখানে পার্বত্যবাসীসহ দেশের নাগরিক সমাজ এবং ভূমি কমিশনের অন্যতম সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও তিন সার্কেল চীফ ভূমি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যানের একতরফা ও বিধি-বহির্ভূত কার্যক্রমের কারণে তাঁর অপসারণের দাবীতে সোচ্চার, সেখানে তারা সুবোধ বালকের মতো সুড় সুড় করে ঐ বিতর্কিত চেয়ারম্যানের ডাকা সভায় যোগ দিল। এরকম নির্লজ্জ দালালীপনার উদাহরণ আর কি হতে পারে! অথচ তিন পার্বত্য জেলার সামগ্রিক স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে যদি তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতো তাহলে শাসকগোষ্ঠী অন্তত কিছুটা হলেও নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হতো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত জুম্ম মধ্যবিত্তদেরও একই ধরনের মুৎসুদ্দী কান্ডকারখানা আজ সর্বত্র প্রতীয়মান হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই বোর্ডকে পরিচালনা করার পরিবর্তে শাসকগোষ্ঠীর উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের ভিত্তিতে এই বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে। এতে এখানকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মতামত, চাহিদা ও প্রতিনিধিত্বের কোন বালাই নেই। ফলে এই উন্নয়ন বোর্ড এখনো পূর্বের মতো জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

আর জুম্ম সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে অংশ ব্যবসা, ঠিকাদারী, শিক্ষকতা, আইন ও বুদ্ধিবৃত্তিক পেশা, চাষাবাদ ইত্যাদি স্বাধীন পেশায় যুক্ত রয়েছে বা চাকুরী জীবন-অন্তে অবসর জীবন কাটাচ্ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রাম সম্পর্কে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলেছে। তারা চরম প্রশান্তবাদিতায় দিন অতিবাহিত করছে। তাদের মধ্যে তীব্র বৈষয়িক প্রবণতা ক্রিয়াশীল রয়েছে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের ভোগ-বিলাসের মধ্যেই তাদের জীবনের গণ্ডি সীমাবদ্ধ বলা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনসহ জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদের নৈতিক বা বৈষয়িক সমর্থন অত্যন্ত নেতিবাচক। অথচ তাদের মধ্যে অনেকের মাসিক আয়ও টাকার অংকে লক্ষাধিক। কিন্তু আন্দোলনে আর্থিকভাবে সমর্থন দানের ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত কঞ্জুস ও স্বার্থপর। তবে তাদের মধ্যে অনেকে আবার আন্দোলনের করণীয় বিষয়ে উপদেশ বা পরামর্শ দানে বেশ পারদর্শী। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্মদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে কি সঠিক কাজ করেছে, কি চরম ভুল করেছে, বর্তমানে আশু করণীয় কি ইত্যাদি বাৎলে দেয়া তাদের পক্ষে কোন বিষয়ই নয়। কিন্তু তারা নিজেরাই কখনোই এই আন্দোলনে যাবে না বা অংশগ্রহণ করবে না। সেক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হলো- তারা না গেলেও কোন অসুবিধা নেই; আছে তো অনেক লোক, যারা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে। নিজে করবে না, সব অন্যরা করবে- এই হলো তাদের দর্শন বা মূলমন্ত্র। আর অর্থনৈতিক সমর্থনের কথা বললে এমনভাবে নিজের আর্থিক অবস্থাকে তুলে ধরবে যেন মনে হবে যে, সে কত নিঃস্ব, অসহায়; যেন আর্থিক অনুদান তার অপরিহার্য- এমনিতর অবস্থা।

জরুরী অবস্থার সময় জরুরী অবস্থাকে ব্যবহার করে দেশের শাসকগোষ্ঠী জুম্মদের চলমান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালায়। সে সময় একদিকে জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ সমিতির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদেরকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে নির্বিচারে ধরপাকড়, মিথ্যা মামলা দায়ের, হুমকি প্রদান ইত্যাদি দমন-পীড়নমূলক কার্যক্রম চালানো হয়। জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে নিয়েও ষড়যন্ত্র চলেছিল; তাকে হত্যা বা কারাবন্দী করতে চেয়েছিল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। খোদ সমিতির অভ্যন্তরেও নানা কৌশলে ক্ষুদে দলবাজের জন্ম দিয়ে সমিতির মধ্যে তথাকথিত সংস্কারের ধোঁয়া তুলে আভ্যন্তরীণ সংকটকে উসকে দেয়া হয়। অপরদিকে এই সুযোগে ইউপিডিএফের আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা দেয়া হয় এবং তাদেরকে দিয়ে সমিতির কর্মীদের উপর হত্যা, অপহরণ, হামলা ইত্যাদি চালানো হয়। বলা যায় এ সময় জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক অবস্থা অনেকটা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। জনসংহতি সমিতির প্রতি শাসকগোষ্ঠীর এমনিতর কঠোর অবস্থানের কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি প্রভাবশালী অংশ জনসংহতি সমিতিকে এড়িয়ে যেতে থাকে এবং চুক্তি অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত উন্নয়ন কর্মী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, চাকুরীজীবী, আইনজীবী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, এনজিও কর্মী, সমাজের মুরুব্বী শ্রেণীর ব্যক্তিরা অন্যতম। তাদের মতে, জনসংহতি সমিতি একটি দল হিসেবে তাদের সাংগঠনিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন তথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া বা নেতৃত্ব দেয়া আর সম্ভব হবে না। আর ইউপিডিএফ রাজনৈতিকভাবে একটি অপরিপক্ক ও হঠকারী দল। তারা মুখে যাই বলুক না কেন পার্বত্যাঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও জুম্ম জনগণের উপর অস্ত্রের মুখে খবরদারী করা ছাড়া তারা জুম্ম জনগণকে কিছুই দিতে পারবে না।

কাজেই এমনিতর অবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা রাজনৈতিকভাবে স্বার্থপর ও উচ্চাভিলাষী অংশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তারা একদিকে চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে অন্যদিকে এই বিশেষ সংকটময় সন্ধিক্ষণে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তারাই একমাত্র গোষ্ঠী যাদের ছাড়া এখন আর জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের কোন বিকল্প নেই এমনতর ধারণা নিয়ে বুদ হয়ে থাকে। তারা সামন্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই অংশ যারা শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে আন্দোলনের ভাটার সময় হয় একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে যায়, না হয় চরম প্রতিক্রিয়া করে থাকে; আবার আন্দোলনের উত্তাল সময়ে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সেই অংশকে সংগঠিত করে তারা জুম্ম সমাজে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এক সুযোগসন্ধানী প্রয়াসে লিপ্ত হয় তারা একদিকে দেশে-বিদেশে ওয়ার্কসপ-সেমিনার করে আর অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় সফর করে জনগণের সাথে তথাকথিত মতবিনিময় করে তাদের পক্ষে জনমত গঠনে ব্রতী হয়। তারা দীর্ঘদিন ধরে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামরত নেতৃত্বের সাথে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে এবং প্রকারান্তরে তারা অত্যন্ত সুকৌশলে সংগ্রামরত নেতৃত্বের সমান্তরাল একটি নেতৃত্ব খাঁড়া করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। সমাজে তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই তা জাহির করার জন্য জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডিএফের মধ্যকার সমঝোতা প্রতিষ্ঠার মতো বাস্তব-বিবর্জিত ধোঁয়াও তারা তুলে থাকে। এমনিতর নানা সুবিধাবাদী এবং সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠার ফাঁদে আটকে আছে আমাদের জুম্ম সমাজের মধ্যবিত্ত সমাজ যাদের সংগ্রামী ভূমিকার দিকে এতদিন চেয়ে আছে অধিকারকামী আপামর জুম্ম জনগণ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটা সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকাকে অস্বীকার বা অবহেলা করার কোন উপায় নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে এই শ্রেণীকে বরঞ্চ অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে দেখা যায়। গত শতকের ষাট ও সত্তর দশকে জুম্ম ছাত্র সমাজকে জাতীয় জাগরণে উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের প্রথমে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং পরে একটা পর্যায়ে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল অংশের লোকেরাই কোন না কোনভাবে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল।

একটা জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে আন্দোলন করে জনগণ, পরিচালনা করে কর্মীবাহিনী আর নেতৃত্ব দেয় পার্টি। আপামর জুম্ম জনগণ গোড়া থেকেই অধিকারকামী। তারা তাদের উপর চলমান জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক শাসন-শোষণ অবসান চায়। তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু তাদেরকে একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা, ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তায় তাদের সংগঠিত করা এবং তাদেরকে দুর্বার আন্দোলনে সমবেত করার কাজটা করতে হবে কর্মীবাহিনীকেই। কর্মীবাহিনীর কাঁধেই সেই মহান গুরু দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। ভিন্ন ভাষাভাষি অসমভাবে বিকাশমান জুম্ম জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলে এমন কর্মীবাহিনী দরকার যে কর্মীবাহিনী ইস্পাত-কঠিন দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদে আত্মপ্রত্যয়ী। এই কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজের খেটে খাওয়া বিপ্লবী শ্রেণীর মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী অংশের ভূমিকাও অপরিহার্য। তারা একাধারে প্রত্যক্ষভাবে কর্মীবাহিনীর সদস্য হিসেবে যোগ দিয়ে সার্বক্ষণিক ভূমিকা রাখবে, তেমনি সমাজের মধ্যে মোটামুটি আর্থিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী বিধায় তারা আন্দোলন-সংগ্রামে আর্থিক যোগান দিয়েও আন্দোলনের চাকাকে সচল রাখার ভূমিকা তাদের রাখতেই হবে। শুধু তাই নয়, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ফ্রন্টে অবস্থান নিয়ে তাদের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী ভূমিকাও পালন করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমনিতর ভূমিকা ইতিহাসে প্রমাণ মেলে।

বর্তমানে দেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ী (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী যে দলেরই হোক না কেন তারা পাহাড়ী (উপজাতি) অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তারা একাধারে সমতল অঞ্চল থেকে বাঙালী পরিবার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলছে অপরদিকে সেটেলার বাঙালীদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে জুম্মদের তাদের চিরায়ত ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা-জমি জবরদখল করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধিতার নামে ইউপিডিএফের মতো সন্ত্রাসী সংগঠনকে মদদ দিয়ে জুম্মদের মধ্যে হানাহানি ও সংঘাত চাপিয়ে দিয়ে চলেছে। বন বিভাগের তথাকথিত বনায়ন, সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, অস্থানীয় বহিরাগতদের নিকট জুম্মদের প্রথাগত মালিকানাধীন জুমভূমি নির্বিচারে লীজ প্রদান, নানা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট কথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংসের জন্য শাসকগোষ্ঠী চতুর্মুখী মরিয়া অপপ্রয়াস চলছে। এমনিতর এক জাতীয় সংকটে জুম্ম জনগণের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী অংশকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মধ্যে যে বিপ্লবী চরিত্র রয়েছে সেটাকে উজ্জীবিত করে এই জাতীয় সংকট মুহূর্তে উদাসীনতা ও প্রশান্তবাদিতায় নিদ্রামগ্ন না থেকে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে তাদের জাগ্রত ও সক্রিয় হতেই হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন : জুম্ম যুব সমাজের ভূমিকা

এস চাকমা

যুগে যুগে যে কোন জাতির বিপ্লবে বা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হোক যুব বয়সের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তারুণ্য। আর সে কারণে দেখা যায় বিভিন্ন দেশের মনীষীরা প্রত্যেকেই প্রসঙ্গক্রমে যুবসমাজের ভূমিকাকে স্মরণ করেছেন, যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে যুবরা হচ্ছে প্রাণশক্তি, সাহস আর সৃজনশীলতার আধার। এ এক প্রাকৃতিক বাস্তবতা। সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে উঠে, এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে সকল মনে অনুভব করে।' ফলে সমাজের যাবতীয় জঞ্জাল অপসারণে, জাতির দুর্যোগ মোকাবেলায়, প্রগতির সব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের পাশাপাশি জাতীয় জাগরণে ও নতুন সমাজ বিনির্মাণে যুবশক্তি এক অপরিহার্য হাতিয়ার। এই যুবসমাজ যে কোন দুর্যোগে যেমনি এগিয়ে যায়, তেমনি প্রায়ই যৌবনের স্পর্ধায় দিশেহারা মানুষকে দেখায় এগিয়ে যাওয়ার পথ।

তেমনি যে কোন জাতির প্রগতির ইতিহাসের পরতে পরতে যুব সমাজের বৈপ্লবিক ভূমিকার স্বাক্ষর পাই। ভারতের এক মনীষী স্বামী বিবেকানন্দও যুবদের আহ্বান করে বলেছেন, 'আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিয়াছেন, আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী যুবকগণই ইশ্বরলাভ করিবে। এই-ই সময় তোমাদের ভবিষ্যত জীবনগতি স্থির করিবার- যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে; কাজে লাগ, এই-ই সময়।' তিনি আরও বলেছেন, 'যুবকগণ, ওঠো, জাগো, শুভ মুহূর্ত সমাগত। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না। নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সফলতা লাভ করিব।' বলাবাহুল্য, এই স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন এক মহাযুবক। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

চীনের বিপ্লবী নেতা মাওসেতুং তরুণ বয়সেই চীনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও বিপ্লবীদের সংগঠিত করেন। ভিয়েতনামে যুবক হোচিমিন স্কুলের পড়াশোনা শেষ করেই দেশের শোষণ-বঞ্চনা ও মাতৃভূমির দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে বেরিয়েছিলেন পৃথিবীর পথে স্বাধীনতার মন্ত্র খুঁজে পেতে। আর তিনি সত্যিই সেই মন্ত্র খুঁজে পান এবং এক সময় কঠিন-কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্ত করেন মাতৃভূমিকে। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও চে গুয়েভারাও তরুণ বয়সেই কিউবার স্বৈরাচারী শাসককে উৎখাত করে বিপ্লবী শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এদেশের প্রীতিলতা, কল্পনারাও যুব বয়সেই জাতির ও সময়ের প্রয়োজনে সংগ্রামে এসে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

আর জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা এম এন লারমা! সবে কলেজের ছাত্র, অথচ তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি তৎকালীন সময়ে জুম্ম জাতির মরনফাঁদ কাপ্তাই বাঁধের বিরোধিতা করেছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন এবং লিফলেট লিখে-ছেপে-প্রচার করে জনমত গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। এক পশ্চাদপদ সমাজে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকেও জুম্ম ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার মত সাংগঠনিক সৃজনশীলতা দেখিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি যখন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, তখন তার বয়স মাত্র ৩১ বছর আর ১৯৭৩ সালে তিনি যখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তখন তার বয়স ৩৩/৩৪ বছর। দুঃখজনক যে এই মহান নেতাকে জুম্ম জাতি হারায় মাত্র ৪৪ বছর বয়সে।

আর ৬০-৭০ দশকের সেই তরুণ নেতা এম এন লারমা ও সন্তু লারমার নেতৃত্বেই তৎকালীন সময়ের জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ সমবেত হয় জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে। শুরু করে মহান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এই তরুণদের নেতৃত্বেই শুরু হয় নতুন ধারার রাজনীতি, প্রগতিশীল রাজনীতি। তারা কেবল রাজনীতির শ্লোগান উচ্চারণ বা দাবীদাওয়ার কাজ করে যাননি। কিংবা কেবল গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাননি। পুরাতন সমাজের মূলে তারা আঘাত হেনে জুম্ম সমাজকে জাগরিত করেন। জুম্ম সমাজের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা, সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও গভীরতর এক বিপ্লবের সূচনা করেন। বস্তুত এই যুবসমাজই জুম্ম জাতিকে নতুন পথের দিশা দেখিয়ে দেয় এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অনুপ্রেরণা যোগায়।

আজকের দিনের জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যুবসমাজের ভূমিকা ও কর্তব্য এক অনিবার্য বাস্তবতা। আর এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জাতির যুবসমাজ যাতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যথাযথ ভূমিকা ও কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসে সেজন্য যুব সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র সংগঠন গঠন করে।

বলাবাহুল্য, জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ এক গভীর সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করছে। জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন আজ নানা ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন। একদিকে অনেক রক্ত ও অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার

বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন কাজ আজ বন্ধ হয়ে আছে। নির্বাচনী ইশতেহারে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার থাকলেও বিগত প্রায় তিন বছরে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে জুম্ম জনগণসহ স্থায়ী অধিবাসীরা তাদের অনেক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। সেটেলারদের কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি বেদখল, বেআইনী অনুপ্রবেশ, নারী ধর্ষণ, হত্যা এখনও বন্ধ হয়নি। অপরদিকে চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ ও পার্টি থেকে বিচ্যুত সংস্কারপন্থীরা পার্টি ও জুম্ম স্বার্থবিরোধী, বিভেদপন্থী ও নানা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে আওয়ামীলীগ, বিএনপি ইত্যাদি দলে রাজনীতি করার নামে এক শ্রেণীর জুম্ম চরম সুবিধাবাদী ও দুর্নীতিমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির নোংরা পাঁকে নিমজ্জিত হচ্ছে।

জাতির এমনি এক প্রেক্ষাপটে অতীতের ন্যায় আজকের দিনের যুব সমাজকেও অবশ্যই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের আন্দোলনে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসতে হবে। আজকে যুবসমাজকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে বাধাগ্রস্ত করতে পশ্চাদমুখী সামন্তবাদ ও অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ জুম্ম সমাজের যুবসমাজকে নানাভাবে আক্রমণ করছে। একদিকে সামন্তবাদী চিন্তাধারা যুবসমাজের বিরাট একটি অংশকে সংগ্রাম বিমুখ প্রগতিবিরোধী, রক্ষণশীল ও স্বার্থান্ধ করে রেখেছে অপরদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তা চেতনা যুবসমাজকে সুবিধাবাদ, ধান্ধাবাজি, দুর্নীতি, সামাজিক অসঙ্গতি, কর্মহীনতা, হতাশা, বিশৃঙ্খলা, নেশার দ্বারা আক্রান্ত করে চলেছে। তাই যুবসমাজকে এই দুই ধারার শত্রুর ভুল চিন্তাধারা পরিহার করে প্রগতিশীল আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রাম করতে হবে।

যুবসমাজকে আজকে উপলব্ধি করতে হবে যে, এম এন লারমাসহ বহু শহীদের রক্ত, অনেক গণহত্যা ও অগুণতি মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তি যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হয় তাহলে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব কখনো নিরাপদ থাকতে পারে না। আর জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যদি নিরাপদ না থাকে তাহলে জুম্ম জাতি অনিবার্যভাবে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, বিগত ১৪ বছরেও চুক্তিটি যথাযথাভাবে বাস্তবায়িত হতে না পারায় জুম্মরা আজ সেই দিকেই ধাবিত হচ্ছে। আর এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে জুম্ম জনগণ কখনো ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। নিজেদের ভূমিতে জুম্মরা নিশ্চিন্তে চাষাবাদ করতে পারবে না, নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে না, মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না, মা-বোনরা মান-ইজ্জত নিয়ে চলাফেরা করতে পারবে না। আর চাকুরি-বাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেও নিরাপদে থাকা সম্ভব হবে না। সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তি যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হয় তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মও গভীর সংকটের সম্মুখীন হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে বহুবার জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছে, শত শত বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, প্রতিনিয়ত জুম্মদের ভূমি বেদখল বা বেদখলের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, আর আগের মতই সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক জুম্ম নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা ইত্যাদি জুম্ম স্বার্থবিরোধী ঘটনা ঘটে চলেছে। ফলে এমনিতর পরিস্থিতিতে তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজ কখনো উদাসীন ও আত্মমুখী হয়ে থাকতে পারে না।

সন্তুলারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সেই আন্দোলনে যুবসমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতির বর্তমান-ভবিষ্যতের জন্যই যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। জুম্ম জাতি নিশ্চয়ই তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আর যে সমাজে যে জাতিতে ও যে ভূমিতে সে লালিত-পালিত হয়েছে সেই সমাজ, জাতি ও ভূমির প্রতি তার অবশ্যই দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। শিক্ষিত হোক, অর্ধশিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত হোক- যুবরাই আন্দোলনে নির্ধারক ভূমিকা রাখতে পারে। আজকে শহরে-বন্দরে-গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেক যুবক-যুবতী কেবল স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে জীবনযাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করছে, আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে চাইছে। ফলে যুবসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু এই বাস্তবতা তাদের উপলব্ধি করতে হবে যে শাসন-শোষণ নির্ভর, বৈষম্য ভিত্তিক বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় ন্যায়-নীতি ও মর্যাদা বজায় রেখে সত্যিকারের জীবন গড়া সম্ভব হয় না। বিশেষত জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়ে জুম্ম জাতির যুবক-যুবতীরা নানাভাবে বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। ফলে দেখা যায় অনেক যুবক-যুবতী আজ তাদের বৃথা সময় নষ্ট করছে, দিশেহারা হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। অনেক শিক্ষিত যুবক কেবল সামান্য চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য তাদের শিক্ষা ও যৌবনকে বিনষ্ট করছে, এমনকি কেবল তথাকথিত একটু বাঁচার নিশ্চয়তার জন্য নীতি-নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্বকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। বস্তুত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হয় অথবা এর জন্য যদি ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি বা আন্দোলন বিকশিত করা না যায় তাহলে আজকের যুবসমাজ তো বটেই ভবিষ্যতের যুবসমাজ তথা সমগ্র জুম্ম জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। বলাবাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিকশিত করার মধ্য দিয়েই যুবসমাজের সত্যিকারের ভবিষ্যতকে খুঁজে পেতে

হবে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলেই জুম্মরা নিজেদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে ভবিষ্যত জীবন গড়ার পথ খুঁজে পেতে পারে।

কাজেই জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সকল দ্বিধা-সংশয়, জড়তা ঝেড়ে ফেলে যুবসমাজকে অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হতে হবে। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বেই জুম্ম যুবসমাজকে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই যুবসমাজকে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে যেখানে জুম্ম সেখানেই আন্দোলনের দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। যেখানে ভূমি বেদখল, নারী ধর্ষণ-নির্যাতন সেখানেই যুবসমাজকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। জাতীয় রাজনীতি করার নামে জুম্মদের মধ্যে যারা আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামে-গঞ্জে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জনগণকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে এবং সমাজে দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যুবসমাজকে অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে।

এখন শহর ও গ্রাম্য সমাজে যে অপসংস্কৃতির ছড়াছড়ি, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তার বিরুদ্ধেও এগিয়ে আসতে হবে যুবসমাজকে। অনেক যুবক আজ নেশা ও নৈতিক অধপতনের শিকার হচ্ছে, অনেক যুবতী বিভিন্ন চক্রের ষড়যন্ত্রে বিপথগামী হচ্ছে- এসবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে যুবকদেরই। সকল যুবসমাজকে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা ধারণ করে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিতে হবে।

আর যারা চুক্তি বিরোধীতার নামে জুম্মদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ধ্বংসের খেলায় মেতেছে এবং উপদলীয় চক্রান্তকারীরা যারা জুম্ম জাতির প্রকৃত হাতিয়ার পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে সেসব অপশক্তিকে নির্মূলের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে যুবসমাজকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি থেকে সকল প্রকার বিভেদপন্থী ও তথাকথিত সংস্কারপন্থীর ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ড নির্মূল করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ও যুবসমাজকে এ সমস্ত অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আর এজন্য সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে যুবসমাজকে।

এ সবকিছুর জন্য যুবসমাজকে জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে সমবেত হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি যুবককে প্রগতিশীল মতাদর্শে ও এম এন লারমার চিন্তাধারায় সুসজ্জিত হতে হবে। নেতৃত্ব বিকাশের জন্য আরও গভীর অধ্যয়নে মনোযোগী হতে হবে এবং অধ্যয়ন, অনুশীলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে সংযোগ ঘটাবে হবে। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থকে সরিয়ে রাখতে হবে। প্রগতিশীল জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে হবে। নিজেদের মধ্যকার গৌণ দ্বন্দ্বগুলো সঠিকভাবে সমাধান করে আরও গভীরভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যেখানেই জুম্ম যুবক-যুবতীরা রয়েছে সেখানে যুবসমিতি গঠন করতে হবে। যখনি জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে কোন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয় সেখানে যুবসমাজকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তবেই জুম্ম যুবসমাজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

ঐক্যের ফেরিওয়ালাদের কাছে কিছু বিনীত নিবেদন

দীপায়ন খীসা

বেশ কিছু দিন ধরে পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতিতে জাতীয় ঐক্যের আওয়াজ জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। এই জাতীয় ঐক্য মানে পাহাড়ের দুই বৈরী রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতি ও ইউনাইনেটড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর মধ্যে একটি ঐক্যের মেলবন্ধন তৈরী করা। আপাতদৃষ্টিতে এবং সাদা চোখে বিষয়টি খুবই ভাল উদ্যোগ। তা নিয়ে দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণ করাটা বরং প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। কারণ দুই বৈরী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যদি ঐক্যের মেলবন্ধন তৈরী হয়, তাহলে জুম্ম জনগণের পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটবে। এই বাস্তবতা থেকে অনেকেই ঐক্যের হাঁক-ডাক দিচ্ছেন। তবে এই ঐক্যের শোরগোলটা বেশী বেশী করে শোনা যাচ্ছে সম্প্রতি ইউপিডিএফ-এর অন্যতম সংগঠক ও কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমা রাঙ্গামাটি জেলার সুবলং এলাকায় একটি অতর্কিত আক্রমণে নিহত হওয়ার পর থেকে। অনিমেষ চাকমার সাথে দলটির আরও ৪ জন নেতা কর্মী প্রাণ হারান। তারপর থেকে এই জাতীয় ঐক্যের পালে হাওয়া বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে।

হাল নাগাদ ফেইস বুক খুললে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে নানান সব গ্রুপ চোখে পড়ে। পাহাড়ের রাজনীতি নিয়ে এই গ্রুপগুলোতে নামে-বেনামে-ভূয়া নামে অনেকেই লিখছেন, পান্ডিত্য জাহির করে চলেছেন। তবে কোনো না কোনোভাবে এই সব ফেইসবুক গ্রুপগুলোতে ইউপিডিএফ-এর বেনামী সমর্থকদের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রুপগুলিতে অনেক সময় যৌক্তিক বিতর্কের চেয়ে ব্যক্তিগত কুৎসা ও কাঁদা ছোঁড়া-ছুঁড়িটাই বেশী হয়। অবশ্য সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাটা চলতি রচনার লক্ষ্য নয়। এই সব গ্রুপগুলোতে জেএসএস ও ইউপিডিএফ-এর দ্বন্দ্ব সংঘাত অবসান নিয়েও নানান কিসিমের মতামত দেয়া হয়। ফেইস বুকের ইউপিডিএফ সমর্থকরা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে তারা ঐক্যের দরজা খুলে বসে আসে, কিন্তু জেএসএস ঐক্য করতে আগ্রহী নয়। কাজেই পাহাড়ের যে দ্বন্দ্ব সংঘাত জিইয়ে আছে তার জন্য জনসংহতি সমিতিই দায়ী। তাদের প্রচারণার ধরন দেখে মনে হয় দলটি একদম ধোয়া-তুলসী পাতা। গান্ধী কিংবা গৌতম বুদ্ধের মত তারা অহিংসার নতুন অবতার হিসেবে পার্বত্য রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের এই স্ব-ঘোষিত অহিংস পন্থার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পাহাড়ে হালানাগাদ কিছু শান্তিবাদীর পয়দা হয়েছে। এই নব্য শান্তিবাদীরা নিজেদেরকে সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী পরিচয় দিতে অনেক ভালবাসেন। তাদের সবার মুখে একটাই রব, সেটা হচ্ছে পাহাড়ের রাজনীতিতে সংঘাত বন্ধ করে সহ-অবস্থানের পরিবেশ তৈরী করা। তারা আবার এই দাবিটি উত্থাপন করেন জনসংহতি সমিতির নিকট। তারা এটাও বলে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা উদ্যোগ নিলেই পাহাড়ের রাজনৈতিক সংঘর্ষের অবসান ঘটবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এই ঐক্যের প্রবক্তারা এবং ইউপিডিএফ দলটির মধ্যে একটি মিল রয়েছে। সেটি হচ্ছে দুই মহলই বিশ্বাস করে জনসংহতি সমিতি এবং দলটির নেতা সন্তু লারমার উদ্যোগহীনতার কারণে পাহাড়ে সংঘাত-সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। এই ঐক্যের ধ্বজাধারীদের কাছে কিছু বিষয় অবতারণা এবং তাদের দৃষ্টিগোচরের জন্য এই রচনা।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি সম্প্রতি ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা সহ ৪ জন নেতা কর্মী নিহত হওয়ার পর দলটি জনসংহতি সমিতির সাথে ঐক্যের বিষয়ে নানা প্রচারণা শুরু করেছে। কিন্তু যাদের সাথে তারা ঐক্য চায় তাদের কাছে অর্থাৎ জনসংহতি সমিতির কাছে তারা কোনরূপ আনুষ্ঠানিক ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। যতদূর জানি ইউপিডিএফ-এর কাছ থেকে জনসংহতি সমিতি এই রকম কোনো প্রস্তাব পায়নি। তারপরও ইউপিডিএফ প্রচারণা চালাচ্ছে জনসংহতি সমিতি এবং দলটির নেতা সন্তু লারমার কারণে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেনা। আর অনিমেষ চাকমা নিহত হওয়ার পর কথিত শান্তিবাদীরা বলতে শুরু করেছে এইভাবে সংঘাত-সংঘর্ষ চলতে থাকলে, রক্তক্ষয় হতে থাকলে জুম্ম জনগণের জন্য সমূহ বিপদ। এই রক্তক্ষয় থামাতে হবে ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু যখন ভোর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় বাসা ঘেরাও করে ২-৩ বছরের শিশু সন্তান ও স্ত্রীর সামনে নিরস্ত্র অভিলাষকে গুলি করে হত্যা করা হয়, তখন এই শান্তিবাদীরা নিশ্চুপ থাকেন। যখন রাজস্থলী বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে একের পর এক পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নিরস্ত্র কর্মীদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন এই শান্তিবাদীরা আরও বেশী শান্তিতে দিনাতিপাত করছিলেন। তখন এই অহিংসবাদীদেরকে ইউপিডিএফ কিংবা দলটির প্রধান প্রসীত বিকাশ খীসার কাছে সংঘর্ষ এবং রক্তপাত বন্ধের জন্য কোনরূপ আবেদন নিবেদন করতে শোনা যায়নি। ধারনা করা যায় সেই সময়ে জাতীয় ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়না বরং সুদৃঢ় হয়। কাজেই যারা অনিমেষ চাকমা মারা যাওয়ার পর গেল গেল বলে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করছে, তাদের কাছে বিনীত প্রশ্ন থাকে অভিলাষ চাকমার মৃত্যুর পর আপনাদের জাতীয় চেতনা কেন কুম্ভকর্ণের মত অচেতন থাকে?? আবার যখন ইউপিডিএফ আক্রান্ত হয় তখন মাঝে মাঝে আপনাদের ঘুম ভাঙতে দেখা যায়।

আসলে যখন ইউপিডিএফ আক্রান্ত হয়, তখন তাদেরকে বাঁচানোর জন্য একশ্রেণীর অহিংসবাদী কথিত বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় ঐক্যের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসেন। তারা জনসংহতি সমিতিকে এই ফ্রন্টে ব্যতিব্যস্ত রেখে ইউপিডিএফকে পুনরায় সংগঠিত হতে সাহায্য করেন। লক্ষ্যণীয় যদি জাতীয় ঐক্যই এই অহিংসবাদীদের কাঙ্ক্ষিত হয় তাহলে তারা কেন ইউপিডিএফ এবং দলটির প্রধান প্রসিত খীসার কাছে সংঘাত-সংঘর্ষ অবসানের দাবী করেনা। তারা আবার নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলেও জাহির করে থাকেন। এই কথিত অহিংসবাদীরা নিজেরাই স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রচার চালায় ইউপিডিএফ-তো ঐক্য চায়, দলটি এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলছে সুতরাং ঐক্যের বাঁধা অপসারিত হয়েছে। কথিত অহিংসবাদীরা এই রকম নানান সব গল্প বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছে। এরা জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করছে প্রসিত খীসা আর ইউপিডিএফ কত সাধু, যত দোষ হচ্ছে জনসংহতি সমিতি আর সন্তু লারমার। আমরা একই রকম প্রচারণা সরকারের কাছ থেকেও পরিলক্ষিত করি। সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীবর্গও প্রায় বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে তারা খুবই আন্তরিক, কিন্তু সন্তু লারমা আর জনসংহতি সমিতি সহযোগিতা করছেনা সেই কারণে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এগুনো যাচ্ছেনা। যেন মনে হবে সরকার নয় চুক্তি বাস্তবায়নে জনসংহতি সমিতিই প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে রেখেছে।

'হিপোক্রেসি'-বলে একটা কথা বাজারে প্রচলিত আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই 'হিপোক্রেট' হতে পারেন। ব্যক্তিগত 'হিপোক্রেসি'ও ক্ষতিকর। তবে তা সমাজ জীবনে তেমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনা। কিন্তু রাজনৈতিক হিপোক্রেসি খুবই বিপদজনক। তা সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলে, জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলে। ইউপিডিএফ দলটি রাজনৈতিক হিপোক্রেসির এক অনন্য নিদর্শন। দলটি চুক্তি বাস্তবায়নে বিশ্বাস করেনা, কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের দাবী জানায়। সন্তু লারমাকে জাতীয় বেঈমান মনে করে, তাঁকে হত্যা করতে গাড়ি বহরে গুলি চালায়। আবার অন্যদিকে বলে, তারা সন্তু লারমার সাথে আলোচনায় বসতে চায়। জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস বা নির্মূল করতে না পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে ইউপিডিএফ বিশ্বাস করে।

আবার তারাই প্রচার করে পাহাড়ের সংঘাত সংঘর্ষ অবসানে ইউপিডিএফ খুবই আন্তরিক। তাদের তাত্ত্বিক গুরু বদরউদ্দিন উমরের সাথে সুর মিলিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ইউপিডিএফ দলটি দেশের বামপন্থীদের প্রায়ই গালমন্দ করে থাকে কিন্তু জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন এলেই দলটি নির্বচানে অংশগ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। শুধু তা নয় দলটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহে ইউপিডিএফ ছাড়া অন্যদের অংশ নেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারা নিজেদেরকে মার্কসবাদী হিসেবে পরিচয় দেয়, আবার ধর্মীয়গুরুর চরণে সমর্পণ করার প্রতিযোগিতায়ও তারাই এগিয়ে থাকে। দলীয় বুলেটিনে তারা এমনভাবে সেনা সদস্যদের বকাবকি করে যেন মনে হবে দলটি পাহাড়ের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে। অথচ দলটির প্রধান প্রসিত খীসার সাথে সেনাকর্তাদের বৈঠকের অন্তরঙ্গ ছবির বিষয়টিও মানুষের কাছে গোপন থাকেনা। এই রকম এক হিপোক্রেট দলের সাথে সুর মিলিয়ে যারা অহিংসবাদ প্রচার করেন, নিরপেক্ষতার ভাব ধরেন তারাও হিপোক্রেট হবেন তাতে সন্দেহ থাকতে পারেনা।

এই অহিংসবাদীদের প্রচারণা প্রোপাগাণ্ডার জবাবে বলতে হয় যদি সত্যিই পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতিতে ঐক্য চান তা হলে হিপোক্রেসী পরিত্যাগ করুন। জনসংহতি সমিতি দীর্ঘ ২ যুগের অধিক সময় ধরে পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে। অভিশপ্ত কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করেছে, জুম্ম জনগণের মধ্যে স্বাধীকারের চেতনা ও জাতীয়তার উন্মেষ ঘটিয়েছে। ১৯৯৭ সালে রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের সংগ্রামকে একটি উচ্চতায় আসীন করেছে। চুক্তি পরবর্তী সময়ে চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনসহ জুম্ম জনগণের সকল প্রকার প্রতিরোধ সংগ্রামে জনসংহতি সমিতি নিষ্ঠার সাথে লড়াই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। কাজেই জনসংহতি সমিতি পাহাড়ের রাজনীতিতে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে থাকবে তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা।

অনৈক্যের বীজ জনসংহতি সমিতি বপন করেনি। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়াতে জুম্ম জনগণের বিভিন্ন পেশাজীবি, ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী ও আদিবাসী বাঙালিসহ সর্বস্তরের জনগণের সাথে জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতৃত্ব দফায় দফায় মতবিনিময় করেন। জনগণকে সাথে নিয়ে জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রেখে চুক্তি স্বাক্ষরের পথে জনসংহতি সমিতি অগ্রসর হয়। যে সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেএসএস প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিল, বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তির প্রাক্কালে সেই সামন্তীয় সামাজিক নেতৃত্বকেও দলটি আস্থায় নিতে সক্ষম হয়। জনসংহতি সমিতি যখন বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গঠনের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিচ্ছিল, সেই সময় প্রসিত খীসা চুক্তি স্বাক্ষরকে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ ও জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানি আখ্যা দিয়ে অনৈক্যের বীজ বপন করে। শুধু তাই নয় তখন প্রসিত খীসারা জনসমাগমের স্থান সমূহে প্রতীকী শ্মশান ও চিতা তৈরী করে সন্তু লারমা এবং জেএসএসকে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত ঘোষণা করে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণের সময় কালো পতাকা প্রদর্শন এবং ট্রানজিট

ক্যাম্পে আসার সময় ঢিল ছোঁড়া, পিনন প্রদর্শন ইত্যাদি বৈরী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। চাকমাদের প্রচলিত সামাজিক নিয়মে ছেলেদেরকে মেয়েদের পরিধেয় পোশাক পিনন প্রদর্শন করা হলে সর্বোচ্চ অবমাননা হিসেবে দেখা হয়। এইভাবে প্রসিত খীসা জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পাহড়ের রাজনীতিতে সহ-অবস্থানের সকল পরিবেশ নিজেই ধবংস করে সম্পূর্ণ বৈরী ও শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশ তৈরী করার ভিত রচনা করে। অবশ্য তারা এইগুলোকে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ হিসেবে প্রচার করে থাকে। প্রতিবাদ করা, ভিন্নমত প্রকাশ করা আর আক্রোশ নিয়ে ঘৃণার উদ্রেক করা এই পার্থক্যটুকু যারা অনুধাবন করতে পারেননা তাদের দ্বারা আর যাই হোক জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ডাক শোভা পায়না। অনবরত অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ চলতে থাকবে, আর প্রচার করা হবে 'না না আমরাতো বন্ধুই হতে চায়...' এটাও এক ধরনের ছেলে খেলা। যারা এখনও সাবালক হয়ে উঠেনি, তাদের মুখে জাতীয় ঐক্যের বিষয়টাও আসলে শিশু বয়সের আবদার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইউপিডিএফ-এই শিশুতোষ আবদারে অনেকের মন ভিজেও যায়। তাদের মনে উদয় হয়, এখনি জাতীয় ঐক্য তৈরী হবে : সন্তু লারমাকে ঐক্যের বিষয়ে রাজী করাতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আসলে বিষয়টি সন্তু লারমার রাজী হওয়ার বা না হওয়ার বিষয় নয়। বিষয়টি হচ্ছে দায়িত্বশীলতা এবং সাবালক হয়ে পরিপূর্ণ মানুষের মত আচরণ করা। অনেকেই বলেন ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। অবশ্য দলটি এরও আগে অনেকবার এই ধরণের ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কোনো সময় কোনো কালে দলটি চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে শরীক ছিলনা। মহাজোট নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের মতাগ্রহণের প্রারম্ভে ইউপিডিএফ কর্তৃক চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতার ঘোষণা দেয়াটা একটা বড় রকমের রাজনৈতিক শঠতা বা কূটচাল ছাড়া কিছু নয়। তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে চারদলীয় জোট সরকারের সময় আবদুল ওয়াদুদ ভুইঞা আর সম-অধিকারের সাথে ইউপিডিএফ-এর যে মাখামাখি ছিল, সেটা থেকে সরকারের দৃষ্টি অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া।

১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বারের মাধ্যমে জুম্ম জনগণ যে অধিকার অর্জন করেছিল, সে অর্জনকে প্রত্যাখান এবং বাতিলের দাবী জানিয়ে ইউপিডিএফ পাহাড়ের জনজীবনে যে বিভেদ ও হিংসার পরিবেশ তৈরী করেছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে অবশ্যই দলটিকে আনুষ্ঠানিক ভুল স্বীকার করতে হবে। চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় ঐক্যর মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে শাসকগোষ্ঠীকে চুক্তি বাস্তবায়ন না করার কাজে দলটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। তাই ষড়যন্ত্র পরিহার করে ঐক্যের পথে আসতে চাইলে জুম্ম জনগণের কাছে মা প্রার্থনা করে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে ইউপিডিএফ'কেই। যদি দলটি তা করে তাহলে তাদেরকে কিছু রাজনৈতিক পরিভাষাও আয়ত্ব করতে হবে। শুধু শিশুদের মত আধাবোলে জাতীয় বেঈমান, খুনী, সরকারের দালাল, চুক্তি বাতিল ইত্যাদি শব্দগুলো আওড়িয়ে গেলেই দলটি চিরকাল নাবালকই থেকে যাবে। কে আগে কাকে মেরেছে এটা নিয়ে আলোচনা করা বা বায়না ধরা শিশুতোষ মনেরই পরিচয়। কারণ মারামারি, হানাহানি এইগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। যেমন জেএসএস নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে পূর্ণস্বায়ত্বশাসন অর্জিত হবেনা এই ভ্রান্ত ও বিনাশী কর্মসূচী দিয়ে কি আর সংঘাত সংঘর্ষ বন্ধ করা যায়?? অহিংসপন্থী কথিত নিরপেবাদীরা বিষয়টি ভাববেন কি??

আমরা চূড়ান্তভাবে বলতে পারি চুক্তিকে সূচক ধরে জুম্ম জনগণ অনেক আগে থেকেই ঐক্যবদ্ধ। চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন এগিয়ে নিতে জুম্ম জনগণের মধ্যে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। ইউপিডিএফ যদি অতীতের ভুল স্বীকার করে এই আন্দোলনে শরীক হতে চায় তা হলে তাদেরকে আন্দোলন থেকে বাদ দেয়া হবে এমনটা নিশ্চয় কেউ করবেনা। তাই নতুন শান্তিবাদীরা যারা অনিমেষ চাকমার মৃত্যুর পর থেকে জাতীয় ঐক্য - জাতীয় ঐক্য বলে বাজারে হাঁক-ডাক ছাড়ছেন, তাদেরকে বলছি আপনাদের প্রিয় ভাইদের যেন আর রক্ত না ঝরে, যেন আপনারা শান্তিতে ঘুমাতে পারেন তার জন্য ইউপিডিএফ-কে বালখিল্যতা পরিহার করে সঠিক কপথে নিয়ে আসুন। জনসংহতি সমিতি বহু আগে থেকেই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি তৈরী করে রেখেছে। কাজেই আপনাদের কথিত যে প্রচারণা তা সম্পূর্ণ অসার এবং রাজনৈতিক বিদ্বেষপ্রসূত। জনসংহতি সমিতি এবং দলটির নেতা সন্তু লারমা দায়িত্বশীলতার সাথে জুম্ম জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এখন আপনাদেরই দায়িত্ব হিপোক্রেট থাকবেন, নাকি চিরকাল নাবালক থাকবেন, নাকি জুম্ম জনগণের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ তৈরী করে, নিজেরাই আবার ঐক্য ঐক্য বলে গলা ফাটাবেন, সে সিদ্ধান্ত আপনারাই দিবেন। বল আপনাদের কোর্টেই রয়েছে।

কারাগারে ১২৮৪ দিন

সত্যবীর দেওয়ান

সে দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ভোর ৫ টা। হঠাৎ আমার বড় ছেলে পোলো বিছানা থেকে উঠে এসে আমাকে ডেকে বললো, বাবা, আমাদের বাড়ীতে সম্ভবতঃ আর্মী এসেছে এবং বাড়ী ঘেরাও করেছে। সেই সময়ে ধুপ-ধাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাৎক্ষণিক আমি বললাম, "তোমরা ভয় করো না। তারা আমাকে নিতেই এসেছে। সুতরাং তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। যা হবার আইনগতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। তবে তোমরা বিষয়টি পার্টি নেতার নিকট জানাইও।"

ওদিকে দরজায় ধাক্কা দিয়ে একজন বলে উঠে, বাড়ির মালিক আছেন, "দরজা খুলুন, আমরা যৌথবাহিনীর লোক।" আমি উত্তরে বলি, "দাঁড়ান দরজা খুলছি।" দরজা আমি নিজেই খুলে দিলাম, আগত যৌথবাহিনীর এক কমান্ডার বললেন, "আমরা আপনার বাড়ী তল্লাশী চালাতে এসেছি।" আমি নির্ভয়ে বলি, "তল্লাশি চালাতে পারেন।" তৎপর আমার করে দরজা খুলে দিলাম। আগত কমান্ডারসহ কয়েকজন সেনা ঢুকলেন। অপর কয়েকজন আমার ছেলের রুমে ঢুকে, সমস্ত লাইট জ্বালালো। আমার করে বিভিন্ন দিকে তল্লাশি চালাচ্ছে নামেমাত্র। এমনি সময়ে বড় ছেলে বলে উঠে, "বাবা, আমার বালিশের নীচে অস্ত্র ঢুকিয়ে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের একজন বলে উঠলো, "ওস্তাদ, ওস্তাদ অস্ত্র পাওয়া গেছে।"

আগত কমান্ডারকে আমি বললাম, "দেখেন ভাই, এটা অন্যায়, এটা ষড়যন্ত্র, এটা আমার উপর অন্যায় করা হচ্ছে।" তাতে কমান্ডার বলেন, "দাদা আপনি তৈরী হয়ে নিন, আমাদের সঙ্গে ক্যাম্পে যেতে হবে। সেখানে গেলে আমি বিষয়টি তুলে ধরবো।" কমান্ডার হচ্ছেন ওয়ারেন্ট অফিসার আলমগীর; তিনি তখন বলেন, সেখানে গেলে তা আমি বিবেচনা করবো। আমি পেন্ট-শার্ট পরে তৈরী হয়ে বললাম, "চলুন" বলে বের হয়ে পরি।

বাসা হতে বের হয়ে দেখি, প্রায় ২০-২৫ জন সেনা ও পুলিশ শশী দেওয়ান পাড়া রাস্তা হতে হাঁটতে হাঁটতে দেওয়ান পাড়ার চৌমূহনীতে এসে দেখি ৩টি আর্মী জীপ ও ১টি পিকআপ অপেক্ষমান। আমাকে পিকআপে উঠানো হলো। সঙ্গে চেপে বসলো ৫-৬ জন সেনা। গাড়ী চললো বনরূপা চৌমূহনী হয়ে ডিসি অফিসের দিকে এবং শেষ পর্যন্ত আর্মী জোন হেডকোয়াটারের গেইটে গাড়ী থামলো। ড্রাইভার হর্ন বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে গেইট খুলে গেল। গাড়ীগুলো ঢুকলো পর পর। আমাকে নামানো হলো, একটি গোল ঘরে বসানো হলো। ছোট্ট ঘর অর্থাৎ এটি ওয়েটিং রুম বলা যেতে পারে । যে ৪/৫ জন পুলিশ ছিল তারা কিছুক্ষণ পর থানায় চলে যায়। আনুমানিক সাতটায় একজন ডাক্তারসহ দুই সেনা সদস্য আসে।

ডাক্তার আমার সামনের চেয়ারে বসে বললেন, কেমন আছেন ? কোন শারিরীক অসুস্থতা আছে কি? জবাবে বললাম বাতবেদনা এরূপ আছে। তিনি ব্লাড প্রেসার মেপে নিলেন এবং স্ট্যাটোস্কোপের মাধ্যমে বক্ষ পরীক্ষা করলেন। এরপর যৎসামান্য কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে তিনি চলে গেলেন। ডাক্তার চলে যাবার পর ২ জন সেনা এসে আমার হাতে হাতকড়া লাগানোর পর চলে গেল . অতঃপর চা-নাস্তা পানি আসলো। তখন আটটার মত হবে, ক্ষিদেও লেগেছে প্রচন্ড তাই চা-নাস্তা খেয়ে নিলম। তারপর সারাক্ষণ বসে থাকা অবস্থায় ৯টা বাজলো। প্রকৃতির ডাক আসলে উপস্থিত সেনা সদস্যকে বললাম ভাই আমার টয়লেটে যেতে হবে। এরপর সে তাৎক্ষণিক আমাকে দক্ষিণের দিকে একটা ঘরে নিয়ে গেলো, সেখানে একটা টয়লেটে ঢুকে কাজ সেরে নিলাম। তারপর পুনরায় ঐ ছোট্ট ঘরে এসে বসলাম।

অনেকক্ষণ পর একজন অফিসার ২/৩ জন সিপাই নিয়ে আসলো। তিনি এসে সামনের চেয়ারে বসলেন এবং বললেন চা-নাস্তা খেয়েছেন? আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। আমাকে পড়ানো হাতকড়া নিয়ে অভিনয় সূচক কিছু কিছু কথা বলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে অন্যান্য কুশলাদি নিয়ে আলাপ করে চলে গেলেন। তারপর তিনজন সেনা আসলো সঙ্গে ক্যামেরা একটা একজনের হাতে, অপরজনের হাত ১টি কাপড় ১টা পাইপগান, ১টি কার্তুজের খোল। কাপড়টি আমার সামনের টিপয়-এর উপর বিছানো হলো আর টিপয়-এর উপর ১টি পাইপ গান, ১টি কার্তুজের খোল আমার সামনের টিপয়ের উপর রাখা হলো। আর ক্যামেরাম্যান আমাকে ঐ টিপয়ে রাখা পাইপগান কার্তুজের খোল নিয়ে পর পর ৩/৪টি ছবি তুলে নিলো।

ঐ পাইপগান ও কার্তুজের খোলগুলো আমাকে ক্যাম্পে আনার পূর্বে যৌথবাহিনীর কারো হাতে দেখিনি সে কারণে ছবি তোলার সময় আমি প্রতিবাদ করি এবং বলি, "এটা আমার উপর অন্যায় অবিচার করা হচ্ছে।" এতে অফিসার বললো, না, এগুলো আপনার বাড়ীতে পাওয়া গেছে তাই ছবি তোলা হলো। আপনি অস্বীকার করবেন না, তাতে আপনার ক্ষতি হবে। এরপর তারা চলে গেলো। তারপর সেখানে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর প্রায় আনুমানিক সাড়ে ১০টার সময় থানায় আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৩টি গাড়ি প্রস্তুত করা হলো, আমাকে মাঝখানের গাড়ীতে উঠানো হলো। সামনে পিছনে আর্মী স্কট নিয়ে আমাকে থানায়

সোপর্দ করা হলো, লিখিতভাবে। ওয়ারেন্ট অফিসার আলমগীরসহ কতিপয় সেনা সদস্য ও পুলিশ সদস্যের স্বাক্ষর নিয়ে ঐ পাইপগান ও কার্তুজের খোল থানার হেফাজতে জমা দেয়া হলো। আমার বিরুদ্ধে এজাহার দেয়া হয়; তারপর আমার কাছ থেকে ঘড়ি, টাকা-পয়সা তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ যা কিছু সব জমা নেয়া হলো এবং থানা হাজতে ঢুকানো হলো।

তারপর সেখানে কিছুক্ষণ রাখার পর পুনরায় পুলিশের গাড়ীতে আমাকে উঠানো হলো। সামনে পিছে আর্মী স্কট আমাকে চেপে বসলো ৮/১০ জন পুলিশ। চললো গাড়ী সোজা রাঙ্গামাটি আদালত ভবনে, সেখানে নামিয়ে আমাকে একটি কোর্ট হাজতের রুমে একা রাখা হলো বাকি আসামিরা অপর কোর্ট হাজতে। বেলা ১টার সময় কোর্টে উঠানো হলো। সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বসার সাথেই সরকার পক্ষের জি.আর.ও আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তুলে ধরেন এবং ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। এর প্রেক্ষিতে আমার পক্ষের উকিলগণ, বলতে গেলে রাঙ্গামাটি বার এসোসিয়েশনে প্রায় সকল উকিল একযোগে অভিযোগের ভিত্তিহীনতার কথা তুলে ধরেন এবং মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিধায় রিমান্ড মঞ্জুর না করে জামিনের আবেদন করেন। এ ব্যাপারে বহু তর্ক-বিতর্কের পর আদালত সবশেষে ৩ (তিন) দিনের নির্যাতনহীন রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তারপর আমাকে কোর্ট হাজতে ফেরত আনা হয়।

কারোর সাথে আমার সাক্ষাৎ করতে দেয়া হলো না। কোর্ট হাজতে দীর্ঘক্ষণ থাকার পর প্রায় সন্ধ্যার সময় আমাকে একইভাবে আর্মী স্কট দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করা হলো। জেলের অফিসে লিখিতভাবে গ্রহণ করার পর আমাকে জেলে ঢুকানো হলো। সেখানে ঢুকানোর সাথে সাথে পুনরায় চেক করে জেলেরই আমদানী ওয়ার্ডে আমাকে নেয়া হলো। সেখানে ঢুকামাত্র দেখলাম ওয়ার্ডে বাম পার্শ্বে জেলা বিএনপি সম্পাদক মোহাম্মদ জহির-কে। সঙ্গে অজানা অচেনা অনেক বন্দীকে। তখনও কিছুটা শীত ছিল। যা হোক সেখানে আমার জন্য ৩টি কম্বল বরাদ্দ করা হয়েছে। সেসব এক পার্শ্বে রেখে জহির সাহেবের বিছানার পার্শ্বে গিয়ে করমর্দন করে সেখানে বসলাম। আমার শোয়ার স্থান ঠিক হলো জহির সাহেবের উত্তর পার্শ্বের ৪টি বিছানার পর অর্থাৎ রুমের মধ্যভাগে আমার জন্য বরাদ্দকৃত কম্বল আমার নির্ধারিত স্থানে রাখা হলো। এরই মধ্যে জহিরের সাথে কুশলাদি বিনিময় করে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলাপ হয়, তার বিরুদ্ধে অবৈধ বিদেশী মুদ্রা রাখার দায়ে মামলা লাগানো হয়েছে।

এসব বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে রাত হয়ে গেছে। তাই খাবার পালা এলো, সকলে যার যার ভাত খাওয়া শুরু করলো। আমার জন্যও ভাত রেখেছে। সেসব ভাত ক্ষুধা নিবারণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে দেখলাম। হাতমুখ ধোয়ার পর ভাতের থালা টান দিয়ে বসে পড়লাম। হাত দিতেই হাত বরফের মত ঠান্ডা হয়ে এলো। ডাল মিশানো ভাত। তবুও দু'গ্রাস খেয়ে দেখলাম। না সম্ভব হলো না। পরে একজন হতে লবন চেয়ে নিয়ে কোনমতে ২/৩ গ্রাস চালিয়ে দিয়ে বাকী ভাত ফেলে দিলাম। থালা বাসন ধুয়ে একস্থানে রাখলাম। মুখ হাত ধুয়ে আমার নির্ধারিত বিছানাতে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সকাল রুটি ডাল গরম গরম দেয়া হলো। সেগুলো যখন তখন খেয়ে ফেলি। পরে সকাল ৯টায় আমাকে ঐ আমদানী ওয়ার্ড হতে স্থানান্তর করা হলো নির্জন সেলে। ইতোপূর্বে বন্দী জীবনে থাকা এমন অনেক ব্যক্তি হতে সেলের কথা শুনেছিলাম, তখন সেল সর্ম্পকে মনে মনে কাল্পনিক একটা ধারণা ছিল। এখন বাস্তবে সেলে অবস্থান করে দেখি কল্পনায় যেরূপ মনে হয়েছে ঠিক সেরূপ নয়। বাস্তবে এটা একটা ছোট্ট ঘর। যার মধ্যে বাথরুম একটা, বাকী অংশ পাকা ফ্লোর, বলতে গেলে ছোট্ট একটা রুম। সামনের পুরোটাই লোহার দরজা ২৪ ঘন্টা তালাবদ্ধ থাকে। সকালের নাস্তা একটা রুটির সঙ্গে ডাল অথবা গুড়, দুপুরে ভাত, সবজি, ডাল; বিকালে ৪টার মধ্যে রাতের ভাত দেওয়া হয়। তখন ভাতের সাথে ডাল, সবজি, মাছ ভাজা এক পিচ্ অথবা মাংস (তা ছাগল অথবা গরু)। সপ্তাহে ৪ দিন মাছ/মাংস থাকবে। অন্য দিনগুলো ডাল প্রত্যেক দিন থাকবে।

ঐ সেলে ২টি বালতি থাকে একটি বড় অন্যটি মাঝারী। বড়টি অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য, ছোটটি খাওয়ার পানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাথরুমে একটা বদনা (প্লাস্টিকের) আর নিজের জন্য ৩টি কম্বল, একটি বালিশের জন্য আর ১টি বিছানোর জন্য, অপরটি শীত নিবারণের জন্য। নিজের খানাপিনার জন্য একটি থালা, একটি বাটি প্রত্যেক বন্দীর জন্য সরকারী বরাদ্দ। তাই বন্দীরা বলে থালা বাটি কম্বল জেল খানার সম্বল। এভাবে দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে, চলতে লাগলো কারা জীবন, দিবারাত্রি কারারক্ষীদের পালাক্রম ডিউটি। তাদের কাজ হলো বন্দীদের শুধু দেখা নয়, বন্দীদের ভালমন্দ দেখা, অসুস্থ হলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা; মেডিকেল কর্তৃপক্ষ-এর কাছে নিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকদিন সাপ্লাই পানি আসলেও অনেক সময় প্রত্যেকদিন গোসল সম্ভব হয়না। অনেক সময় ২/৩ দিন অন্তর গোসল করতে হয়। তবে তা রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে। কিন্তু চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রত্যেকদিন গোসল চলে। এভাবে চলতে চলতে ৪ দিন পর আমাকে রিমান্ডে নেওয়ার জন্য তৈরী হতে বললো কারারক্ষীরা। আমি পেন্ট শার্ট পরে তৈরী হয়ে গেলাম। সেল থেকে বের হয়ে বেড়ী পরার স্থানে আসলাম, দুইজন কয়েদী দাভাবেড়ী পায়ে পরালো। এরপর জেল গেইট অফিসে নেয়া হলো। সেখান হতে ছাড়পত্র

নেয়ার পর থানা পুলিশ আমাকে রিসিভ করলো। তারপর পুলিশের গাড়ীতে উঠানো হলো। আগে পিছে আর্মী স্কট। চললো গাড়ী রাঙ্গামাটি কতোয়ালী থানায়; সেখানে সোজা হাজতখানায় ঢুকিয়ে লকআপ করা হলো। রাত হলে দোতালায় নিয়ে যাওয়া হয় তারপর পর্যায়ক্রমে ১৬৮ ঘন্টা রিমান্ড।

অবশ্য এরই মধ্যে বাড়ী হতে আমার জন্য বেডশীট, চাদর এবং অদল বদল কাপড় চোপড় দিয়ে গেছে তাতেই স্বস্তি। কারণ ঐ কম্বল অতীব নিম্নমানের, কেবলমাত্র তোষক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, তবে সুতির কাপড়ের ওয়ার অথবা বেডশীট এর উপরে বিছাতে হবে নইলে খালি ঐ কম্বলের উপর বসলেও এলার্জি হয়। চুলকানি জনিত চর্মরোগ দেখা দেয়।

প্রথম পর্যায়ে তিন দিন, তৎপর দুই দিন, সবশেষে দুই দিন এভাবে বিরামহীন রিমান্ড ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়। রিমান্ডে সেনা কর্তৃত্বই প্রধান। পুলিশ তারাতো সাক্ষী গোপাল মাত্র। রিমান্ড যদিও বিনা নির্যাতনে অনুমোদিত ঠিকই, প্রত্যক্ষভাবে কেহ নিজ হাতে নির্যাতন না করলেও তাদের কথানুযায়ী উঠা-বসা, চেয়ার ছাড়া, চেয়ারে বসার ভঙ্গীতে অবস্থান করা। ঐভাবে থাকতে থাকতে হাটু অবশ (উপর ভর করে থাকতে) হয়ে আসে। ৩ (তিন) বার ঐ অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছি। পানি ছিটকানোর পর জ্ঞান ফিরে আসে, তারপর সামান্য বিশ্রাম, বিশ্রাম তো নয় প্রসাবের বেগ নাকি পায়খানার বেগ তা বুঝা যায় না তবুও বাটরুমে গিয়ে প্রস্রাব করে আসা হয়। তারপর পালাক্রমে যৌথবাহিনীর রিমান্ড। যৌথবাহিনী হলেও মুলত সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই-এর নেতৃত্বে সকল কার্যক্রম চলে। মেজর ইয়াসিন, মেজর সফিউল্লা, মেজর আনিশ এবং ক্যাপ্টেন মেহেদি এরাই প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য বেশ কয়েকজন ছিলেন যাদের নাম জানতে পারিনি। সেখানে পুলিশ কেবল দর্শকের ভূমিকায়।

রিমান্ড অফিসার পৌছেছেন মনে হলো। তারা আমার রিমান্ড রুমে প্রবেশ করার আগে আমার চোখ একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়া হলো। চোখ বাঁধা অবস্থায় ছোট্ট একটি বেঞ্চে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর ৪/৫ জন লোক রুমে ঢুকলো এদেরই একজন আমার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করলো, সত্যবীর বাবু কেমন আছেন, জবাবে আমি বলি যেমন রেখেছেন। ভাত খেয়েছেন? আমি উত্তরে বলি, না। সম্ভবত দায়িত্বে থাকা এএসআই-কে ডেকে ভাতের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন, গ্রুপের পর গ্রুপ জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসলো সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত, তারা পরিকল্পিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসেন পালাক্রমে, তাদের ঘুমের ব্যবস্থা থাকে। পক্ষান্তরে আমার ঘুম নেই, এভাবে প্রথম তিন দিনের রিমান্ড শেষ করে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো। আবার সঙ্গে সঙ্গে ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে রিমান্ডের স্থানে নেয়া হয়। ২ দিনের রিমান্ড শেষে পুনরায় কোর্টে উঠানো হয়। আমার সাথে উকিল বা পরিবারের কেউ সাক্ষাৎ করতে পারেনি বা সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়নি। কোর্ট পুনরায় ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং পালাক্রমে একই পদ্ধতিতে দিবারাত্রি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় একনাগারে ১৬৮ ঘন্টা নির্ঘুম রেখে। রিমান্ড কার্যক্রম সমাপ্ত করার পর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। এরপর রাঙ্গামাটি কোর্ট হতে থানার তদন্ত কর্মকর্তা (আইও)-এর চার্জশীট দাখিল করার পর মামলা চট্টগ্রাম বিভাগীয় দায়রা জজ আদালতে বিচার নিস্পত্তির জন্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে চালান দেয়া হয়। একই সঙ্গে অবশ্য মো. জহিরকেও চালান দেয়া হয়। চট্টগ্রাম কারাগারে প্রথম রাত আমদানী ওয়ার্ডে দেখা হলো ওয়ার্ডের রাইটার পাইচিং মারমার সাথে। তিনিও আগ্রহ সহকারে আমাকে ও জহির সাহেবকে তার পার্শ্বে জায়গা করে দিলেন। রাতে খানাপিনা শেষ হলে অনেক গল্প-গুজব করার পর ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন খুব ভোরে কেইস টেবিলে ডাকা হল। সেখানে যাবতীয় নাম ঠিকানাসহ সনাক্তকরণ চিহ্ন নেয়ার পর আমাকে বত্রিশ সেলে স্থানান্তর করা হলো।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের ৩২ সেলের ৩৬ নং ওয়ার্ডে। সেখানে আসার সাথে সাথে ছাত্রলীগ ক্যাডার মোহাম্মদ আকবর (প্রকাশ আকবর ভাই) এর সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের পর তিনি আগ্রহ সহকারে আমাকে তার পার্শ্বে জায়গা করে দিলেন। তিনি ১৭ বছর সাজা প্রাপ্ত (বন্দী) কয়েদী। তার বিরুদ্ধে ৩৫ টি মামলা। সকল মামলার তিনি জামিনপ্রাপ্ত। কেবল পিডব্লিউ মামলা নিয়ে কারাবাস করে আছেন। কেবলমাত্র র‍্যাব এর ক্রস ফায়ারের তালিকাভূক্ত বিধায় চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় কারাবাস করছেন। এরপর চললো চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় কারাগার জীবন। ওয়ার্ডে সকলের সাথে পরিচয় হলো। একসাথে খাওয়া দাওয়া করার ফলে পরস্পরে আন্তরিকতা গড়ে উঠলো।

বই পড়া হচ্ছে আমার অভ্যাস। ইতিহাস, দর্শন, ভ্রমণ কাহিনী এবং রাজনৈতিক উপন্যাস জাতীয় বই বেশী আমার পছন্দ। সে অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কারা পাঠাগার হতে ক্যাটালগ সংগ্রহ করে একটার পর একটা বই পড়া শুরু হলো। রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে সে সুযোগ ছিলনা। শুধু তাই নয়, রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে যতদিন ছিলাম তৎসময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং জরুরী অবস্থা বিধায় সেনাবাহিনী তথা যৌথবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র। কোর্ট হতে কারাগার পর্যন্ত সর্বত্র সেনাকর্তৃত্ব ছিল। চিড়া, মুড়ি, গুড় ব্যতিত অন্য কোন কিছুই জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যতদিন ছিল ততদিন পর্যন্ত

একটা বিড়ি কিংবা সিগারেট পর্যন্ত প্রবেশ করানো নিষিদ্ধ ছিল। সেটা ছিল তখনকার রাঙ্গামাটি ব্রিগেড কমান্ডার সাহেবের নির্দেশ। কারা প্রশাসনের কাছে ঐ নির্দেশের কারণে বন্দীদের মধ্যে যারা ধুমপায়ী তারা অত্যন্ত বেশী নির্যাতিত হতে দেখেছি। কোর্ট থেকে জেলে ঢুকার সময় জেল অফিসে বন্দীদের দেহ তল্লাশী একবার চলে কারারক্ষীর মাধ্যমে; জেলের ভিতরে ঢুকার পর জমাদারের উপস্থিতিতে কয়েদীদের মাধ্যমে আরেকবার দেহ তল্লাশী চলে। এতে একবার জনৈক বন্দীর পকেটে সিগারেট চুগা পাওয়া গেল। তাৎক্ষণিক তাকে কারারক্ষী নয়, সরাসরি জমাদার কর্তৃক নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করতে দেখেছি। এভাবে প্রায় প্রতিদিন কোর্ট হতে আগত নতুন বা পুরাতন বন্দীর ক্ষেত্রে বেশী নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছি।

জেলের অভ্যন্তরে কারারীদের ডাকা হয় মিঞা সাহেব, জমাদারকে বলা হয় ওস্তাদ। আর সাজাপ্রাপ্ত বন্দীকে বলা হয় কয়েদী, যারা সাজাপ্রাপ্ত নয় তদের বলা হয় হাজতি। সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী ও কারারীদের মিলে চলে জেল প্রশাসন। ওয়ার্ডের জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি হচ্ছে ওয়ার্ড মেট; সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের (কয়েদীদের) মধ্য হতে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রশাসনের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি ওয়ার্ড রাইটারদের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ঘোষণা করা হয়। কয়েদীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের মধ্য হতে এই রাইটারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তারা জেল প্রশাসনের যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করে প্রত্যেক ওয়ার্ডে জানিয়ে দেয়। রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার আর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার প্রশাসনের বেলায় তা অভিন্ন। দৈনিক সংবাদপত্র সরকার অনুমোদিত সরকারী প্রদত্ত রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে ৩০/৪০ মিনিটের মত পাঠ করার সুযোগ পাওয়া যায়। তবে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে নিজস্ব খরচে মাসিক সংবাদপত্র পাঠ করার সুযোগ পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯/০৮/২০০৭ আমি সহ মো. জহিরকে একসাথে প্রেরণ করা হয়। সেদিন বিকাল আমদানী ওয়ার্ডে (ওয়ার্ডের) কোর্ট রাইটার কয়েদী পাইচিং মারমার সাথে সাক্ষাৎ, তার গ্রেফতারের পূর্বেও আমার পরিচয় ছিল বিধায় তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে আমাদের গ্রহণ করলেন। বিএনপি জেলা সম্পাদক মো. জহিরের সাথেও বিএনপি দলীয় সাবেক কর্মী হিসেবে পাইচিং মার্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অনেক গল্প করার পর রাতের ভাত খেয়ে আমরা মো. জহিরসহ পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু পাইচিং লেখার কাজে ব্যস্ত ছিল। তাকে প্রায় গভীর রাত পর্যন্ত বন্দীদেব কোর্টে প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখার কাজ করতে হয়। ঐ কাজে অত্যন্ত দক্ষ হিসাবে তার পরিচিতি রয়েছে বলে জেল প্রশাসন তার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক দিন নতুন বন্দীদের কেইশ টেবিলে উপস্থিত থাকতে হয়। ঐ কেইস টেবিল যথারীতি জহিরসহ সকালে উপস্থিত হলাম। সেখানে সকল নতুন বন্দীদের নাম ডেকে তালিকা অনুযায়ী চারজন করে চার সারিতে দাঁড়ানো হলো। প্রথম পর্যায়ে সুবেদার ও কোর্ট রাইটারদের উপস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে কোর্ট কার্ড এর ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী চার সারিতে দাঁড়িয়ে নাম ডেকে সারিগুলো ঠিক করা হয়। কোর্ট কার্ডের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করা হয়। তৎপর কয়েদীদের মধ্যে যারা অফিস রাইটার (বিভিন্ন বিভাগের) তারা নতুন বন্দীদের উচ্চতা, সনাক্তকরণ চিহ্ন, ইত্যাদি প্রত্যেক নতুন বন্দীদের তালিকা অনুযায়ী একজন একজন করে নাম ডেকে রেজিষ্টারে নথিভুক্ত করেন। তা শেষ হলে প্রত্যেক নতুন বন্দীর (কয়েদী/হাজতী) নম্বর বুকে ধারণ করায়ে ছবি তুলেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসের কর্মচারী ডেপুটি জেলার। তৎপর নবাগত প্রত্যেক নতুন বন্দীকে কারাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বন্টন করা হয়। জহির সাহেবকে কোন একটি জেনারেল ৭ নম্বর ওয়ার্ডে দেয়া হয়। আমাকে দেয়া হয় ৩২ সেলে।

কারাবাসের আগে ফাইল শব্দটির অর্থ জানা ছিল কেবল কোর্ট ফাইল অফিস ফাইল হিসেবে। এখানে ফাইলের বিভিন্ন রূপ সুপার ফাইল, জেলার ফাইল, ডিআইজি ফাইল, মেডিকেল ফাইল। এখানে ইংরেজী শব্দগুলোর বিকৃত রূপ ও অর্থ দেখে শুনে হতবাক হতে হলেও কারাগারের অভ্যন্তরে তা একবারে স্বাভাবিক। কেইস টেবিল (দরবার বৈঠক)-কে বলা হয় ক্যাশ টেবিল, কনডেম সেলকে বলা হয় কনডম সেল (মৃত্যুদণ্ডে সাজা বা ফাঁসির আসামীদের ঐ কনডেম সেলে রাখা হয়)। সন্ত্রাসী, খুনী, রাজনৈতিক দলের সদস্য বা নেতা, শীর্ষ সন্ত্রাসী অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কেডারসহ ৪টির অধিক মামলা যাদের রয়েছে তাদের জন্য হচ্ছে ৩২ সেল, ১ নং সেল, ২নং সেল।

আমাকে ৩২ সেলে একজন জমাদার কর্তৃক আনা হলো সেখানে ৩২ সেলের ৩৬ নং ওয়ার্ডে দেয়া হলো। সেখানে এসে ঐ ওয়ার্ডের বন্দীদের মধ্যে যিনি সিনিয়র তিনি হলেন আকবর ভাই। তিনি আমার পরিচিতি জেনে অনেকটা আগ্রহ সহকারে ওয়ার্ডে জায়গা করে দিলেন। তিনি ছাত্রলীগের একজন শীর্ষ পর্যায়ের ক্যাডার। তিনি ১৭ বছরের সশ্রম কারা দণ্ডে দণ্ডিত বা সাজা প্রাপ্ত একজন কয়েদী। মামলা তার ৩৩ টি। সব মামলার জামিন হয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত মামলারও তার জামিন হয়েছে। কেবলমাত্র পিডব্লিউ মামলা দিয়ে সেইফ কাষ্টডিতে আছেন র‍্যাব এর ক্রশ ফায়ারে তালিকাভুক্ত বিধায়। তারপর ৩২ সেল থেকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার জীবন শুরু।

এরপর হতে ২/৩ দিন, ৪/৫ দিন অনেক ক্ষেত্রে একদিন পর পর কোর্ট হাজিরা শুরু। অস্ত্র মামলার চার্জ গঠন আরম্ভ হয়।

কারণ তাতে তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে। এব্যাপারে বিচার নিষ্পত্তির জন্য সময় মাত্র ৪৫ দিন। তা জরুরি বিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায় প্রদান করতে হবে। এভাবে কোর্টে যৌথবাহিনী প্রভাব সর্বত্র ছিল বিধায় সবশেষে ১২/০৭/২০০৭ তারিখে চট্টগ্রাম অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার দায়রা জজ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহম্মদ (রায় ঘোষণা করলেন) একতরফাভাবে রায় ঘোষণা করলেন এবং আমাকে ১৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত করলেন। যদিও আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবী করি; বাদীর ইচ্ছানুযায়ী রায় ঘোষিত হলো। এখানে বাদী বলতে সরকারের যৌথবাহিনী। তার মানে সরকার পক্ষই বাদী।

তারপর ১৬/০৭/২০০৭ তারিখে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার হতে রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়। রাঙ্গামাটি জেলা মেজিস্ট্রেট কোর্টে লংগদু ৩(৬)০৭ জিআর ১৮৯/০৭ ধারা ৩৬৫/৩৮৬/৩৪ দ:বি:। এই মামলা নিয়ে সরকার পক্ষ ৫ দিনের রিমান্ড দাবী করে। আমার আইনজীবীরা এই মামলার ভিত্তিহীনতার কারণে রিমান্ডের পরিবর্তে জামিন আবেদন করেন। আদালত ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। কোর্ট শেষে রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে ২নং সেলে রাখা হয়। সেখানে এসে ১নং সেলে নাগাল পেলাম অমর চাকমা ও মাইকেল চাকমাকে (ইউপিডিএফ-এর যুব ফোরামের পরিচালক)। ২ দিন থাকার পর রিমান্ডে নিয়ে যাবার সংবাদ আসলো। তাই পুনরায় রিমান্ডে চলে যেতে হলো সরাসরি থানায়। থানায় পৌছার সাথে সাথে থানার হাজতে না গিয়ে সরাসরি দোতলার রিমান্ড রুমে প্রবেশ করলাম পুলিশকে বলে।

সন্ধ্যার পর ডিজিএফআই-এর একজন অফিসারসহ যৌথবাহিনীর (তৎকালীন) মেজর ইয়াসীন আসলেন। তারা সম্ভবত বিকালের খানাপিনা খেয়ে আসেন নতুবা রিমান্ড শেষে বাসায় গিয়ে খেয়ে থাকেন। প্রায় সারারাত রিমান্ডের জিজ্ঞাসাবাদ চলে। ভোর রাত ২.৩০ ঘটিকায় রিমান্ড শেষ করে তারা চলে যায়। তৎপরে আবারও বিকাল ৭টা পর আবারও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু। একইভাবে ভোর ৪টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ চলে এবং সকাল ৯.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। এরপর কোর্টে প্রেরণ। রিমান্ড শেষ হলে কোর্ট আমাকে কারাগারে প্রেরণ করে। তারপর বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। তা শেষ পর্যন্ত ২৫/১০/২০০৭ তারিখে দুই বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হয় এবং সাথে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

তখন কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ছিলেন বজলুর রশীদ। তার সময়ে আমি বত্রিশ সেল হতে ১নং সেলে স্থানান্তর হই। পরে ১নং সেল হতে ২নং সেলে স্থানান্তর হই। জেল সুপার বজলুর রশিদ সাহেব বদলি হয়ে গেলেন তৎপরিবর্তে জেল সুপার হয়ে আসেন আতাউর রহমান সাহেব। পুরাতন জেল ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে পুরাতন জেল একেবারে খালি করে নতুন জেলের পদ্মা, যমুনা, কর্ণফুলি এই তিনটি ৫ তলা ভবনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বন্দীদের স্থানান্তর করা হয়। আমাকে ০৪/০৪/২০০৮ তারিখ ২নং সেল হতে পুনরায় ৩২ সেলে স্থানান্তর করা হয়। তখন আমরা ৩২ সেলের ২১ নং ওয়ার্ডে আসি। এরপর ৪১ নং ওয়ার্ডে। আমার সঙ্গে ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার হাজতী আসামী হাফিজুর রহমান হাফিজ (প্রকাশ হাফিজ ভাই) আমার ডাইট পার্টনার ছিলেন। তাছাড়া অপর ৩ জন চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার ছাত্রলীগের ক্যাডারসহ অন্যান্য মামলার হাজতি ছিলেন। কাটতে লাগলো কারাজীবন। পরিবার হতে মাসে একবার করে প্রায় দেখায় আসেন। পিসি (prisioners cash)-তে মাসিক হাত খরচ পরিবার থেকে হাজার খানেক টাকা দিয়ে দিলে মোটামুটি একমাস চলে যায়। কারা ক্যান্টিন হতে চা নাস্তা খাওয়া যায়। ঐ পিসি কার্ড হতে ঐ খরচ কর্তন করে রাখা হয়। এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- সাবান, ফিটকিরি, সালাদ খাওয়ার জন্য শসা, টমেটো, মরিচ, পেয়াঁজ, বিস্কুট, লবন, চিনি, মৌসুমী ফলমূল যেমন -আম, কাঠাল, লিচু, কুল; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরবের দিনে আত্মীয় স্বজনদের পাঠানো বিভিন্ন খাবার জিনিস কারাবিধি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বুধবার সাধারণত জেল সুপার ফাইল হয়ে থাকে। এ সময়ে যেকোন হাজতী বা কয়েদী নানা ধরনের ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা, অসুস্থতার চিকিৎসার কথা, মামলার জন্য কোর্ট কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে কোর্ট চালুর আবেদন, অথবা যারা দরিদ্র মামলার খরচ বহন করতে পারেন না তারা সরকারী আইনী সহায়তা, সংস্থা হতে আইনী সহায়তা চাইতে পারেন বা আবেদন করতে পারেন। তা সত্ত্বেও তা নির্ভর করে উদ্যোগ এবং তৎপরতার উপর। সিনিয়র জেল সুপার আতাউর রহমান সাহেব এবং মেডিক্যাল অফিসার ডা: উদয় শংকর চাকমা বত্রিশ সেল হতে পদ্মা-১ ডিভিশন আওতাধীন ভিআইপি ওয়ার্ড-এ আসার প্রস্তাব দেন। আমি প্রথমে আসতে চাইনি, কারণ সেল হচ্ছে- জেল এর ভিতরে জেল। এখানে কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ, তাতে বিশেষ করে শীর্ষ সন্ত্রাসী দাগী আসামী, রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হয়। জেল পলাতক আসামী পুনরায় ধরা পড়লেও তাদের সেলে রাখা হয়। তাই সেলে জেল প্রশাসনের কঠোরতা বর্তমান থাকে। তা সত্ত্বেও সেলে থাকলেও যেসব বন্দীর আর্থিক অবস্থা ভালো তারা নানাভাবে সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। তবে অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য অনুমোদন ব্যতিত কারা মেডিক্যালে আসা যায় না। তাই একসময় আতাউর রহমান সাহেবের সুপার ফাইলের সময় একই প্রকারের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি পদ্মা ভবনে ১০নং ওয়ার্ডে আসলাম।

তিন বছর গেলো মামলার জামিন একটার পর একটা হতে লাগলো।

১। ১৩/০৭/২০০৮ বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত মামলার সাজাসহ জামিনের খবর আসলো। কোর্ড কার্ড নিয়ে অফিসে যোগাযোগ করে ঐ মামলা কোর্ড কার্ড হতে কর্তন করতে গেলাম। জামিন রাইটারের হাতে কোর্ড কার্ড দিলাম, তিনি আমার কার্ডসহ অন্যান্য জামিন প্রাপ্ত বন্দীদের কার্ড নিয়ে তিনি কারা অফিসে ঢুকে, জেলারের অফিসে গিয়ে তা কর্তন করে পরে আমাকে পাঠাবেন, এই আশ্বাস পেয়ে ওয়ার্ডে চলে এলাম।

২। ০২/০৩/২০০৯ লংগদু অপহরণ মামলার জামিন হয়।

৩। এরপর ২৭/১০/২০০৯ তারিখে জুরোছড়ি কিনা মোহন চাকমার হত্যা মামলার জামিন লাভ করি।

৪। ১৮/১১/২০০৯ রাঙ্গামাটি কতোয়ালী থানার কুতুকছড়ি চেয়ারম্যান হত্যা মামলায় জামিন হয়।

৫। ২৭/১১/২০০৯ নানিয়ারচর অপহরণ ও হত্যা মামলার জামিন হয়।

ইতোমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সারাদেশে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে জাতীয় নির্বাচন হলো। আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও আমার দ্রুত মুক্তির আশা করেছিলাম। ইতোমধ্যে সরকারী ঘোষণানুযায়ী রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে পত্র-পত্রিকা মাধ্যমে ও টেলিভিশন সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারি। সে অনুযায়ী জেল সুপার আতাউর রহমান সাহেবের কাছে একদিন সুপার ফাইলের উত্থাপন করি। যেই কথা সেই কাজ। অফিস থেকে অফিস রাইটারের মাধ্যমে সাদা কাগজ সংগ্রহ করে দরখাস্ত লেখলাম জেল সুপার ও আইজি প্রিজন মাধ্যম স্বরাষ্ট্র সচিব বরাবর। স্মারক নং ১১৯১ তারিখ ০২/০৩/০৯ মূলে আবেদন পত্র প্রেরণ করা হলো। অপরপক্ষে পরিবারের তরফ থেকে একইভাবে রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করার আবেদন করা হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর দেখা যয় আওয়ামীলীগ অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ এসমস্ত অঙ্গ সংগঠনের দাপটে সারা দেশের সমস্ত জেলা-উপজেলার শাখা সংগঠন এবং অফিস আদালত পর্যন্ত ডিজিটেল বাংলাদেশের পরিবর্তে সর্বত্র দলীয়করণের রাজনীতি ত্বরান্বিত হয়। আমার মামলা প্রত্যাহার হলো না। একচ্ছত্র এই দলীয়করণের পরিণতি আওয়ামীলীগেরই বুমেরাং ডেকে আনতে পারে। ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু ক্ষমতায় গেলে সেসব ভুলে যায়। কারাগারে বসেই আমাদের ভিআইপি ওয়ার্ডে এসব কথা বন্দীদের মধ্যে প্রায়ই আলাপ আলোচনা হয়।

এইভাবে রাত যায় দিন আসে; আমার বই পড়ার যেমন শেষ নেই; তেমনি মুক্তির প্রহর গুণারও শেষ নেই। ০৫/০৮/২০১০ তারিখ সকালে সংবাদ পেলাম গতকাল হাই কোর্টে আমার জামিন আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। এরপর কেবল দিবারাত্রি মুক্তির প্রহর গুণছি। কখন মুক্ত জীবনে ফিরবো? ২৫ আগস্ট ২০১০ সকাল বেলায় চালান রাইটার আমার নাম ডাকলো। আমি নিজস্ব জিনিষপত্র নিয়ে চালান বেড়ী পরতে গেলাম। বেড়ী পরে তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর চালান রাইটার বললো, আপনার চালান লাগবে না। আপনি ওয়ার্ডে চলে যান। আপনার জামিন হয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে আমি অফিসে খবর নিলাম। আর বেড়ী খুলে এসে ওয়ার্ডে চলে গেলাম। দুপুরে জামিন রাইটার আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো। আমি ওয়ার্ডের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি সোজা জেল অফিস গেইট-এ। সংবাদ বাহকদের মাধ্যমে বাইরে আসা আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় নেতৃবৃন্দ সহ ব্যাপক কর্মীবাহিনী আমার অপেক্ষায় বাইরে জেল গেইট-এ অপেক্ষমান জানলাম। তাই জেল অফিসের নথিপত্রসহ যাবতীয় বিষয় ঠিক করা হলো। সে ব্যাপারে যা কিছু চাহিদা পূরণ করার পর তবেই বিকেল ৫ টার সময় জেল গেইট হতে মুক্তি দেয়া হলো। আমার পার্টির নেতৃবৃন্দসহ পাটির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আমাকে তাদের মাঝে বরণ করে নিলেন। এভাবেই কারাজীবনের ১২২৮ দিনের সমাপ্তি ঘটলো।

বিশেষ প্রতিবেদন

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও জাতি-আগ্রাসী

গত ৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে সকল জনমতকে উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে ২৯১-১ ভোটে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল ২০১১ পাশ হয়েছে। এই সংশোধনী বিল পাশ করার মধ্য দিয়ে সংবিধানে ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জাতিসমূহকে 'বাঙালী' হিসেবে পরিচিত করা হয়েছে। অপরদিকে সংবিধানে আদিবাসীদের স্বকীয় জাতিগত পরিচিতি ও তাদের মৌলিক অধিকার পূর্বের মতো অস্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু ধর্মীয় বৈষম্যমূলক বিধানাবলীর বিলোপ করতঃ '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনর্বহালের সুপ্রীম কোর্টের রায়কে অস্বীকার করে সামরিক শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' এবং 'বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম' সম্বলিত সাম্প্রদায়িক বিধানাবলী বহাল করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করার সাথে সাথে ঐদিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পঞ্চদশ সংশোধনীকে অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও জাতি-আগ্রাসী বলে অভিহিত করে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ৩০ জুন গৃহীত পঞ্চদশ সংশোধনী আদিবাসীদের "উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে আদিবাসী জাতিসমূহকে অসম্মান ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অপরদিকে আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত আইনগুলোর আইনী হেফাজতসহ আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বিশেষ শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন, আদিবাসী অধিকার সম্বলিত বিধানাবলী সংশোধনের ক্রে আদিবাসীদের মতামত ও সম্মতি গ্রহণ এবং আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারসহ ভূমি, ভূখন্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সংক্রান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা আদিবাসী জাতিসমূহের দাবীকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সর্বোপরি আদিবাসীদের যথাযথ জাতিগত পরিচিতি অস্বীকার করে সংবিধানে আদিবাসী ও বাঙালী নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণকে 'বাঙালী' হিসেবে পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারে আরেক বার তাদের উগ্র জাত্যাভিমান, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও অগণতান্ত্রিক মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় যে, প্রত্যেক জাতির আত্মপরিচয়ের অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া কোন জাতিগত পরিচিতিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণসহ সারা দেশের আদিবাসী জাতিসমূহ কখনোই মেনে নিতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের উক্ত সংশোধনী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এই অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও জাতি-আগ্রাসী বিধান চাপিয়ে দেয়ার কারণে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতির জন্য বর্তমান সরকারকেই সব দায়িত্ব বহন করতে হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে।
পঞ্চদশ সংশোধনীতে "আদিবাসী" শব্দের পরিবর্তে "উপ-জাতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতির ক্ষেত্রে অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর। আদিবাসীদের "আদিবাসী" হিসেবে স্বীকৃতি লাভের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রত্যেক জাতির আত্মপরিচয়ের সহজাত অধিকারকে খর্ব করে অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর পরিচিতি চাপিয়ে দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি উপনিবেশিক, উগ্র সাম্প্রদায়িক, জাত্যাভিমানী ও আগ্রাসী মানসিকতারই প্রতিফলন বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এ দেশে বৃহত্তর বাঙালি জাতি ছাড়াও অর্ধ শতাধিক আদিবাসী জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এসব জাতিসমূহ যুগ যুগ ধরে নিজস্ব সমৃদ্ধ সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নিয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এসব আদিবাসী জাতিসমূহকে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে "বাঙালী" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বলার অপো রাখে না যে, আদিবাসীরা নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী, কিন্তু জাতি হিসেবে কোনক্রমেই বাঙালী নয়। তারা জাতি হিসেবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, খাসি, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহাতো, বর্মন ইত্যাদি অর্ধ শতাধিক এক একটি স্বতন্ত্র জাতি।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে "...বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন" মর্মে বিধানের মাধ্যমে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী আদিবাসী জাতিসমূহকে "বাঙালী" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। সে সময় তৎকালীন গণপরিষদের সদস্য ও জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী আদিবাসী জাতিসমূহকে বাঙালী হিসেবে অভিহিত করার বিরুদ্ধে সংসদের ভেতরে ও বাইরে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন। এর প্রতিবাদে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর তিনি গণপরিষদের অধিবেশন ওয়াকআউট করেন এবং সংবিধান বিলে স্বাক্ষর প্রদানেও বিরত থাকেন।

পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে "...বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন" মর্মে সংশোধনের মাধ্যমে সেই ভুল শুধরানো হয়। কিন্তু আজ চল্লিশ বছর পর আবার এসব আদিবাসী জাতিসমূহকে সংবিধানের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নতুন করে "বাঙালী" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে উগ্র জাত্যাভিমান, আগ্রাসী মানসিকতা ও চরম জাতিগত বৈষম্যেরই প্রতিফলন বলে প্রতীয়মান হয়। এ থেকে এটাই প্রমাণ করে যে, বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী যতই দিন বদলের প্রতিশ্রুতি ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উদার কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করুক না কেন তারা এখনো সেই অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও উগ্র বাঙালী জাত্যাভিমানের কুৎসিত খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

সংবিধানের "সংগঠনের স্বাধীনতা" সংক্রান্ত মূল অনুচ্ছেদের সাথে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে শর্তাংশ সংযোজন করা হয়েছে তা সংগঠনের স্বাধীনতাকে বা কোন জনগোষ্ঠীর সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতাকে যেমন খর্ব করবে তেমনি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে জাতিগত বৈষম্য ও আগ্রাসনকে বৃদ্ধি করবে। উল্লেখ্য যে, '৭২-এর সংবিধানে উক্ত সংগঠনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিধির সাথে এই মর্মে শর্তাংশ ছিল যে, "তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা ল্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।"

মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী আইনকে বাতিলের মাধ্যমে একদিকে যেমন ধর্মীয় বৈষম্যমূলক সকল বিধানাবলীর বিলোপ করতঃ '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনর্বহালের ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে তার মাধ্যমে দেশের সংবিধানকে মৌলবাদী খোলস থেকে বের করে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রূপদানের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে প্রারম্ভে ও প্রস্তাবনার উপরে "বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম" এবং ৩নং অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন" মর্মে সংবিধানে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পঞ্চদশ সংশোধনীতে একদিকে 'রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান' বিলোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে মর্যাদা দেয়ার পরস্পর বিরোধী প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে। বস্তুতঃ "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" ও "ধর্ম নিরপেক্ষতা" একসঙ্গে চলতে পারে না। সংবিধানে "বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম" ও "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" রেখে কখনোই ধর্মনিরপেতা ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকতে পারে না। রাষ্ট্র সবার, ধর্ম যার যার। এই সংযোজনী প্রস্তাবে যদিও "হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করার" কথা বলা হয়েছে কিন্তু কার্যতঃ এই প্রস্তাবের মাধ্যমে সংবিধানে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে দেখার রাষ্ট্রীয় ধারাকে আরো পাকাপোক্ত করা হয়েছে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি অচিরেই পঞ্চদশ সংশোধনীর এসব বিধানাবলী সংশোধনের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির দাবী অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণসহ দেশের আদিবাসী জাতিসসমূহের জাতিসত্তা ও মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানিয়েছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে খ্রিস্টান রাষ্ট্র বা দক্ষিণ সুদান কিংবা পূর্ব তিমুর-এর মতো পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের অপপ্রচারনা প্রসঙ্গে

আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিলে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মধ্যে পড়বে বলে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে কল্পনাপ্রসূত, জাতি-বিদ্বেষী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এমনকি আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে নিয়ে দক্ষিণ সুদান বা পূর্ব তিমুর এর মতো পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জাতিসংঘসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সুদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্র চলছে বলেও সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলে জনমত তৈরী করা হচ্ছে। এলক্ষ্যে পশ্চিমা দেশগুলোর মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের খ্রিস্টান ধর্মে দীতিকরণের ব্যাপক ভিত্তিতে কাজ চলছে বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সরকারের তরফ থেকেও এই প্রচারণার সাথে সুর মিলিয়ে আদিবাসী বিষয়ে চরম নেতিবাচক নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে সর্বশেষ অপপ্রচার চালানো হয় ২৬ জানুয়ারি ২০১১ অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির ৭ম সভায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, তথ্য মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) এ বি এম তাজুল ইসলাম ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু। এছাড়া স্বরাষ্ট্র সচিব, আইজিপি, ডিজি-আনসার, ডিজি-বিজিবি, ডিজি-কোষ্ট গার্ড, ডিজি-র‍্যাব, মন্ত্রীপরিষদ সচিব, প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার এবং চীফ জেনারেল ষ্টাফ অথবা তাদের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় সেনাসদরের প্রতিনিধি জানান যে, "সম্প্রতি দক্ষিণ সুদান ও পূর্ব তিমুরের রাজনৈতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর সূচনা হয়েছে প্রায় ৭৫-৮০ বছর পূর্বে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন এধরনের কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে এখন থেকেই আমাদের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে চিন্তা করতে হবে।" এ সময় ডিজিএফআই-এর প্রতিনিধি জানান যে, "ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়োগকৃত উপজাতীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা হতে এতে স্পষ্ট যে, এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান উপজাতীয়রা চাকুরীর মাধ্যমে পুনর্বাসিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা সাধারণতঃ গভীর জঙ্গলে বসবাস করে। তারা ছোটখাট দোকান, নদী, খাল ও লেকে বোট চালিয়ে, জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা যাতে তাদের দরিদ্রতার সুযোগ গ্রহণ করে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করতে না পারে সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে রাস্তাঘাট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন।"

উক্ত সভায় তথ্যমন্ত্রী আবুল কামাল আজাদ জানান, "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের হাইকমিশনার/ রাষ্ট্রদূতরা ঘন ঘন পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করছেন। বিদেশী সাংবাদিক ও বিভিন্ন লোকের আনাগোনাও বেড়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘিরে বিদেশীদের নিশ্চয় কোন গোপন এজেন্ডা আছে। এখানে কিছু লোক উস্কানীও দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে বিভিন্ন প্রকার অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।"

'উপজাতিরা আদিবাসী স্বীকৃতি পেলে সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে' শিরোনামে দৈনিক যুগান্তরের ৭ জুন ২০১১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, "কোন অবস্থাতেই পাহাড়ি এলাকার অবাঙালি উপজাতি জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি না দিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে সরকারের কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী ও নীতিনির্ধারক পর্যায়ের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আদিবাসী ইস্যুতে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেয়া ছাড়াও সম্প্রতি গোয়েন্দা সংস্থার কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদসহ চারজন সিনিয়র মন্ত্রীর দফতরে গিয়ে ল্যাপটপের মাধ্যমে উদ্বেগজনক সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। ...রিপোর্টে আশংকা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, বিদেশী কয়েকটি দাতা সংস্থা ও দেশী-বিদেশী কিছু এনজিও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দীর্ঘমেয়াদি অসৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা গোপনে কাজ করছে। কিছু কিছু এনজিও শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের নামে উপজাতীয়দের বিভিন্ন সভা-সেমিনারে মন্ত্রীদের প্রধান অতিথি হিসেবে নিয়ে গিয়ে আদিবাসী শব্দটি জায়েজ করার অপচেষ্টাও অব্যাহত রেখেছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।"

গত ২৬ জুলাই ২০১১ 'আদিবাসী' বিষয়ে বিদেশী কূটনীতিক ও উন্নয়ন সহযোগী গোষ্ঠী এবং দেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের নিকট তুলে ধরতে আয়োজিত ব্রিফিং-এ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মণি বলেছেন যে,

স্বার্থান্বেষী কিছু মহল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম ও জাতিসংঘের বিভিন্ন আলোচনায় বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী অভিহিত করার মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা দেয়ার অপপ্রয়াস হিসেবে আদিবাসী ইস্যুকে উসকে দিচ্ছে। তিনি আরো বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাটি কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে তা পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বক্তব্য প্রদান করেন।

বস্তুতঃ আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হলে দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মধ্যে পড়বে বা বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠী অ-আদিবাসী বা বহিরাগত হয়ে যাবে এমন ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত, বর্ণবাদী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বৈ কিছু নয়। পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। এসব ঘটনাবলীর সাথে তুলনা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নানা অজুহাত দেখিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে দমিয়ে রাখা এবং তাদের উপর দমন-পীড়ন চালানোর বৈধতা লাভের চেষ্টা করা।

জুম্মরা ব্যাপক হারে খ্রিস্টান ধর্মে দীতি হচ্ছে এই প্রচারনাও কল্পনাপ্রসূত ও বানোয়াট। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত তিন পার্বত্য জেলার ২০০১ সালের আদমশুমারীর উদাহরণ দিলেই অপপ্রচারের ষড়যন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্রের কত গভীরে প্রোথিত রয়েছে তা স্পষ্ট হবে-

জেলা	মোট	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
রাঙ্গামাটি	৫,০৮,১৮২	১,৮৭,১৩২	২৬,৯৪৪	৮,৭৮১	২,৮৪,৯০৬	৪১৯
খাগড়াছড়ি	৫,২৫,৬৬৪	২,২৮,৭৫৩	৮৬,৩৫১	৩,৭৪৫	২,০৬,৪৭৩	৩৪২
বান্দরবান	২৯৮,১২০	১৪৭,০৬২	১০,৭৯৬	২৮,৫৪৬	১০৩,৯৯৭	৭,৭১৯
মোট	১৩,৩১,৯৬৬	৫,৬২,৯৪৭	১,২৪,০৯১	৪১,০৭২	৫,৯৫,৩৭৬	৮,৪৮০

বাংলাদেশ আদমশুমারি-২০০১, কমিউনিটি সিরিজ, জেলা: রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান, জানুয়ারী ২০০৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ৫,৯৫,৩৭৬ জন আর বৌদ্ধ জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে মাত্র ৪১,০৭২ জন। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই ব"হত্তর জাতি চাকমা ও মারমারা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এরমধ্যে চাকমাদের কতিপয় ব্যক্তি খ্রিস্টান হলেও (যা ১% বা ২% এর মতো হতে পারে) মারমারা ১০০ শতাংশই বৌদ্ধ। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে চাকমা ও মারমা এই দুই জাতি মিলে জনসংখ্যা হলো ৩,৮১,৭৫১ জন। আর সেই সাথে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তঙ্গঞ্চ্যাদের (জনসংখ্যা ১৯,২১১ জন) ধরলে বৌদ্ধ জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০০,৯৬২ জন।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার তথ্যাবলী সর্বৈব মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে ধরে নেয়া যায়। মূলতঃ জুম্মরা ব্যাপক হারে খ্রিস্টান হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে পৃথক খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর ষড়যন্ত্র চলছে এমন উদ্ভট ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারনার উদ্দেশ্যেই এই বানোয়াট তথ্য পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে দেখানো হয়েছে।

অপরদিকে যেখানে ১৯২১ ও ১৯৬১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা যথাক্রমে ৭,২৯১ ও ৪৫,৩২২ জন সেখানে ২০০১ সালে এসে ৫,৬২,৯৪৭ জনে উন্নীত হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালে যেখানে মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা যথাক্রমে ৫২৫টি ও ৩৫টি সেখানে ২০১১ সালে এসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২,২৯৭টি মসজিদ ও ১,৫৬২টি মাদ্রাসা। এছাড়া জুম্ম-বাঙালী বা মুসলিম-অমুসলিম জনসংখ্যা প্রায় সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও যেখানে বৌদ্ধ মন্দির (১,৪৭১টি), হিন্দু মন্দির (৪১৫টি বাঙালী হিন্দুসহ) ও চার্চ (৩৬৬টি) মিলে মোট ২,২৫২টি সেখানে মসজিদ মাদ্রাসা মিলে রয়েছে ৩,৮৫৯টি। এতে বুঝা যায় যে, কত দ্রুত ও পরিকল্পিতভাবে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিণত করার ষড়যন্ত্রই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বস্তুতঃ এসব প্রচারণা সম্পূর্ণভাবে অবান্তর ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। ঐতিহাসিক কাল থেকে যাদের উপর চরম বৈষম্য ও বঞ্চনা চলে আসছে তাদের সেই বিশেষ প্রোপটকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রদানের জন্য জাতিসংঘসহ বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশে সেসব অবহেলিত ও উপেতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানেও "নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ" এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান স্বীকৃত হয়েছে; যেখানে আদিবাসী জাতিসমূহকে সেই অনগ্রসর অংশের মধ্যে বিবেচনায় নিয়ে সরকার এযাবৎ নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু যেহেতু "নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ" প্রত্যয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এর

মাধ্যমে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পরিপূরণ হয় না, সেহেতু আদিবাসীদের জাতিগত পরিচয়সহ তাদের মৌলিক অধিকারের সরাসরি সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীটি জোরালো রূপ ধারণ করেছে।

জাতিগত সমস্যার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য ও বঞ্চনার যতই অধিকার-ভিত্তিক গঠনমূলক সমাধানের পথ গ্রহণ করা হয় ততই সংখ্যালঘু জাতিসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠে এবং সাথে সাথে ততই জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা অধিকতর সুদৃঢ় হয়ে উঠে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে যে, এসব জাতিসমূহকে 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী হবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র অধিকতর সম্প্রসারিত হবে। এতে করে এদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা ও নৃতাত্ত্বিক বহুমাত্রিকতা অধিকতর সমৃদ্ধশালী হবে।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত

বিগত বছরের ন্যায় এবছরও পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়া বন্ধ থাকেনি। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও জুম্মদের উপর একাধিক বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি বেদখলের প্রচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি বেদখলের প্রচেষ্টা অবিচ্ছেদ্য এক সমস্যা। আর এর মূল ঘটক হচ্ছে বাঙালী সেটেলাররা। তবে এর পেছনে বরাবরই থাকে একটি প্রভাবশালী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। এরাই কোন না কোন অজুহাত তুলে বা ছুটো পেলে নানা উস্কানী দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সাধারণ বাঙালী সেটেলারদের দিয়ে এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক হামলা বা ভূমি বেদখলের প্রচেষ্টা চালায়। এ সমস্ত কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে আদিবাসী জুম্মদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা, তাদের পাহাড়-জমি বেদখল করা, সহায়-সম্পত্তি বিনাশ করা, জুম্ম জনগণের মধ্যে একটা ত্রাস সৃষ্টি করা, যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বভূমিতে আদিবাসীদের সংখ্যালঘু করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ করা। বলা বাহুল্য, এর মাধ্যমে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নেও একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

এই প্রক্রিয়াটি প্রথম ব্যাপক আকারে বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৭৮-৮০ সালে জিয়াউর রহমানের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালী এনে জোর করে জুম্মদের বসতভিটায় পুনর্বাসন বা বসতি প্রদান করার মধ্য দিয়ে। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এর মাধ্যমে এই ভূমি সংকটের সমাধানের কথা থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ায় এই ভূমি সমস্যা ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর সমস্যাটি আপেক্ষিকভাবে কিছুটা প্রশমিত মনে হলেও বাস্তবে তা তুষের আগুনের মতই বিরাজ করে। ফলে একটু সুযোগ পেলেই তা ছড়িয়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য, বর্তমান সরকার বারবার চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করলেও, পার্বত্য সমস্যা সমাধান ও আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বললেও চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করায় এ সরকারের আমলেও একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিগত এক বছরে (নভেম্বর ২০১০-নভেম্বর ২০১১) জুম্ম গ্রামে অন্তত তিনটি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং অন্তত ৬ বার জুম্মদের ভূমি বেদখল বা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গত ২১ ডিসেম্বর ২০১১ একদল বাঙালী সেটেলার রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালী ইউনিয়নের শান্তিনগর এলাকার জুম্ম গ্রামে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। এতে ২ জন জুম্ম মারাত্মকভাবে আহত হয়, ১২ জন প্রহারের শিকার হয় এবং ৫টি বাড়ী তছনছ করা হয়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ বিকাল প্রায় ৫:৩০ টায় স্থানীয় বিজিবি সদস্যদের সহায়তায় রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালি ইউনিয়নের গুলশাখালি সেটেলার এলাকার ২০০-২৫০ জনের বাঙালী সেটেলারদের একটি দল এক বাঙালী সেটেলারের অজ্ঞাত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গুলশাখালি ও বাঙ্গিপাড়া এলাকার জুম্ম গ্রামে ব্যাপক হামলা চালায়। এই সাম্প্রদায়িক হামলায় একটি ব্রাক স্কুলসহ জুম্মদের ২৩ বাড়ী ভস্মীভূত হয়। অপরদিকে দপুরে একই বিষয়ে একদল বাঙালী সেটেলার লংগদু উপজেলা সদরস্থ তিনটিল্যা লঞ্চঘাটে হামলা চালিয়ে ২ জুম্ম ছাত্রকে মারাত্মকভাবে আহত করে।

গত ১৭ এপ্রিল ২০১১ খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও পার্শ্ববর্তী মানিকছড়ি উপজেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় পার্শ্ববর্তী বাঙালী সেটেলাররা সংঘবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে অন্তত ৬টি গ্রামের ১১১টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে এবং কমপে ২০ জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। হামলায় ২টি বৌদ্ধ মন্দিরও ভস্মীভূত করা হয়। অপরদিকে ভূমি বেদখলের প্রচেষ্টা হিসেবে- গত ৫ ডিসেম্বর ২০১০ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার লেমুছড়িতে বাঙালী সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে জুম্ম জায়গায় কিছু ঘর নির্মাণ করা হয়, ৩ মার্চ ২০১১ রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলায় বাঙালী সেটেলাররা জুম্মদের মালিকানাধীন জলে ভাসা জমি বেদখলের চেষ্টা চালায়, গত ৮ মে ২০১১ খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নের লুকলুক্যা এলাকার ওয়ার্কছড়িতে বাঙালী সেটেলারদের একটি দল আদিবাসী মারমাদের মালিকানাধীন ভূমি বেদখলের চেষ্টা করে, ২০১১ সালের মে মাসে বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার পাইতং মৌজায় চেয়ারম্যান নুরু ও সাবেক চেয়ারম্যান রফিকের ভাই মোহাম্মদ সামশু নামের দুই ব্যক্তি আদিবাসী ত্রিপুরাদের মালিকানাধীন ৪০০ একর ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালায় এবং তার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে আদিবাসী গ্রামবাসীদের মালিকানাধীন ২০ একর বনভূমি ধ্বংস করা হয়, গত ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ একদল বাঙালী সেটেলার খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন পাতাছড়ি ইউনিয়নের নাভাঙ্গা মৌজার পাগলাপাড়া এলাকায় আদিবাসী মারমাদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালায়, সম্প্রতি স্থানীয় বাঙালী সেটেলারের নেতা সাংবাদিক পরিচয়ধারী এ কে এম জাহাঙ্গীর নামের জনৈক এক ভূমিদস্যু বান্দরবান জেলার কুহালং মৌজাধীন ঘুংরু মুখ পাড়ায় আদিবাসী খিয়াংদের প্রায় ৭৫ একর ভূমি বেদখল করে।

উল্লেখ্য, এই সরকারের আমলেই ২০১০ সালের প্রথম দিকে বাঘাইছড়ি ও খাগড়াছড়িতে পর পর সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক জুম্মদের উপর অন্যতম বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলা হয়। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ দুই দিনব্যাপী রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়িতে ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে আদিবাসী জুম্মদের উপর সংঘটিত পৃথক দুই সাম্প্রদায়িক হামলায় ২ জন নিহত, কমপক্ষে ২৫ জন আহত ও বৌদ্ধ মন্দির, গীর্জাসহ ৪ শতাধিক ঘরবাড়ী ভস্মীভূত করা হয়। বলাবাহুল্য, এ সমস্ত হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা বা শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া গেল-

সাম্প্রদায়িক হামলা	তারিখ	বাড়ীর সংখ্যা		নিহত	আহত	ধর্ষণ/ যৌন হয়রানি
		ভস্মিভূত	লুটপাট			
বাঘাইহাট হামলা	৪ এপ্রিল ১৯৯৯	--	--	--	৫১	১
বাবুছড়া হামলা	১৬ অক্টোবর ১৯৯৯	-	৭৪	৩	১৪০*	১
বোয়ালখালী-মেরুং	১৮ মে ২০০১	৪২	১৯১	--	৫	--
রামগড় হামলা	২৫ জুন ২০০১	১২৬	১১৮	--	অসংখ্য	--
রাজভিলা হামলা	১০ অক্টোবর ২০০২	১১	১০০	--	৩	--
ভুয়াছড়া হামলা	১৯ এপ্রিল ২০০৩	৯	--	--	১২	--
মহালছড়ি হামলা	২৬ আগস্ট ২০০৩	৩৫৯	১৩৭	২	৫০	১০
মাইসছড়ি হামলা	৩ এপ্রিল ২০০৬	-	১০০	-	৫০	৪
সাজেক হামলা	২০ এপ্রিল ২০০৮	৭৮	৭৮	-	-	-
বাঘাইহাট হামলা	১৯-২০ ফেব্রু ২০১০	৪৩৭	-	২	২৫	-
খাগড়াছড়ি হামলা	২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০	৬১	-	-	-	-
লংগদু হামলা	১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১	২১	৬	-	১৫	-
রামগড়-মানিকছড়ি	১৭ এপ্রিল ২০১১	১১১	-	২	২৫	-

বান্দরবানে লীজ বাতিল : এক শুভঙ্করের ফাঁকি

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্মদের ভূমি হারানোর অন্যতম একটি প্রক্রিয়া হলো সরকার কর্তৃক অস্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নির্বিচারে ইজারা প্রদান করা। জুম্মদের জীবনযাত্রার উপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বা শিল্প স্থাপনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে প্রদান করা এই ভূমি ইজারা। সবচেয়ে বেশী ইজারা প্রদান করা হয়েছে বান্দরবান পার্বত্য জেলায়। কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় ৪৩,৬০০ একর ভূমির ১,৭৪৪টি প্লট ইজারা প্রদান করা হয়েছে বহিরাগতদের নিকট।

লীজ গ্রহণকারীদের মধ্যে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো- (১) ক্যাপ্টেন (অবঃ) এন এ ফয়েজ, জেনারেল ম্যানজার, বিকেবি, ৯ মতিঝিল হাউজিং সোসাইটি, পূর্ব কাপরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা; (২) সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদ, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম (লামা উপজেলা ৩০১নং সরই মৌজা ও ৩০৩নং ডলুছড়ি মৌজায় তার আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন জনের নামে সর্বমোট ৪,০০০ একর লীজ); (৩) বান্দরবান রিজিয়নে এককালে দায়িত্বরত ক্যাপ্টেন মো. আশরাফুল ইসলাম (নিজ নামে ৩১৩নং বান্দরবান মৌজার ৪৯৬নং হোল্ডিং এর লীজ নং ৬ (এইচ) ১৯৮২-৮৩ মূলে ২৫ একর লীজ); (৪) নাইংছড়ি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা নাওয়ার আসলাম হাবিব ও তার স্ত্রীর নামে মতা অপব্যবহার করে বাকখালী মৌজাধীন ২৩৪ একর এবং আলীং মৌজাধীন ১৫০ একর ভূমি লীজ ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এসব পাহাড়ভূমিগুলো হচ্ছে জুম্মদের জুমভূমি ও যৌথ মৌজা বন। এই ইজারা প্রদানের ফলে শত শত জুম্ম পরিবার প্রথাগত জুমচাষ ও গৃহস্থালীর জন্য বনজ সম্পদ আহরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে তাদের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ভূমি ইজারাদাররা জুম্ম জুমচাষীদের জুমচাষে বাধা দিচ্ছে এবং তাদের উপর সন্ত্রাসী দিয়ে হামলা করছে। ইজারা নেয়া এসব পাহাড়ভূমির বরাতে ইজারাদাররা ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ নিয়েছে। তারা ইজারা নিলেও অধিকাংশ পাহাড়ভূমি অনাবাদী অবস্থায় রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী এসব ইজারা বাতিলের বিধান রয়েছে। কিন্তু সরকার আজ অবধি এই বিধান কার্যকর করেনি। পক্ষান্তরে এই বিধান লঙ্ঘন করে তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকরা এখনো ইজারা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

গত ২০ জুলাই ও ১৮ আগস্ট ২০০৯ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবান জেলায় অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে এখনো চুক্তি মোতাবেক কোন রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সে সমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মৌজার হেডম্যান, জেলা কানুনগো, উপজেলার আমিন সমন্বয়ে বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় যেসব লীজ গ্রহীতাগণ বাগান সৃজন করে নাই তাদের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তক্রমে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বাগান সৃজিত না করে চুক্তি পত্রের শর্ত লঙ্ঘিত করার কারণে ৫৯৩টি প্লট বাতিল করা হয় এবং লীজ বাতিলকৃত প্লট মালিকদের নিকট জেলা প্রশাসকের (রাজস্ব শাখা) কার্যালয় এর স্মারক নং-জেপ্রবান/লীজ-১০৬০/ডি/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ-২৯/০৯/২০০৯ খ্রি: রেভেন্যু ডেপুটি কালেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) পক্ষে, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটিশ প্রদান করে আলোচ্য ভূমি সরকারের দখলে আনা হয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক যে, বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন দুর্নীতির মাধ্যমে লীজ বাতিলের দু'মাসের মাথায় স্মারক নং- জেপ্রবান/লীজ মো:নং-১০৬০(ডি)/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ ১৯/১১/২০০৯ মূলে বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করা হয়। অন্যদিকে অবশিষ্ট প্লট কাগজে কলমে বাতিল করা হলেও এখনো উক্ত ভূমি প্লট মালিকদের দখলে রয়েছে। পক্ষান্তরে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া, ভূমি কমিশন আইন সংশোধন না হওয়া, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া এবং পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী লীজ বাতিল না হওয়ার কারণে অস্থানীয় ও বহিরাগত বাঙালিরা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ও যোগসাজসে ইজারা ভূমির নামে হাজার হাজার একর ভূমি জবরদখল করে চলেছে এবং উক্ত জায়গা-জমি থেকে জুম্মদের চলে যেতে হুমকি দিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু এলাকায় ভাড়াটিয়া বহিরাগত বাঙালী শ্রমিকদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্ম গ্রামবাসীর উপর হামলাও চালিয়েছে। ফলত: আদিবাসী জুম্মরা শংকিত ও উদ্বিগ্নাবস্থায় জীবন যাপন করছে। অতিশীঘ্রই ইজারা বাতিল না হলে এবং দখলদারদের উচ্ছেদ করা না হলে এতদাঞ্চলের পরিস্থিতি চরম সংকটের দিকে যাবে।

উল্লেখ্য যে, প্রতিপ্লটে ২৫ একর জমি লীজ দেয়া হলেও ইজারাদাররা ক্ষমতার জোরে ২৫ একরের পরিবর্তে তার দ্বিগুণ ৫০ একর পর্যন্ত ভূমি জবর দখল করে থাকে। এমনকি জুম্মদের রেকর্ডীয় জায়গা-জমিও তারা জবরদখল করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একেএম জাহাঙ্গীর নামে বান্দরবানের এক সাংবাদিক বান্দরবানের কুহালং মৌজার চেমিডুলু পাড়ায় ২৫ একর জায়গা লীজ নেন। কিন্তু তিনি গুংরু পাড়া সংলগ্ন খিয়াংদের ভোগদখলীয় আরো ২৫ একর জায়গা জবরদখল করে নেন।

বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী মৌজায় প্রফেসর নাজিম উদ্দিন কোং কর্তৃক আখ্য চাকের ৫ একর রেকর্ডীয় জায়গা (হোল্ডিং নং ১২৭), জাফর কোং কর্তৃক রাইখ্যাঅং চাকের রেকর্ডীয় ৫ একর (হোল্ডিং নং ৪০৭/৪০৪) এবং পিএসপি মিজানুর কোং কর্তৃক হাফজাই চাক, খ্যাথোয়াই চাক ও ছাঅং চাকদের ৫ একর করে মোট ১৫ একর জায়গা জবরদখল করা হয়। প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও ক্ষমতার জোরে কোন কিছুই কর্ণপাত করেনি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(রাজস্ব শাখা)
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং জেপ্রশাস/লীজ মোঃ নং ১০৯০/চি/৮০-৮১/২০০১ — তারিখ ঃ /১১/২০০১খ্রিঃ।

বিষয় ঃ [illegible] পুনর্বহাল প্রসঙ্গে

[illegible] ভূমি, [illegible] ১১০৮নং [illegible] ইজারা ও চুক্তি বাতিল আদেশ পুনঃ [illegible] ইজারা ও চুক্তি সহ মেসার্স বলাকা ট্রেডার্স ([illegible]), ১৪৪/১, পুরানো [illegible] রোড, ঢাকা-১ এর নামে পুনঃ বহাল করা হলো।

তফসীল ঃ
মৌজা ঃ-২৮৬নং ফাসিয়াখালী
সিট নং- ১২
দাগ নং ১,৩৫৪নং (নতুন), ১৫৯৬ (পুরাতন)
জমির পরিমাণ ঃ ২৫.০০ একর
হোল্ডিং নং-৫১৭৯

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (ভারপ্রাপ্ত)
পক্ষে, জেলা প্রশাসক
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং জেপ্রশাস/লীজ মোঃ নং-১০৯০/চি/৮০-৮১/২০০১-২৮(৫), তারিখ ঃ ১৯ /১১/২০০১খ্রিঃ।

অনুলিপি ঃ অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি), লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
২। সহকারী কমিশনার, [illegible], বান্দরবান কালেক্টরেট
৩। রেজিস্ট্রেশন অফিসার, বান্দরবান কালেক্টরেট।
৪। চেয়ারম্যান, ২৮৬নং ফাসিয়াখালী মৌজা, লামা উপজেলা, বান্দরবান।
৫। ....

- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৯/১১/০১
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (ভারপ্রাপ্ত)
পক্ষে, জেলা প্রশাসক
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

বিশেষ প্রতিবেদন

আদিবাসী বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য বিভ্রান্তিকর, সাম্প্রদায়িক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

গত ২৬ জুলাই ২০১১ বিভিন্ন দেশের কুটনীতিক, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে এক ব্রিফিং অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে বিবেচনা না করতে এবং তার পরিবর্তে 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী', 'ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী', 'Ethnic Minority' হিসেবে অভিহিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এসময় দীপু মনি আরও বলেন, 'বাঙালীরাই এ দেশের প্রকৃত আদিবাসী।'

গত ২৮ জুলাই ২০১১ এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনির এহেন ব্রিফিং অনুষ্ঠান ও বক্তব্যের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। জনসংহতি সমিতি মনে করে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ব্রিফিং ও বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসীদের বিষয়ে সরকারের বা সরকারের একটি প্রভাবশালী মহলের অত্যন্ত নেতিবাচক, বিভ্রান্তিকর, অসম্পূর্ণ, পক্ষপাতিত্বমূলক ও অশ্রদ্ধামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা ভূমিকা ফুটে উঠেছে এবং এর ফলে বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু স্বতন্ত্র আদিবাসী জাতিসমূহের বিরুদ্ধে বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর জাত্যাভিমান ও জাতিগত বৈষম্যকে উস্কে দেয়া হয়েছে।

জনসংহতি সমিতি মনে করে, যে যাই বলুক না কেন, সংখ্যালঘু হোক সংখ্যাগুরু হোক প্রত্যেক জাতির বা জনগোষ্ঠীর তার আত্মপরিচয় নির্ধারণ করবার অধিকার তার মৌলিক অধিকার। কারো পরিচয় অন্য কেউ জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। কাজেই আদিবাসীদের তাদের পছন্দমত নিজেদের জাতিগত পরিচয় সরকার কেড়ে নিতে পারে না।

দীপু মনি আরও বলেন, 'বাঙালীরাই এদেশের প্রকৃত আদিবাসী। চার হাজার বছরেরও আগে এ দেশে বসবাস শুরু করে বাঙালীরা, যার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে উয়ারী বটেশ্বরে।...পাহাড়ীরা নয়, বাঙালীরাই এদেশের আদিবাসী।'

জনসংহতি সমিতি মনে করে, উক্ত বক্তব্যে বাংলাদেশের ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত ইতিহাসকে খন্ডিতভাবে ও বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ীদের শত শত বছরের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাসকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সুদূর অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী আদিবাসীরাই এ অঞ্চলে প্রথম স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এ অঞ্চলের পাহাড়ীরা স্বশাসন বজায় রেখেই বসবাস করে এসেছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ৯৮% ছিল পাহাড়ী আদিবাসী, অপরদিকে মাত্র ২% ছিল বাঙালী জনগোষ্ঠীর মানুষ। কাজেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপরোক্ত বক্তব্য সত্য নয়।

দীপু মনি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন যে, 'স্বার্থান্বেষী কিছু মহল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম ও জাতিসংঘের বিভিন্ন আলোচনায় বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী অভিহিত করার মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়। ঐসব মহলের এ ধরনের অপতৎপরতা বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়, ভাবমূর্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকী সৃষ্টি করেছে।'

জনসংহতি সমিতি মনে করে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যেও বাস্তব কোন ভিত্তি ও সত্যতা বা যৌক্তিকতা নেই। কারণ পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়ী জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে নানাভাবে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত-বঞ্চিত হয়ে আসছে এবং সামগ্রিকভাবে তাদের জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব আজও সংকটাপন্ন। তারা তাদের জাতীয় পরিচয়ের স্বীকৃতি চায় এবং তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের স্বীকৃতি চায়। এতে অন্য কোন জাতির জাতীয় পরিচয়, ভাবমূর্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকী সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না। কাজেই পার্বত্যাঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী অভিহিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়, ভাবমূর্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকী সৃষ্টি তো নয়ই, বরং এতে বাঙালী জাতির ভাবমূর্তিই উজ্জ্বল হবে ও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সুসংসহত হবে। দেশের জনগণের জান-মাল, অপর কোন জাতির জাতীয় পরিচয় ও ন্যায্য দাবীকে অন্যায় ও অযৌক্তিভাবে উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও দমন করে কখনো কোন জাতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা যায় না এবং দেশের সার্বভৌমত্বকে সুসংসহত করা যায় না।

উক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনসংহতি সমিতি সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকা, আদিবাসীদের স্বীকৃতি প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জোর আহ্বান জানিয়েছে।

দীপু মনি বলেছেন 'বাঙালীরাই এদেশের প্রকৃত আদিবাসী। চার হাজার বছরেরও আগে এ দেশে বসবাস শুরু করে বাঙালীরা, যার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে উয়ারী বটেশ্বরে।" বস্তুতঃ দীপু মণির এই বক্তব্য সর্বাংশে সত্য নয়। জানা যায় যে, সামন্ত যুগে

বাংলাদেশে বা বাংলাভাষী অঞ্চল কখনও এক ছিল না। সুতরাং সামন্ত যুগের বাংলাদেশ যখন বলা হয়, তখন আমাদের আজকের ধারণাই জনমনে চাপিয়ে দেওয়া হয়– আরোপ করা হয় ভিন্ন এক দেশে- কালের উপর। অর্থাৎ অতীতকে বিচার করা হয় বর্তমানের অগ্রসর ধারণা নিয়ে। হাজার বছর আগে অবধি এই ভূভাগ বিভক্ত ছিল ছোট ছোট রাজ্যে-জনপদ রাজ্যে।

অনেকগুলো ছিল জনপদ রাজ্য। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের আগে আজকের বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না (সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ, আহমদ শরীফ)।

এই অঞ্চলে তৎকালীন সামন্ত রাজ্যের মধ্যে ছিল অধুনা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে চাকমা রাজ্য; বর্তমান ত্রিপুরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য; বর্তমান মেঘালয়সহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিয়দংশ নিয়ে গারো রাজ্য, সুসং রাজ্য ইত্যাদি। কালের আবর্তে সেইসব সামন্ত রাজ্যের অবসান হলেও এখনো ইতিহাসের সাী রয়েছে সেসব অঞ্চলে। কুমিল্লার রাণী কুটির, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোগড়া গ্রামের নিকটে 'গঙ্গাসাগর' নামে দীঘি এখনো ত্রিপুরা মহারাজার সাক্ষ্য বহন করে। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষাবধি পর্যন্ত গারো, হাজং, বানাই ইত্যাদি আদিবাসী অধ্যুষিত শেরপুর, শ্রীবর্দী, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা এই ছয়টি অঞ্চলকে 'আংশিক শাসন-বহির্ভূত এলাকা' এবং হাজংদের টংক বিদ্রোহ ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে জ্বলজ্বল করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা বাঙালীদের পরে এদেশে এসেছে বলে দীপু মণি যে অভিমত তুলে ধরেন, তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর চরম অজ্ঞতারই বহিপ্রকাশ ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ প্রাক-উপনিবেশিক আমলে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা তৎকালীন চাকমা রাজ্য বাংলারই কোন অংশ ছিল না। সেসময় বর্তমান চট্টগ্রামের অধিকাংশ অঞ্চলসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল একটি স্বাধীন সামন্ত রাজ্য। ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে Joa de Barros নামের এক পর্তুগীজ মানচিত্রকরের আঁকা একটি মানচিত্র থেকে তৎকালীন 'চাকোমাস' বা চাকমা রাজ্যের সুস্পষ্ট অবস্থান সম্পর্কে প্রমাণ মিলে। এ মানচিত্রে চাকমা রাজ্যের সীমানা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে- উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাম্রে বা নাফ নদী, পূর্বে লুসাই হিলস এবং পশ্চিমে সমুদ্র। এ থেকে বুঝা যায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য কত অন্তসার শূন্য।

সরকারী নথি থেকে আদিবাসী শব্দটি তুলে দেয়ার নেতিবাচক সিদ্ধান্ত

গত ২৯ জুলাই ২০১১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় সরকারের সব আইন, নীতি, দলিল ও প্রকাশনা বিবৃতি থেকে আদিবাসী শব্দটি বিলোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এমনকি সব পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম থেকে আদিবাসী শব্দটি তুলে দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে 'আদিবাসী উন্নয়ন' নামে কোন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ বা এনজিও প্রকল্প থাকলে সেটি গ্রহণ না করে 'ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন' নামে প্রকল্প গ্রহণ করতে উক্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে জানা যায়।

উক্ত আন্ত:মন্ত্রণালয়ের সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সেনা সদর এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আন্ত:মন্ত্রণালয়ের সভায় গৃহীত উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও তাদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং এধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তজ্জন্যে যে কোন পরিস্থিতির জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে বলে তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১০ম অধিবেশন
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার উপর অর্ধদিবস সভা অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত এর ৯ম অধিবেশনে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এলক্ষ্যে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্য মি. লারস্ এন্ডারস্ বায়েরকে স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর মি. বায়ের ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সফরে আসেন। এই সময় তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মি. লারস্ এন্ডারস্ বায়ের তাঁর সমীক্ষা প্রতিবেদন গত ১৬-২৭ মে ২০১১ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১০ম অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। তাঁর উপস্থাপিত প্রতিবেদনের জন্য ১০ম অধিবেশনের সময় ২৫ মে ২০১১ অর্ধ-দিবস সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী ফোরামের এবারের ১০ম অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা ও কাপেং ফাউন্ডেশনের সহ সাধারণ সম্পাদক লিনা জেসমিন লুসাই অংশগ্রহণ করেন।

মি. বায়ের তাঁর সমীক্ষায় উল্লেখ করেন যে, "পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১৩ (তের) বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় এটি আজ সুস্পষ্ট যে, চুক্তির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারা এখনও অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে অথবা শুধুমাত্র আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবাস্তবায়িত বা আংশিক বাস্তবায়িত এসব বিষয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- আদিবাসী প্রধান পরিষদগুলোসহ রাজা, হেডম্যান, কার্বারীদের প্রথাগত প্রশাসন এবং পার্বত্য অঞ্চলের বেসামরিক প্রশাসনকে যথাযথভাবে কার্যকর ও ক্ষমতায়িত করা; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং আদিবাসীদের বেদখল হয়ে যাওয়া ভূমি তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া প্রভৃতি।"

সমীক্ষায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, "বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হবে এমন প্রত্যাশা নতুনভাবে সঞ্চারিত হয়। কারণ এই সরকার তার নির্বাচনী ইস্তেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা এবং চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ইতিবাচক অভিপ্রায় সম্পর্কে অব্যাহত প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা সত্ত্বেও চুক্তির অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ধারা এখনও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে মি. বায়ের বলেন, "বর্তমানে সরকার পরিচালনাকারী রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্বের পরিধিও ছাড়িয়ে গেছে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো ব্যাপকভাবে সামরিকায়িত একটি অঞ্চল আর ঐ অঞ্চলে সামরিক বাহিনী বেসামরিক বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করছে বলে অব্যাহত ও ধারাবাহিক অভিযোগ রয়েছে। 'অপারেশন উত্তরণ' সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করেছে। ...বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনী একটি অন্যতম ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান। ...সুতরাং এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সাধারণভাবে বাংলাদেশের সমাজ এবং বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর সেনাবাহিনীর রয়েছে পরিব্যাপ্ত অসীম ক্ষমতা ও প্রভাব। আর এই ব্যাপক ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যে কোন মৌলিক অগ্রগতির ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে।"

বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক কোন অগ্রগতি না হওয়ায় ঐ অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের মনে ক্রমবর্ধমান হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ঘনীভূত হচ্ছে। চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা বা রাজনৈতিক সামর্থ্যের উপর আদিবাসীদের আস্থা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হচ্ছে। সরকারের কিছু কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপ আদিবাসীদের এই হতাশা ও আস্থাহীনতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেসব কর্মকাণ্ড বা পদক্ষেপ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সরাসরি লংঘন করেছে অর্থাৎ চুক্তির যে অভিপ্রায় ও লক্ষ্য তার পরিপন্থী।"

সমীক্ষায় মি. বায়ের জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম ও শান্তিরক্ষী মিশন, বাংলাদেশ সরকার, অন্যান্য প্রভাবক পক্ষগুলোর প্রতি কতিপয় সুপারিশ পেশ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা ঘোষণা করা, ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করা, সেনা কর্তৃত্ব কমিয়ে আনা ও অস্থায়ী ক্যাম্প

প্রত্যাহার করা, পার্বত্য অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দায়মুক্তির যে ধারা অব্যাহত আছে তা বন্ধ করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করা, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনের অংশগ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার রেকর্ড কঠোরভাবে পরিবীক্ষণ ও খতিয়ে দেখার জন্য একটি যুৎসই ব্যবস্থা ও কৌশল গড়ে তোলা ইত্যাদি অন্যতম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার উপর ২৫ মে অনুষ্ঠিত সভায় মি. বায়ের তাঁর সমীক্ষা উপস্থাপনের পর পরই জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী ইকবাল আহমেদ বলেন যে, বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। যারা আছে তারা হচ্ছে ট্রাইবাল। ইকবাল আহমেদ আরো বলেন, আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিষয়ে আলোচনার কোন আইনগত ভিত্তি নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আদিবাসী বিষয়ে আলোচনার কোন ক্ষেত্র নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিষয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট না করে বিশ্বের কোটি কোটি আদিবাসীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময় দেয়ার জন্য স্থায়ী ফোরামকে আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সরকারের ফার্স্ট সেক্রেটারীর বক্তব্যের পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি মঙ্গল কুমার চাকমাকে বলার সুযোগ দেয়া হয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে মি. বায়ের সমীক্ষা প্রতিবেদনকে যথাযথ ও বস্তুনিষ্ঠ অভিহিত করে সমর্থন প্রদান করেন এবং সমীক্ষায় উল্লেখিত সুপারিশমালা গ্রহণের জন্য স্থায়ী ফোরামের নিকট আবেদন জানান। তিনি বর্তমান মহাজোট সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে গড়িমসি করার চিত্র তুলে ধরেন।

এরপর ডেনমার্ক সরকারের প্রতিনিধি স্টিন হেনসন বলেন, ডেনমার্ক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে দীর্ঘদিনের অংশীদারী। তিনি সমীয় উপস্থাপিত মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যতই দেরী হবে ততই সেখানে অস্থিরতা দেখা দেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

গুতেয়েমালা সরকারের প্রতিনিধি কানি তারাসেনা সেকাইরা বলেন, তাঁর দেশেও আদিবাসীদের একই ধরনের সমস্যা বিদ্যমান বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা বিষয়েও তাঁর সরকার খুবই আগ্রহের সাথে অবলোকন করছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে অবদান রাখছে, কাজেই তারই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের সমাধান করা উচিত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

কাপেং ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পক্ষে লিনা জেসমিন লুসাই বাংলাদেশ সরকারের ফার্স্ট সেক্রেটারীর "বাংলাদেশে আদিবাসী নেই" বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আমরা আদিবাসী। আদিবাসী পরিচয় ব্যতীত উপর থেকে চাপিয়ে অন্য পরিচয় আমরা গ্রহণ করবো না।"

মি. বায়েরের সমীক্ষা প্রতিবেদনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আরো বক্তব্য করেন আন্তর্জাতিক ইন্ডিয়ান ট্রিটি কাউন্সিলের আন্দ্রেয়া কারমেন, এশীয় আদিবাসী কোকাসের রুক্কা সোম্বোলিঙ্গী, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি ইউ কে জেন, বিশ্ব আদিবাসী নারী কোকাসের তারসিলা রিভারা জেয়া, সামি কাউন্সিলের নিকো ভালকেপা, এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল ও ইবগিয়ার এন্ড্রো এরোইটি, দক্ষিণ আমেরিকা আদিবাসী কোকাসের সেলেস্ট এমকাই, স্থায়ী ফোরামের সদস্য রাজা দেবাশীষ রায়, ডালি সম্বো দোরৌগ ও সউল ভিনসেনটে ভাসকোয়েজ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ওয়াসফিয়া নাসরিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

পরিশেষে স্থায়ী ফোরামের চেয়ারপার্সন মির্না কানিংহাম বলেন, স্থায়ী ফোরাম বরাবরই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। এই প্রক্রিয়া দেশে গিয়েও অব্যাহত রাখা দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

পূর্বের সকল সরকারের মতো এবারেও সরকারের প্রতিনিধির বিভ্রান্তিকর ও নেতিবাচক বক্তব্যে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ আদিবাসী, সরকারী ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। সরকারী প্রতিনিধির এ ধরনের বক্তব্য সরকারের কূটনৈতিক অদক্ষতারই বহিপ্রকাশ বলে অনেকে মন্তব্য করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের প্রতিনিধির বক্তব্যও হাস্যকর। তাঁর বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন হতে না পারার অন্যান্যের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো বর্তমানে পরিষদগুলোতে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা নাকি পদ ছাড়তে চায় না। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতার অভাব ও সভায় অনুপস্থিতির কারণে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কাজ করতে পারছে না। প্রচলিত আইনের সাথে সাংঘর্ষিকতার কারণে চুক্তি অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে উপ-পরিদর্শক ও তৎনিম্ন পুলিশ সদস্যদের নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে মামুলি অজুহাত তুলে ধরেন। স্থায়ী ফোরামের সদস্য রাজা দেবাশীষ রায় তাঁর বক্তব্যে ভূমি কমিশন সম্পর্কে ফার্স্ট সেক্রেটারীর বক্তব্যের খন্ডন করে বলেন, ভূমি কমিশনের অন্যতম

সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন সার্কেল চীফদের পাশ কাটিয়ে ভূমি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যানের এতকরফা ও অগণতান্ত্রিক কার্যাবলীর কারণে ভূমি কমিশনের কাজ স্থবির হয়ে আছে। তিনি বলেন, ভূমি কমিশনের কাজ হলো ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা; কিন্তু কমিশনের চেয়ারম্যান এখতিয়ার ভূক্ত নয় এমন ভূমি জরিপের ঘোষণা দিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন বিষয়ে বলতে গিয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারী জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেয়ার চেষ্টা করেন এই বলে যে, ইউএনডিপি'র ৪১৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৩% কেবলমাত্র চাকমাদের টার্গেট করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সালে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা ছিল সেখানে এখন ১,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে। অনুরূপভাবে যেখানে ১৯৭১ সালে যথাক্রমে ১৭ ও ৩টি স্কুল ও কলেজ ছিল সেখানে বর্তমানে যথাক্রমে ৯৭৩ ও ১৭টিতে উন্নীত হয়েছে। সে কারণে শিক্ষার হার ৭-৮% থেকে বর্তমানে ৩৯% উন্নীত হয়েছে বলে তিনি সাফাই গেয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর সংবাদ সম্মেলন

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১০ম অধিবেশন চলাকালে ২৪ মে ২০১১ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় জাতিসংঘের সদর দপ্তরের প্রেস সেন্টারে ইন্টারন্যাশনাল জুম্ম অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মলনে ইন্টারন্যাশনাল জুম্ম অর্গানাইজেশনের সভাপতি আদিত্য কুমার দেওয়ান মূল বক্তব্য প্রদান করেন। আরো বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর সমীক্ষা পরিচালনাকারী স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র মি. লারস-এন্ডার্স বায়ের এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের নবনিযুক্ত সদস্য এলসা স্টামাটোপলো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে সমাবেশ

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১০ম অধিবেশন চলাকালে ২৪ মে ২০১১ দুপুর ১.০০ ঘটিকায় জাতিসংঘের সদর দপ্তরের বাইরে Dag Hammarskjold Plaza-এর মাঠে ইন্টারন্যাশনাল জুম্ম অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে সংগঠনের সভাপতি আদিত্য কুমার দেওয়ানের সঞ্চালনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নিউইয়র্কে অবস্থানরত জুম্মরা, স্থায়ী ফোরামের ১০ম অধিবেশনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দসহ প্রায় ১০০ জনের মতো লোক অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে স্থায়ী ফোরামের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন ভিক্টোরিয়া টাউলি কর্পুজ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ড. ডিনা সিদ্দিকী, কাপেং ফাউন্ডেশনের সহ সাধারণ সম্পাদক লিনা জেসমিন লুসাই, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মকর্তা কীর্তি রঞ্জন চাকমা, কানাডার পিস এন্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশনের চেয়ারম্যান উইলি লিটলচাইল্ড, ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ট্রিটি কাউন্সিলের পরিচালক আন্দ্রেয়া কারমেন, সামি কাউন্সিলের সভাপতি মাটিয়াস এহরেন, ইফগিয়ার পরিচালক লোলা গার্সিয়া এ্যলিক, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির মংসানু ও কেনিয়ার এল-মোলো উইমেন্স গ্রুপের সাইটি লোউয়া সংহতি বক্তব্য প্রদান করেন।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্বিক পরিস্থিতির তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ফলে পূর্বের মতো সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশুদের উপর যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, সহিংসতা ও হত্যা ইত্যাদি মধ্যযুগীয় পাশবিকতা অব্যাহতভাবে চলছে। আর এসব মানবতা-বিরোধী অপরাধে জড়িত সেটেলার বাঙালীদের বরাবরই দেশের প্রশাসন নানাভাবে সহায়তা দিয়ে অপরাধ থেকে দায়মুক্তি দিয়ে চলেছে। ২০১০ সালের নভেম্বর থেকে ২০১১ সালের অক্টোবর এই এক বছরের মধ্যে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছে ৪ জন জুম্ম নারী, ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৭ জন এবং যৌন হয়রানির (ধর্ষণের প্রচেষ্টার) শিকার হয়েছে ৬ জন জুম্ম নারী ও শিশু। নিম্নে তার বিবরণ দেয়া গেল-

৪ জুম্ম নারী যৌন হয়রানির শিকার

গত ৫ নভেম্বর ২০১০ বিকাল আনুমানিক ৩ টায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলা সদরের কবাখালি এলাকায় একদল সেটেলার যুবক কর্তৃক ৪ জুম্ম নারী যৌন হয়রানির শিকার হন। জানা যায়, কবাখালি হেডম্যান পাড়া এলাকার ঐ জুম্ম নারীরা বুনো ফলমূল ও শাক-শবজি সংগ্রহ করতে ঐদিন পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে তারা যখন রস্যামনি কার্বারী পাড়া এলাকায় পৌছেন, হঠাৎ এক দল সেটেলার বাঙালী সেখানে উপস্থিত হয়ে জুম্ম নারীদের আঁকড়ে ধরে। এতে জুম্ম নারীরা চিৎকার করলে পার্শ্ববর্তী আনসার ক্যাম্পের একদল সদস্য সেখানে ছুটে আসেন এবং হাতেনাতে দুই সেটেলার যুবককে আটক করেন। বখাটে ঐ দুই যুবক হল- (১) মোঃ সোহাগ (২৭) পিতা- আব্দুল কাশেম, গ্রাম- আমবাগান ও (২) মোঃ নাজিম উদ্দিন (২২) পিতা- আব্দুল মালেক, গ্রাম- আলী নগর। পরে এই দুই বখাটে যুবককে দীঘিনালা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় এক জুম্ম কিশোরীর লাশ উদ্ধার

গত ১৫ নভেম্বর ২০১০ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার দোলিয়া মৌজার ব্রজেন্দ্র কার্বারী পাড়া এলাকায় খোশমতি ত্রিপুরা (১৪) পীং- শান্ত কুমার ত্রিপুরা নামের এক জুম্ম কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। গত ২২ নভেম্বর ২০১০ নিজ বাড়ীরই পার্শ্ববর্তী এক জঙ্গল থেকে এই কিশোরীর বিকৃত লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ লাশটি গত ২৩ নভেম্বর ২০১০ খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে। জানা যায়, গত ১৫ নভেম্বর ২০১০ নিজ বাড়ীরই পার্শ্ববর্তী ধান ক্ষেতে কাজ করতে গেলে এরপর থেকে খোশমতি ত্রিপুরা নিখোঁজ হয়। পুলিশ এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে মাটিরাঙ্গা উপজেলার পলাশপুর গ্রামের মোঃ বাবলু, মোঃ শফিক ও মোঃ জাফর এবং আদর্শ গ্রামের ছোটো আলী নামের চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

বরকলে বাঙালী সেটেলার কর্তৃক ১৩ বছরের এক জুম্ম শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা

২৪ জানুয়ারি ২০১১ রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন ৪ নং ভূষণছড়া ইউনিয়নে ইদ্রিস আলী (৩৫) পীং- মৃত দাউদ মিয়া, গ্রাম- এরাবুনিয়া-গোরস্থান এলাকা নামের এক বাঙালী সেটেলার একই ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বৈরাগী পাড়া গ্রামের ভারত কুমার চাকমার ১৩ বছরের এক মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

জানা যায়, ঐ দিন বিকাল প্রায় ৫:৩০ টায় উক্ত কিশোরী তার ১০ বছরের ছোট বোনসহ বাড়ীতে অবস্থান করছিল এবং ভাত রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন তাদের বাবা মাছ ধরার কাজে ও মা পানি আনতে বাইরে অবস্থান করছিল। এমন সময় উক্ত ইদ্রিস কিশোরীর বাড়ীতে আসে এবং অনুমতি ব্যতিরেকে মোবাইলে ঐ কিশোরীর ছবি তোলে এবং ছবিটি দেখানোর নাম করে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করে। বাড়ীতে প্রবেশের সাথে সাথে মুখ চেপে ধরে কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। সাথে সাথে কিশোরী ও তার বোন চিৎকার করতে শুরু করে। ইদ্রিস আলী ভয় পেয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়। অবশেষে কিশোরী ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়, কিন্তু গায়ে পরে থাকা তার জামা-কাপড় ছিঁড়ে যায়। উল্লেখ্য যে, ধর্ষণের চেষ্টার শিকার কিশোরীদের বাড়ীর পাশেই অবস্থিত ইদ্রিসের বড় ভাই কুদ্দুসের মালিকানাধীন তামাক ক্ষেত যেখানে ইদ্রিশ প্রায়ই আসা-যাওয়া করত। ২৫ জানুয়ারি ২০১১ এ ব্যাপারে বরকল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বাদী যৌন হয়রানির শিকার কিশোরী নিজে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ১০ নং ধারায় ২৫/০১/২০১১ তারিখ বরকল থানা মামলা (নং ০২) দায়ের করেন।

খাগড়াছড়িতে একদল সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এক আদিবাসী গৃহবধু ধর্ষণের শিকার

গত ২৬ জানুয়ারি ২০১১ মধ্যরাতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তাইন্দং ইউনিয়নের পোড়াবাড়ী গ্রামে

একদল সেটেলার বাঙালী কর্তৃক ৪ সন্তানের জননী এক আদিবাসী গৃহবধু ধর্ষণের শিকার হয়। জানা যায়, ঐ দিন রাত ২ টায় তাইন্দং ইউনিয়নের মুসলিম পাড়া গ্রাম থেকে সুরুজ মিয়া, বাবুল মিয়া ও বাবুলের ছোট ভাইয়ের নেতৃত্বে ৮/১০ জনের সেটেলার বাঙালীদের একটি দল পোড়াবাড়ী গ্রামস্থ নিত্যরঞ্জন ত্রিপুরার বাড়ীতে ডাকাতি করতে যায়। ডাকাতি হতে যাচ্ছে জানতে পেরে নিত্যরঞ্জন চিৎকার শুরু করে। কিন্তু ডাকাতরা দ্রুত বাড়ীতে ঢুকে নিত্যরঞ্জনকে বাড়ীর এক কোণে বেঁধে রাখে এবং তার সামনেই তার স্ত্রীকে উক্ত সেটেলার বাঙালীরা একের পর এক ধর্ষণ করে। এরপর এই দুষ্কৃতিকারীরা ভূমির দলিলপত্রসহ নগদ ১৬ হাজার টাকা, সোনার চেইন ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়।

জানা যায়, এরপর সেটেলার বাঙালীরা উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হুমকি দিয়ে বলছে যে, যদি তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয় তাহলে পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলা হবে। হুমকি সত্ত্বেও গত ২৮ জানুয়ারি ২০১১ দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে মাটিরাঙ্গা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ (সংশোধন) এর ৯/৩ ধারাসহ ৩৯৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং-০৫, তারিখঃ ২৮/০১/২০১১খ্রিঃ। দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার বা শাস্তির মুখোমুখি করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

নাইংছড়িতে বাঙালী সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ বান্দরবান জেলার নাইংছড়ি উপজেলাধীন দোছড়ি ইউনিয়নের শিলঝিরি ত্রিপুরা পাড়ায় দুই বাঙালী সেটেলার কর্তৃক ২২ বছরের এক ত্রিপুরা গৃহবধুকে ধর্ষণের শিকার হয়। মারাত্মক আহত অবস্থায় ধর্ষিতাকে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, ঐ দিন সকাল বেলায় উক্ত ত্রিপুরা গৃহবধুর স্বামীর ছোট ভাই কনারাম ত্রিপুরা (৮)কে নিয়ে তাদের বাড়ী থেকে ৩ কিলোমিটার দূরবর্তী ক্ষেতে যায়। ক্ষেতে কাজ করার সময়, সকাল প্রায় ১০:৩০ টায় ৫ বাঙালী সেটেলার সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং তাকে গণধর্ষণে উদ্দেশে ঘিরে ধরে। এতে তিনি চিৎকার করতে শুরু করে। পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন ধর্ষণে সক্ষম হলেও চিৎকারের শব্দ শুনে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী সেখানে ছুটে আসতে দেখে বাঙালী সেটেলাররা দ্রুত পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য, উক্ত ঘটনার শিকার গৃহবধু চিৎকার শুরু করলে ধর্ষণকারীরা ধারালো দা দিয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসীদের আসতে দেখে তারা পালায়। ধর্ষিতা ডান হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়।

ধর্ষণকারী দুই জনের মধ্যে একজনের পরিচয় হচ্ছে মোঃ দিলদার (৩৫) পীং- মোঃ ইসলাম, সাং- বড়বিল এলাকা, রামু উপজেলা, কক্সবাজার জেলা। উক্ত গৃহবধুর স্বামী হরিরাম ত্রিপুরা অভিযোগ করলেও ধর্ষণকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছে বলে জানা যায়নি।

চট্টগ্রামে বেড়াতে গিয়ে এক আদিবাসী ছাত্রী ধর্ষণের শিকার

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ পার্বত্য জেলা বান্দরবান থেকে চাচার সাথে চট্টগ্রামে বেড়াতে গিয়ে এক আবাসিক হোটেলে রাত্রী যাপনকালে ১৪ বছর বয়সী আদিবাসী মারমা এক স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণের শিকার ছাত্রীটি নবম শ্রেণীর ছাত্রী এবং বান্দরবান সদরস্থ ওয়াব্রে পাড়ার অধিবাসী ম্রা থোয়াই উ-এর মেয়ে।

জানা যায়, ঐ দিন ঐ ছাত্রী তার চাচার সঙ্গে চট্টগ্রামে বেড়াতে যায়। কিন্তু সেদিন বান্দরবানে ফেরার কোন বাস না পাওয়ায় তারা চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট মোড়ের ডায়মন্ড হোটেলে একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে রাত্রী যাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাত দুইটার দিকে হোটেলের মালিক ও ব্যবস্থাপক তাদের কক্ষে ঢুকে তাদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার কেড়ে নেয়। এরপর ছাত্রীর চাচার মুখ ও চোখ বেঁধে রেখে উক্ত হোটেলের মালিক ও ব্যবস্থাপক পর্যায়ক্রমে ছাত্রীটিকে ধর্ষণ করে। পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সকালে দুস্কৃতিকারীদের কাছ থেকে নিঃস্ব অবস্থায় ছাড়া পেলে মেয়েটির চাচা পরিচিত লোকদের ফোন করে বিষয়টি জানায়। পরিচিত লোকজন আহত ছাত্রীটিকে বান্দরবানে পাঠালে অভিভাবকরা তাকে বান্দরবান হাসপাতালে ভর্তি করান।

মানিকছড়িতে বাঙালী সেটেলারদের কর্তৃক ধর্ষণের পর হত্যার শিকার এক আদিবাসী গৃহবধু

গত ২৫ মার্চ ২০১১ রাতের বেলায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার মহামুনি এলাকায় একদল সেটেলার বাঙালী মিসেস নাউবাই মারমা (২৮) স্বামী- সুইচাপ্রু মারমা নামের এক আদিবাসী গৃহবধুকে নিজ বাড়ীতে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। ঘটনার সময় নাউবাই এর স্বামী বাড়ীতে ছিলেন না। মৃত নাউবাই মারমার দিনমজুর স্বামী এ ব্যাপারে মানিকছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে মোঃ সেলিম, সাহাবুদ্দিন ও ফিরোজ নামের তিনজনকে গ্রেফতার করে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে এক জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার

গত ১০ এপ্রিল ২০১১ রাতের বেলায় বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন বাইশারি ইউনিয়নের ৮ নং পিএইচপি রাবার প্লান্টেশন ক্যাম্পে একদল ডাকাত কর্তৃক এক জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার হয়। জানা যায়, ১২-১৪ জনের ডাকাত দলটি রাবার প্লান্টেশন ক্যাম্পে সংঘবদ্ধ হয়ে ডাকাতি করতে এসে এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটায় এবং রাবার ক্যাম্প থেকে প্রায় ২ লক্ষ টাকার রাবার, একটি মোবাইল ফোন ও কিছু নগদ টাকা নিয়ে যায়। ডাকাতরা রাবার ক্যাম্পের নৈশ প্রহরী মোঃ হোসেন, মসজিদের ইমাম মোঃ হাশেম ও অন্য চারজনকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে জুম্ম নারীটিকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় দোষী কেউ গ্রেফতার হয়েছে বলে জানা যায়নি।

দীঘিনালায় সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক এক জুম্ম নারী শিশু ধর্ষণের পর হত্যার শিকার

গত ১২ মে ২০১১ রাতে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন বোয়ালখালী ইউনিয়নে মৃত নম চাকমার মেয়ে সুনিকা চাকমা ওরফে মিলেস' নামের ১১ বছরের এক জুম্ম নারী শিশু ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়। ঘটনার কোন প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলেও, এর পূর্বাপর ঘটনাবলীর আলোকে তির শিকার নারী শিশুর মায়ের অভিযোগ, পার্শ্ববর্তী বাঙালী সেটেলার মোঃ কাসেমসহ একদল দুষ্কৃতিকারীই এই বর্বর ঘটনা ঘটায়। উল্লেখ্য, ধর্ষণ ও হত্যার শিকার সুনিকা চাকমা কামোখ্যা ছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী।

জানা যায়, ঐদিন রাত প্রায় ৮:০০ টায় মা কল্পনা চাকমা ও মেয়ে সুনিকা চাকমা রাতের খাবার শেষ করে বাড়ীতেই বসেছিল। এ সময় প্রতিবেশী গ্রাম থেকে রাঙাচান চাকমা তাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসে। এরপর রাঙাচান চাকমা সুনিকা চাকমাকে পার্শ্ববর্তী শফির দোকানে সিগারেট আনতে পাঠায়। দীর্ঘক্ষণ পরও সুনিকা ফিরে না আসায় মা কল্পনা উদ্বিগ্ন হয়ে শফির দোকানে যায় এবং সেখানে উপস্থিত বাঙালীদের তার মেয়ে সুনিকাকে দেখেছে কিনা জানতে চায়। বাঙালীরা দেখেনি বলে জানায়। এরপর সে পার্শ্ববর্তী জনৈক হ্যাপির বাবার কাছে তাদের বাড়ীতে গিয়ে তার মেয়ের খবর জানতে চায়। হ্যাপির বাবা শফির দোকান থেকে ফিরতে সুনিকাকে দেখেছে বলে জানায়। এরপর সুনিকার মা কল্পনা বাড়ীতে ফিরে আসে। কিন্তু মেয়েটি তার আর ফিরে আসেনি। পরদিন ১৩ মে ২০১১ সকালে প্রতিবেশীরা বাসা থেকে প্রায় ২৫০ গজ দূরে পার্শ্ববর্তী বনে ঐ কিশোরীর লাশ দেখতে পেলে তারা পুলিশে ও মৃতের আত্মীয়দের খবর দেয়। এরপর সকাল প্রায় ৯ টায় পুলিশ বাঙালী সেটেলার এলাকা জিয়ানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে নগ্ন অবস্থায় সুনিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তে লাশের শরীরে সুস্পষ্টভাবে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়, যাতে ধর্ষণের পর হত্যার আলামত খুঁজে পাওয়া যায়।

সুনিকার মা কল্পনা চাকমার ভাষ্য মতে, জিয়ানগর এলাকার মোঃ কাসেম পীং- আলী আজম প্রায়ই তার মেয়েকে উত্যক্ত করত। এর পূর্বে ১৪ এপ্রিল ২০১১ মোঃ কাসেম জোরপূর্বক বাড়ীতে ঢুকে মেয়ে সুনিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তখন জুম্ম ও বাঙালী উভয় মুরুব্বীদের মধ্যস্থতায় তা মীমাংসা করা হয়। তিনি আরও বলেন, প্রায় প্রতিদিন তাদের বাড়ীর উঠোনে ও পার্শ্ববর্তী গাছের তলায় এসে জিয়ানগরের কাসেম, জাকির, বাত্যা জাকির, জামাল্যা, শহীদ ও ইলিয়াসহ অনেক বাঙালী যুবক জুয়া খেলত অথবা মদ খেত। ঘটনার দিনও মোঃ কাসেমসহ কয়েকজন তাদের বাড়ীর উঠোনে গাছের তলায় সন্ধ্যা প্রায় ৭:০০ টা পর্যন্ত জুয়াখেলা খেলেছিল। কল্পনা চাকমা অভিযোগ করে বলেন, কাসেম ও তার সঙ্গীরাই তার মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে।

জানা যায়, কল্পনা চাকমার বাড়ী ও শফির দোকানের মধ্যস্থলে সুনিকার রক্তাক্ত জামাকাপড় এবং মদের বোতল, সিগারেট, চকোলেট ও ভাঙা টর্চলাইটের অংশ পাওয়া যায়। ১৩ মে ২০১১ কল্পনা চাকমা এ ব্যাপারে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ এর ৯(৩)/৩৪ ধারায় কাসেম ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দীঘিনালা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। তবে দোষীদের কেউ গ্রেফতার বা দৃষ্টান্তমূলক কোন শাস্তি ভোগ করেছেন বলে জানা যায়নি।

লংগদুতে এক আদিবাসী স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের শিকার

গত ১৫ জুন ২০১১ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন ১নং আটরকছড়া ইউনিয়নের বড় উল্টাছড়ি গ্রামের অধিবাসী সাধন বিকাশ চাকমার ১৩ বছর বয়সী কন্যা একই ইউনিয়নের উত্তর ইয়ারেংছড়ি এলাকায় অবস্থানকারী ইব্রাহিম (৩২) নামের এক দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষিতা স্থানীয় এক উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। ইব্রাহিম এর পিতার নাম সন্তোষ বিশ্বাস, সে হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং বর্তমানে ১নং আটরকছড়া ইউনিয়নের উত্তর ইয়ারেংছড়ি এলাকায় তার শশুর তাজুল ইসলামের বাসায় বসবাস করছিল। পরে ধর্ষণকারী ইব্রাহিম গ্রেফতার হয়।

জানা যায়, ঐদিন বিকাল ২ টায় বৃষ্টি পড়ছিল। এমন সময় উক্ত ইব্রাহিম হঠাৎ করে উক্ত স্কুল ছাত্রীর বাসায় প্রবেশ করে। এসময় ছাত্রীর সাথে ছিল তার চেয়ে ছোট আরও দুই শিশু, বাবা-মা উভয়ই বাইরে অবস্থান করছিল। ইব্রাহিম যখন দেখল যে ছাত্রীটি প্রায় একা, তখন সে জোর করে ওড়না দিয়ে মুখ ও হাত বেঁধে ছাত্রীটিকে পার্শ্ববর্তী কলাবাগানে নিয়ে যায় এবং

সেখানে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ইতোমধ্যে ছাত্রীটির সাথে থাকা ছোট শিশুরা চিৎকার জুড়ে দিলে পার্শ্ববর্তী জুম্মরা ছাত্রীটির বাসায় ছুটে আসে। তারপর শিশুদের কথামত ছাত্রীটিকে অনুসরণ করে খুঁজতে শুরু বের হয়। খোঁজার এক পর্যায়ে তারা ছাত্রীটিকে হতাশ, ক্রন্দনরত ও শায়িত অবস্থায় খুঁজে পায়।

ধর্ষিতার কথা অনুযায়ী জুম্ম গ্রামবাসীরা বাঙালী সেটেলার অধ্যুষিত উত্তর ইয়ারেংছড়ি গ্রামে যায় এবং গ্রামের ইউপি সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে। আলোচনার এক পর্যায়ে দুষ্কৃতিকারী ইব্রাহিমকে চিহ্নিত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বাঙালীদের সহযোগিতায় তাকে আটক করা হয়। সাথে সাথে বিষয়টি স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে খবর দেয়া হয়। এরপর সেনাবাহিনী দুষ্কৃতিকারীকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে কয়েক ঘন্টা আটকে রাখে এবং পরে পুলিশের হাতে হস্তান্তর করে। জানা যায়, ঐদিন রাতে ধর্ষিতা ও ধর্ষণকারীকে পুলিশী হেফাজতে রেখে ১৬ জুন ২০১১ সকাল বেলায় এস আই মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ ছাত্রীটিকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ও ধর্ষণকারী ইব্রাহিমকে আদালতের সামনে হাজির করানোর জন্য রাঙ্গামাটি সদরে নিয়ে যায়।

লামায় ১ আদিবাসী কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৫ জুলাই ২০১১ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় আলমগীর (২০) পীং- নুরুন্নবী, সাং- ঢেকিছড়া রাঙাঝিরি পাড়া, সরই ইউনিয়ন নামের জনৈক বাঙালী সেটেলার ১৩ বছর বয়সী এক আদিবাসী ম্রো কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। কিশোরী পিতার নাম ডনরই ম্রো। জানা যায়, দুষ্কৃতিকারী আলমগীরের পিতা উল্টো তার ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে বলে লামা থানায় জিডি করে।

রাঙ্গামাটির কাউখালীতে এক সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এক জুম্ম তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২৫ জুলাই ২০১১ রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলাধীন শামুক্যা এলাকায় কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার পথে মংসি মারমার ১৮ বছর বয়সী এক আদিবাসী মারমা তরুণী জাকির হোসেন চৌধুরী পীং- আব্দুস সাত্তার, সাং- ঘিলেছড়ি এলাকা নামের জনৈক বাঙালী সেটেলার কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়। জানা যায়, দুপুর প্রায় ১:০০ টায় কাউখালী কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রী উক্ত ঘটনার শিকার আদিবাসী মারমা তরুণী যখন কলেজ থেকে বাড়ী ফেরা পথে ঘিলাছড়ি আদর্শ গ্রাম এলাকায় পৌঁছে, তখন তাকে একা পেয়ে জাকির হোসেন জড়িয়ে ধরে এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে। সাথে সাথে তিনি চিৎকার শুরু করলে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ দ্রুত সেখানে ছুটে আসে এবং দুষ্কৃতিকারী জাকিরকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এ ব্যাপারে জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে কাউখালী থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানা যায়।

বাঘাইছড়িতে এক জুম্ম স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের শিকার

গত ২৭ জুলাই ২০১১, সকাল ১১:৩০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার রূপকারী ইউনিয়নে ভক্তপাড়া এলাকায় কৃপাসিন্ধু চাকমার মেয়ে ১৩ বছর বয়সী আদিবাসী এক জুম্ম কিশোরী বড়াদম এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মজিদ (৩০) পীং- মৃত আবুল হোসেন গাজী নামের এক বাঙালী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। লংগদু উপজেলার ভেইবোন ছড়া গ্রাম থেকে সে বর্তমানে বাঘাইছড়িতে আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে তুলাবান হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে লেখাপড়া করছে। জানা যায়, কিশোরীটি ঐদিন স্কুলে যাওয়ার প্রাক্কালে হঠাৎ উপরোক্ত ধর্ষক বাড়ীতে উপস্থিত হলে কিশোরীকে একা পেয়ে এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়। জানা গেছে, এলাকাবাসীর প্রতিবাদের মুখে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ২৮ জুলাই ২০১১ সকাল বেলায় ধর্ষণকারীকে গ্রেফতার করে রাঙামাটি কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

বান্দরবানের লামায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এক শিশুসহ ৩ জুম্ম খুন, এক নারীকে অপহরণের চেষ্টা

গত ৩০ জুলাই ২০১১ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা সদরের মুসলীম পাড়ার আবু মুসা পীং- শাহজাহান নামের জনৈক বাঙালী সেটেলার কর্তৃক একই উপজেলার রূপসী ইউনিয়নের সিলেতোয়া গ্রামের বাসিন্দা একই পরিবারের ১ শিশুসহ ৩ জুম্ম খুন। হত্যার শিকার ৩ জুম্ম হল- (১) মিঃ অংচাউ মারমা, ৭০, (২) মিসেস হ্লা পোয়াং প্রু মারমা, ৪০, স্বামী- মংচসা মারমা ও (৩) মিঃ মংনু চিং মারমা, ৫, পিতা- মংচসা মারমা, মাতা- মৃত হ্লা পোয়াং প্রু মারমা। পুলিশ আবু মুসাকে গ্রেফতার করেছে।

জানা যায়, ঐ দিন বেলা প্রায় ১২ টায় দুষ্কৃতিকারী আবু মুসা এই জুম্ম পরিবারটির বাসায় আসে। এসেই তারা পরিবারের ১৫ বছরের কিশোরী উমাচিং মারমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময় বাড়ীতে অবস্থান করা উমাচিং এর মা মিসেস হ্লা পোয়াং প্রু মারমা ও তার ছোট ভাই মংনু চিং মারমা ঘরে ঘুমাচ্ছিল আর বৃদ্ধ দাদা অংচাউ মারমা ঘরের পাশে বাগানে কাজ করছিল। আবু মুসা প্রথমে বৃদ্ধ অংচাউ মারমাকে হত্যা করে। তারপর বাড়ীতে ঢুকে ঘুমন্ত মা ও ছেলেকে হত্যা করে। এর পরপরই উন্মত্ত আবু মুসা প্রথমে উমাচিং মারমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু উমাচিং সুকৌশলে পালিয়ে আসতে সক্ষম

হয় এবং আসার সময় চিৎকার করলে আশেপাশের গ্রামবাসীরা দৌড়ে গিয়ে উদ্ধার করে। জানা যায়, হত্যাকারী মুসার বাবা ও চাচা বেশ কিছু দিন থেকে হত্যার শিকার পরিবারটির জায়গা বেদখল করার চেষ্টার কারণে উভয়পক্ষের মধ্যে ভূমি নিয়ে একটা বিরোধ ছিল।

বান্দরবানের থানচিতে এক বাঙালী সেটেলার কর্তৃক ৩ বছরের জুম্ম নারী শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ বিকাল প্রায় ৩ টায় বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলা সদর এলাকায় মোঃ শাহ জাহান মিয়া (২৬) পীং- আব্দুল মান্নান নামের জনৈক সেটেলার বাঙালী কর্তৃক চার্লি প্রু মারমা ও ম্যামাউ মারমার ৩ বছরের শিশু সন্তানকে (হ্লা সাইং মারমা) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়। দুষ্কৃতিকারী শাহ জাহান মিয়ার আসল বাড়ী চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। সে শিশুটির বাড়ীর নিকটবর্তী থানচি সরকারী মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই নির্মাণাধীন একটি বিল্ডিং-এর নির্মাণ শ্রমিক। উল্লেখ্য, শিশুটির মা উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক।

জানা যায়, দুষ্কৃতিকারী শাহ জাহান মেয়ে শিশুটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নির্মাণাধীন বিল্ডিং-এর পার্শ্ববর্তী একটি স্থানে নিয়ে গিয়ে শিশুটির পরা জামাকাপড় খুলে দেয় এবং নিজে নগ্ন হয়। এমন কর্মকান্ড দেখে শিশুটি কান্না শুরু করে দেয়। আর এই কান্নার শব্দেই শিশুটির মাসহ স্কুলের শিক্ষকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং মেয়ে শিশুটি নগ্ন ও কান্নারত অবস্থায় দেখতে পায়, অপরদিকে তার পাশেই দুষ্কৃতিকারী শাহ জাহানকেও দেখতে পায়। শিশুটি তার ভাষায় ঘটনাটি বর্ণনা করলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয় এবং শিক্ষকরা সাথে সাথে শাহ জাহানকে আটক করেন। পরে এই ধর্ষণের চেষ্টাকারীকে পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়। এ ব্যাপারে শাহ জাহানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

পানছড়িতে বাঙালী সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত কর্ক কার্বারী পাড়ার এক সন্তানের জননী ১৯ বছরের এক জুম্ম গৃহবধু একই ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়ার বাসিন্দা মোঃ করিম (৩১) পীং- জানু মিয়া নামের এক বাঙালী সেটেলার কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।

জানা যায়, ঐদিন সকাল প্রায় ১১ টায় ধর্ষণের শিকার গৃহবধু তার দেড় বছরের শিশু সন্তান নিয়ে অস্থায়ীভাবে নির্মিত তাদের জুমঘরে অবস্থান করছিল। এসময় তার স্বামী পুষ্প রঞ্জন ত্রিপুরা তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে বৃদ্ধভাতা গ্রহণের জন্য পানছড়ি সদরে যায়। এরই ফাঁকে দুস্কৃতিকারী মোঃ করিম উক্ত গৃহবধূর বাড়ীতে আসে এবং পানি খেতে চায়। গৃহবধুকে একা পেয়ে মোঃ করিম গলায় ঝাপটে ধরে এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। তিনি চিৎকার করলে ধর্ষক দৌড়ে পালায়। ঘটনার পর থেকে মোঃ করিম পলাতক রয়েছে বলে জানা যায়। জানা যায়, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ পানছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। আত্মীয়দের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা বিলম্ব করা হয়। রিপোর্টটি লেখা পর্যন্ত ধর্ষক গ্রেফতার হয়েছে বলে জানা যায়নি।

খাগড়াছড়ির কমলছড়িতে এক জুম্ম গৃহবধূ নৃশংসভাবে হত্যার শিকার

গত ১ অক্টোবর ২০১১ মিসেস প্রতিমা চাকমা (৩২) স্বামী- প্রীতি বিকাশ চাকমা, সাং- কমলছড়ি, কমলছড়ি ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা নামের এক আদিবাসী জুম্ম নারী অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন। ঐ দিন রাত প্রায় ৮ টায় বাড়ী থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরবর্তী কমলছড়ি মুখ এলাকার ঘাটঘর নামক স্থান সংলগ্ন একটি সংকীর্ণ নালা থেকে দুই পা বাঁধা ও গলা কাটা অবস্থায় প্রতিমা চাকমার লাশ উদ্ধার করা হয়।

উল্লেখ্য, ঐদিন সকালের দিকে প্রতিমা চাকমার স্বামী প্রীতি বিকাশ চাকমা তাদের বাড়ী থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরবর্তী আপার পেরাছড়া এলাকায় তাদের সবজি ক্ষেতে কাজ করতে যায়। পরে মিসেস প্রতিমাও তার স্বামীর জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে ক্ষেতে যায়। তার স্বামীকে খাবার খাওয়ানোর পর মিসেস প্রতিমা তার স্বামীকে ক্ষেতে রেখে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু তার আর বাড়ী ফেরা হয়নি। সন্ধ্যার দিকে বিপদের আশঙ্কা করে প্রতিমার আত্মীয় স্বজনসহ গ্রামবাসীরা নিখোঁজ প্রতিমার খোঁজে বের হয়। অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে রাত প্রায় ৮:০০ টায় গ্রামবাসীরা প্রতিমা চাকমার বিকৃত লাশ উদ্ধার করে। উল্লেখ্য যে, প্রতিমা চাকমা প্রায় নিয়মিত স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে উক্ত ক্ষেতে যাতায়াত করত। যাতায়াতের মধ্যবর্তী এলাকাটি ছিল অনেকটা নির্জন। সেখানে প্রায়ই ৩/৪ কিলোমিটার দূরবর্তী ভুয়োছড়ি সেটেলার গ্রাম থেকে সেটেলার বাঙালীদের কেউ কেউ ঘাস কাটতে আসত। প্রতিমা চাকমার গলায় একভরি ওজনের সোনার চেইন ছিল।

জানা যায় যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হত্যার শিকার গৃহবধুর স্বামী প্রীতি বিকাশ চাকমা কর্তৃক রফিক নামে জনৈক সেটেলার বাঙালীর বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

সেটেলার বাঙালীদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সাম্প্রদায়িক হামলা, জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল, নানা অজুহাতে জুম্মদের হত্যা, অপহরণসহ সাম্প্রদায়িক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে বিগত এক বছরে সেটেলার বাঙালীরা নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্য সহযোগিতায় লংগদু এবং রামগড়-মানিকছড়িতে বড় ধরনের দু'টি সাম্প্রদায়িক হামলা, জুম্মদের কয়েকশত একর জায়গা-জমি জবরদখল, নিরীহ জুম্মদের মারপিট ইত্যাদি সংঘটিত করেছে। নিম্নে বিগত এক বছরে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক সংঘটিত ঘটনাবলীর কিছু ঘটনার বিবরণী উল্লেখ করা গেল-

মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালীর হামলায় এক জুম্ম দোকানদার আহত

গত ২৩ নভেম্বর ২০১০ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন সিন্ধুকছড়ি ইউনিয়নের সিন্ধুকছড়ি গ্রামে বিশ্বচান ত্রিপুরা (৪২) পিতা- হুগ কুমার ত্রিপুরা নামের এক জুম্ম দোকানদার একই এলাকার খায়রুল ইসলাস, পিতা- আসগর আলী নামের এক সেটেলার বাঙালীর হামলায় আহত হয়েছেন।

জানা যায়, সিন্ধুকছড়ি বাজারে বিশ্বচান ত্রিপুরার দোকানে ব্যবসায়িক লেনদেন নিয়ে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে খায়রুল ইসলাম হঠাৎ করে প্রথমে লাঠি দিয়ে, পরে চায়ের কাপ দিয়ে বিশ্বচানের মাথায় আঘাত করে। আঘাতে বিশ্বচান তৎক্ষণাৎ বেহুঁশ হয়ে যান। উপস্থিত লোকজন চিকিৎসার জন্য আহত বিশ্বচানকে বেহুঁশ অবস্থায় পার্শ্ববর্তী সেনাক্যাম্পের হাসপাতালে নিয়ে যায়। অপরদিকে লোকজন খায়রুল ইসলামকে ধরে নিয়ে সেনা কমান্ডারের কাছে সোপর্দ করে। কিন্তু সেনা কমান্ডার হামলাকারীর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ফলে হামলাকারী সহজেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বিশ্বচানের আত্মীয়-স্বজন হামলাকারীর বিরুদ্ধে মামলার জন্য থানায় যান, কিন্তু পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি।

উল্লেখ্য যে, হামলাকারী খায়রুল সিন্ধুকছড়ি গ্রামের পনেমালা ত্রিপুরা নামে এক জুম্ম নারীকে হত্যা মামলার আসামী। অভিযোগ রয়েছে, সেটেলার বাঙালীরা বিশ্বচান ত্রিপুরাকে বাজার থেকে উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা করে আসছে। আত্মীয়দের বিশ্বাস, বাজারের ব্যবসা থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিশ্বচানের উপর এই হামলা করা হয়।

মহালছড়িতে বাঙালী সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা

গত ৫ ডিসেম্বর ২০১০ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার লেমুছড়িতে বাঙালী সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে জুম্ম জায়গায় কিছু ঘর নির্মাণ করা হয়।

জানা যায়, ঐ দিন সকাল প্রায় ১০:০০ টায় শতাধিক বাঙালী সেটেলার সুনীল কুমার চাকমা পীং- মৃত চন্দ্র কুমার চাকমার ৮ একর পরিমাণ রেকর্ডভুক্ত ভূমিতে, রিপন তালুকদার পীং- জ্ঞান তালুকদকারের ৩ একর পরিমাণ ভূমিতে ঘর নির্মাণ শুরু করে এবং দিনের শেষ পযন্ত ১০টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন করে। বাঙালী সেটেলাররা জুম্মদের ভূমিতে ঘর নির্মাণ করার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহালছড়ি জোন ও কেঙেলছড়ি সাব জোনের একদল সেনা সদস্য।

পরের দিন ৬ ডিসেম্বর ২০১০ জুম্মরা সংগঠিত হয়ে এই ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং বাড়ীগুলো ভেঙে দেয়। বিপরীতে বাঙালী সেটেলাররা সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই সেখানে সমবেত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে হামলার চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক আনিসুল হক ভূঁইয়া, মহালছড়ি উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা রাহেত হোসেন ও মহালছড়ি থানা ওসি জয়নাল আবেদিন ঘটনাস্থলে গমন করেন। সুনীল কুমার চাকমার ছেলে কেরিংটন চাকমা কর্মকর্তাদের সামনে তাদের ভূমি মালিকানার দলিল প্রদর্শন করেন। জেলা প্রশাসক জুম্মদের ভূমিতে বাঙালী সেটেলার কর্তৃক ভূমি বেদখলের চেষ্টার ব্যাপারে কোন কথা না বলে, উল্টো জুম্মদের কর্তৃক বাঙালী সেটেলারদের নির্মিত অবৈধ ঘরগুলো ভেঙে দেওয়ার জন্য অভিযোগ করেন।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হামলা
২ জুম্ম আহত, ১২ প্রহৃত, ৫টি বাড়ী তছনছ

গত ২১ ডিসেম্বর ২০১০ একদল সেটেলার বাঙালী রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালী ইউনিয়নের শান্তিনগর এলাকার জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। এতে ২ জন জুম্ম মারাত্মকভাবে আহত হয়, ১২ জন প্রহারের শিকার হয় এবং ৫টি ঘর তছনছ করা হয়।

জানা যায়, ঐ দিন সকালে সেটেলার বাঙালীদের একটি দল কাঠ ও বাঁশ সংগ্রহ করার জন্য জুম্মদের মালিকানাধীন একটি এলাকায় যায়। জুম্ম গ্রামবাসীরা তাদের জায়গা থেকে কাঠ ও বাঁশ সংগ্রহ করতে বাঁধা দেয় এবং এক পর্যায়ে জুম্ম গ্রামবাসীরা

গুলশাখালী ইউনিয়নের চৌমুহনী এলাকার মোঃ ইমতাজ (২৫) নামের এক সেটেলার বাঙালীকে প্রহার করে। তবে মোঃ ইমতাজ প্রায় নিরাপদেই বাড়ী ফিরে। কিন্তু বাড়ীতে ফেরার সাথে সাথে সে প্রহৃত হওয়ার ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে দেয় এবং অন্যান্য বাঙালী সেটেলারদের উত্তেজিত করে।

এরপর দুপুর ১২/১ টার দিকে ৩৩-৩৬ সদস্য বিশিষ্ট সেটেলার বাঙালীদের একটি দল ধারালো অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শান্তিনগরের জুম্ম এলাকায় সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। হামলায় প্রথমে নিম্নোক্ত ১২ জন জুম্মকে আটক করে মারাত্মকভাবে প্রহার করা হয়।

(১) মিঃ ধাকবাদি চাকমা (২৫) পীং- দল মোহন চাকমা, গ্রাম- শান্তিনগর;
(২) মিঃ বিনয় চন্দ্র চাকমা মরত্তো (৪০) পীং- দল মোহন চাকমা, গ্রাম- শান্তিনগর;
(৩) মিঃ মিলন চাকমা (৩০) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- ঐ;
(৪) মিঃ রিপন চাকমা (২৫) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- ঐ;
(৫) মিঃ সমর্পণ দেওয়ান (২০) পীং- বনু দীপক দেওয়ান, গ্রাম- ঐ;
(৬) মিঃ করুন চাকমা (৩৭) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- ঐ;
(৭) মিঃ বম চাকমা (৪৩) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- ঐ;
(৮) মিঃ হিমেল চাকমা (১৮) পীং- বিভীষণ চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(৯) মিঃ শুভ শান্তি চাকমা (২৩) পীং- বম চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(১০) মিঃ পলাশ চাকমা (১৮) পীং- মহেন্দ্র চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(১১) মিঃ রিতেন চাকমা পীং- রসিক মোহন চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(১২) মিঃ সুমন চাকমা পীং- রেবতী মোহন চাকমা, গ্রাম- ঐ;

প্রহৃত উক্ত ১২ জনের মধ্যে মিঃ ধাকবাদি চাকমা (২৫) ও বিনয় চন্দ্র চাকমা মরত্তো (৪০) মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং লংগদু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এছাড়া সেটেলার বাঙালীরা নিম্নোক্ত ৫টি বাড়ী তছনছ করে-

(১) মিঃ বরুন কুমার চাকমা পীং- সোনারাম চাকমা;
(২) মিঃ রাজ মোহন চাকমা পীং- অজ্ঞাত;
(৩) মিঃ কালা চিজি চাকমা পীং- অজ্ঞাত;
(৪) মিঃ বিমল শান্তি চাকমা পীং- অজ্ঞাত;
(৫) মিঃ বিনয় চন্দ্র চাকমা পীং- দল চন্দ্র চাকমা।

উক্ত সাম্প্রদায়িক হামলায় নেতৃত্ব দেয়- (১) আবু হানিফ (৪৫) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- যুব লক্ষী পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড সদস্য, গুলশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ; (২) রুফিজউদ্দিন (৪০) পীং- খালেক, গ্রাম- ৮নং রহমতপুর ওয়ার্ড সদস্য, গুলশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ।

জানা যায়, সেটেলার বাঙালীরা জুম্ম গ্রামে হামলার সময় ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী রাজনগর ক্যাম্পের বিডিআর (বিজিবি) সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও তারা হামলা প্রতিরোধে কোন ভূমি পালন করেনি। হামলা চলার এক পর্যায়ে লে. কর্ণেল হাবিব ও মেজর আমিনুলের নেতৃত্বে বিডিআরের একটি দল ঘটনাস্থলে যায় এবং ঘটনা থামায়।

পরে লে. কর্ণেল হাবিব ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট নেতাদের নিয়ে একটি জরুরী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জুম্ম এলাকাবাসীর পক্ষে অংশগ্রহণ করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সুখময় চাকমা, লংগদুর হেডম্যান এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রেমলাল চাকমা, যুব সমিতির লংগদু উপজেলা শাখার সভাপতি মনি শংকর চাকমা। সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তবলী গৃহীত হয়-

(১) ঘটনার বিষয়ে আগামী ২৩ ডিসেম্বর ২০১০ একটি সমন্বয় সভা আয়োজন করা হবে।
(২) ইতোমধ্যে বিডিআর জোন হেডকায়ার্টার এর কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল হাবিব এর অনুমতি ছাড়া কোন বাঙালী জুম্ম এলাকায় এবং কোন জুম্ম বাঙালী এলাকায় যেতে পারবে না।

জানা যায়, এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পেছনে মূল উস্কানিদাতা ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে লংগদু উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহিম, স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতা ও গুলশাখালী মৌজার ভারপ্রাপ্ত হেডম্যান মোঃ হালিম এবং স্থানীয় বিএনপি নেতা ও গুলশাখালী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবু তালেব।

লংগদুতে নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় বাঙালী সেটেলার কর্তৃক জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা
২৩ বাড়ী ভস্মীভূত, ২ জন আহত

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ বিকাল প্রায় ৫:৩০ টায় স্থানীয় বিজিবি সদস্যদের সহায়তায় রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালি ইউনিয়নের গুলশাখালি সেটেলার এলাকার ২০০-২৫০ জনের সেটেলার বাঙালীদের একটি দল এক বাঙালী সেটেলারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গুলশাখালি ও রাঙ্গিপাড়া এলাকার জুম্ম গ্রামে হামলা চালায়। এই সাম্প্রদায়িক হামলায় একটি ব্রাক স্কুলসহ জুম্মদের ২৩ বাড়ী ভস্মীভূত হয়। অপরদিকে দপুরে একই বিষয়ে একদল বাঙালী সেটেলার লংগদু উপজেলা সদরস্থ তিনটিল্যা লঞ্চঘাটে হামলা চালিয়ে ২ জুম্ম ছাত্রকে মারাত্মকভাবে আহত করে।

জানা যায়, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সকাল বেলায় গুলশাখালি ইউনিয়নের রহমতপুর সেটেলার পাড়ার বাসিন্দা মোঃ সাবের আলী (৩৩) পীং- নেহাত আলী ও মোঃ সাহিদ (৩৫) পীং- জুল্যা পাগালা ফুলঝাড়- সংগ্রহ করতে গুলশাখালি এলাকার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে যায়। তাদের মধ্যে মোঃ সাহিদ বাড়ী ফেরে, তবে মোঃ সাবের আলী নিখোঁজ হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সকাল প্রায় ১০:০০ টায় পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা রাঙ্গিপাড়া এলাকা থেকে সাবের আলীর মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং বিকাল ৩:০০ টায় লাশটি লংগদু থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা যায়, সাবের আলী দীর্ঘদিন ধরে মৃগী রোগে ভুগছিল। তাই প্রশাসনসহ স্থানীয় লোকজন ধারণা করছিল যে, সাবের আলী তার অসুস্থতার কারণে মারা যেতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীরাও জানায় যে, মৃতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে বিকাল প্রায় ৫:৩০ টায় বাঙালী সেটেলাররা সাবের আলীর মৃত্যুর জন্য জুম্ম গ্রামবাসীরা দায়ী বলে অভিযোগ করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয় এবং গুলশাখালি বাজার ও চৌমুহনী বাজারে আলাদা আলাদাভাবে মিছিল বের করে। উল্লেখ্য, বাঙালী সেটেলাররা দুপুর প্রায় ১২:০০ টায় লংগদু উপজেলা সদরেও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক অপর একটি মিছিল বের করে।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সকাল থেকে বাঙালী সেটেলাররা আবার নতুন করে এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা শুরু করে। এক পর্যায়ে সকাল প্রায় ১১:০০ টায় বাঙালী ছাত্র পরিষদের সভাপতি খলিলুর রহমান খান ও জনৈক আব্দুর রহিম (সাংবাদিক) এর নেতৃত্বে বাঙালী সেটেলাররা লংগদু সদরে একটি মিছিল বের করে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো বন্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মিছিল শেষ হওয়ার সাথে সাথে দুপুর প্রায় ১:০০ টায় বাঙালী সেটেলাররা লংগদু সদরের লঞ্চঘাটে রাঙ্গামাটি থেকে আগত জুম্ম যাত্রীদের উপর হামলা চালায়। এতে ২ জুন জুম্ম ছাত্র (১) মি. এ্যাপোলো চাকমা (২০) পীং- মনোরঞ্জন চাকমা, সাং- সিজকমুখ এলাকা, বাঘাইছড়ি উপজেলা ও (২) মি. মঙ্গলময় চাকমা (১৫) পীং- দয়া মোহন চাকমা, সাং- সীমানা পাড়া, বরকল উপজেলা মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে তাদেরকে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

এরপর বিকাল প্রায় ৫:০০ টায় বাঙালী সেটেলাররা আবার একত্রিত হতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে ২০০-২৫০ সদস্য বিশিষ্ট একদল সেটেলার বাঙালী জুম্ম গ্রামে হামলা চালিয়ে একের পর এক বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। হামলায় একটি ব্রাক স্কুলসহ অন্তত ২৩টি জুম্ম বাড়ী ভস্মীভূত হয়। সেটেলারদের কর্তৃক জুম্ম বাড়ীতে অগ্নিসংযোগের সময় ঘটনাস্থলের অনতিদূরে বিজিবি ক্যাম্প থাকলেও বিজিবি সদস্যরা এই হামলা ও অগ্নিসংযোগ থামানোর জন্য কোন ভূমিকা পালন করেনি।

বাঙালী সেটেলাররা প্রথমে রাঙ্গিপাড়ার শুক্র চাকমা ও অমিয় কান্তি চাকমার বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর জুম্ম গ্রামবাসীরা একত্রিত হতে শুরু করে এবং সেটেলারদের মুখোমুখি হয়ে অবশিষ্ট বাড়ীগুলো রক্ষার চেষ্টা করে। জুম্ম নেতারা পুলিশসহ স্থানীয় প্রশাসনকেও অবহিত করার চেষ্টা করে। তবে বাঙালী সেটেলারদের আক্রমণ বন্ধের জন্য প্রশাসন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে ঐ সময় রাজনগর বিজিবি জোনের অধীন হাবিলদার জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে রাঙ্গিপাড়া তেমাথা ক্যাম্পের একদল বিজিবি সদস্য সেখানে যায় এবং বিজিবি সদস্যরা সেখানে পৌছার পরপরই বাঙালী সেটেলাররা তাদের হামলা জোরদার করে। এরপর বাঙালী সেটেলাররা গুলশাখালি গ্রামের দিকে অগ্রসর হয় এবং নির্বিচারে জুম্মদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। জুম্ম গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জুম্ম গ্রামে অগ্নিসংযোগের সময় বিজিবি সদস্যরা বাঙালী সেটেলারদের সাহায্য করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ বিকাল ৭:০০ টা পর্যন্ত বাঙালী সেটেলাররা ২ গ্রামের জুম্ম গ্রামবাসীদের অন্তত ২৩টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। জুম্ম গ্রামবাসীদের ভস্মীভূত বাড়ীর তালিকা নিম্নরূপঃ

হেলিপ্যাড, রাঙ্গিপাড়া এলাকা, বগাচতর ইউনিয়ন

ক্রঃ	নাম	ক্ষয়ক্ষতি (টাকায়)
১	শুক্র চাকমা (৫০) পীং- মৃত প্রদীপ চন্দ্র চাকমা	২,০০,০০০/-
২	অমিয় কান্তি চাকমা (৪৫) পীং- মৃত ধীরেন্দ্র চাকমা	২,০০,০০০/-
৩	অমলেন্দু চাকমা (৪০) পীং- বড়বন্ধু চাকমা	১,৫০,০০০/-
৪	রিপন চাকমা (২৮) পীং- রমেশ চন্দ্র চাকমা	৮০,০০০/-

গুলশাখালি এলাকা, গুলশাখালি ইউনিয়ন

ক্রঃ	নাম	ক্ষয়ক্ষতি (টাকায়)
১	মিলন চাকমা (৩৫) পীং- রনজিত চাকমা	১,০০,০০০/-
২	স্নেহ কুমার চাকমা (২৬) পীং- রনজিত চাকমা	৫০,০০০/-
৩	বাসন্তী লতা চাকমা (৬০) স্বামী- মৃত জ্ঞানরতন চাকমা	৭০,০০০/-
৪	স্বপন চাকমা (২৫) পীং- ক্ষেত্র মোহন চাকমা	২,৫০,০০০/-
৫	দয়াময় চাকমা (৬০) পীং- মৃত জাগুলুক্যা চাকমা	৬০,০০০/-
৬	সিংহমনি চাকমা (৪৫) পীং- আদেন্দ্র চাকমা	৫০,০০০/-
৭	মন্টু চাকমা (৪৫) পীং- সুমতি কুমার চাকমা	১,০০,০০০/-
৮	বিমল কান্তি চাকমা (৪৫) পীং- মৃত বীরেন্দ্র চাকমা	১,০০,০০০/-
৯	জ্ঞানলাল চাকমা (৪৫) পীং- কালীচরণ চাকমা	৭০,০০০/-
১০	চান্দু চাকমা (৩৫) পীং- মনমোহন কার্বারী	১,৫০,০০০/-
১১	মনমোহন চাকমা (৬৫) পীং- মৃত জন্মজয় চাকমা	২,০০,০০০/-
১২	প্রীতিময় চাকমা (৩৫) পীং- বস্ত্র চাকমা	৮০,০০০/-
১৩	শম্ভু রঞ্জন চাকমা (৫০) পীং- বড়বন্ধু চাকমা	১,০০,০০০/-
১৪	সোনারাম চাকমা (৫২) পীং- মৃত কেবল চন্দ্র চাকমা	
১৫	সুশীল কুমার চাকমা (৩৫) পীং- মৃত বাদশাধন চাকমা	
১৬	বিনয় চাকমা (২৮) পীং- মৃত বাদশাধন চাকমা	
১৭	সুখময় চাকমা (৩৫) পীং- রিজাভ চন্দ্র চাকমা	
১৮	বুদ্ধমনি চাকমা (৩৩) পীং- মদন কুমার চাকমা	

এছাড়া একটি ব্রাক স্কুল ভস্মীভূত হয় এবং একটি স্কুল নির্মাণের জন্য সংরক্ষিত ইউনিসেফ কর্তৃক প্রদত্ত ৪৫টি টিন লুট করা হয়। বাঙালী সেটেলারদের কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হামলায় নেতৃত্বদানকারী দুষ্কৃতিকারীরা হল-

(১) ওয়াজেড আলী, চেয়ারম্যান, বগাচতর ইউনিয়ন;
(২) রহিম, চেয়ারম্যান, গুলশাখালী ইউনিয়ন;
(৩) আমীর হোসেন মোল্লা (৫৫) পীং- অজ্ঞাত, সাং- বৈরাগী বাজার, বগাচতর ইউনিয়ন;
(৪) সামশু সরদার (৫৫) পীং- অজ্ঞাত, সাং- থেগাপাড়া, বগাচতর ইউনিয়ন;
(৫) মান্নান সরদার (৫০) পীং- অজ্ঞাত, সাং- রাঙ্গিপাড়া, বগাচতর ইউনিয়ন;
(৬) সালাউদ্দিন (৩০) পীং- অজ্ঞাত, সাং- রাঙ্গিপাড়া, বগাচতর ইউনিয়ন।

উল্লেখ্য যে, বাঙালী সেটেলাররা যাদেরকে ১৯৮০ দশকে সরকার কর্তৃক সমতল এলাকা থেকে এনে লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালি, বগাচতর ও কালাপাগচ্যা এলাকায় বসতি দান করা হয় তারাই জুম্মদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই তারা এই সাম্প্রদায়িক হামলা করেছে। অনেকের সন্দেহ যে, জুম্ম গ্রামে হামলার জন্য একটি খোড়া অজুহাত সৃষ্টি করতে বাঙালী সেটেলাররাই সাবের আলীকে হত্যা করতে পারে। বাঙালী সেটেলাররা মিথ্যা কাহিনী বানিয়ে ছড়িয়ে দেয় যে, মৃতদেহে কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে, লাশটির পোস্ট মর্টেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ডাক্তার স্বীকার করেন যে, মৃতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

নানিয়ারচরে বাঙালী সেটেলারদের কর্তৃক জুম্মদের জলেভাসা জমি বেদখলের চেষ্টা

৩ মার্চ ২০১১ রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলায় বাঙালী সেটেলাররা জুম্মদের মালিকানাধীন জলে ভাসা জমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। জানা যায়, ঐদিন সকাল বেলায় নানিয়ারচর উপজেলায় মাইসছড়ি মৌজাধীন গোবিন্দবিল এলাকায় জুম্মদের জলেভাসা জমি বেদখলের উদ্দেশ্যে শত শত বাঙালী সেটেলার জড়ো হতে থাকে। এ সময় জুম্ম কৃষকরা ধান রোপন করছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, এ সময় বাঙালী সেটেলারদের সাথে ছিল নানিয়ারচর সেনা জোনের (২৪ বীর বেঙ্গল) সুবেদার সাইদ এর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর একটি দল।

এক পর্যায়ে জমির মালিক জুম্মরা ও কৃষকরা বাঙালী সেটেলারদের কর্তৃক ভূমি বেদখল বন্ধের জন্য নানিয়ারচর উপজেলা প্রশাসনের কাছে ছুটে যান। নানিয়ারচর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল হাই তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য

ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল প্রেরণ করেন এবং দ্রুত জুম্ম ও বাঙালী সেটেলারদের নিয়ে তার কার্যালয়ে একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় কৃতিরাজ খীসা ঝিনুক পীং- মৃত বিনোদ বিহারী খীসা তার পাঁচ ভাইয়ের পক্ষ থেকে তাদের জমির দলিলপত্র প্রদর্শন করেন। অপরদিকে বাঙালী সেটেলাররা কোন দলিলপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। বাঙালী সেটেলাররা দলিল দেখাতে ব্যর্থ হলে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুম্ম মালিকদের ও কৃষকদের ধান রোপন চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন।

জানা যায়, অন্যান্যদের মধ্যে নানিয়ারচর পুরান বাজার এলাকার আবুল কালাম পীং- প্রয়াত গুরা মিয়া, সিদ্দিক খান, মোঃ আশরাফ, শাহজাহান, আলামিন, জালাল বাহাদুর ও নুরুল হক এবং নানিয়ারচর বাজার এলাকার মোঃ ওয়াজেদ ও স্বপন দেবনাথ কৃতিরাজ খীসা ঝিনুক ও তার পাঁচ ভাইয়ের জমি বেদখলের চেষ্টা করে। অপরদিকে, মাইচছড়ি মৌজার নতুন বড়াদম গ্রামের ৫ জুম্ম গ্রামবাসীর ৩০ একর ভূমি বেদখলের চেষ্টা করে অপর ৮ বাঙালী সেটেলার। জানা যায়, নানিয়ারচর সেনা জোনের সুবেদার সাইদ বেশ কিছু দিন ধরে জুম্মদের ভূমি বেদখলের জন্য স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দাসহ বাঙালী সেটেলারদের উস্কানী দিয়ে যাচ্ছিল। নানিয়ারচর বাজারের স্থায়ী বাসিন্দা নুরুল হক বলে যে, বিষয়টি আপোষ করতে সে কেন কৃতিরাজ খীসা ঝিনুকের সাথে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল এজন্য সুবেদার সাইদ তাকে অভিযোগ করে। জানা যায়, নুরুল হক ঐ জমি সাময়িকভাবে লীজ নিয়েছিল।

রামগড় ও মানিকছড়িতে বাঙালী সেটেলারদের কর্তৃক জুম্ম গ্রামে ব্যাপক হামলা
শতাধিক বাড়ী ভস্মীভূত, নিহত ৫, ২০ জনের অধিক আহত

গত ১৭ এপ্রিল ২০১১ খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও পার্শ্ববর্তী মানিকছড়ি উপজেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় পাশ্ববর্তী বাঙালী সেটেলাররা সংঘবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে অন্তত ৬টি গ্রামের শতাধিক বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে এবং কমপক্ষে ২০ জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। হামলায় ২টি বৌদ্ধ মন্দিরও ভস্মীভূত করা হয়।

জানা যায়, ভিডিপি সদস্য মোঃ জয়নাল পিসির নেতৃত্বে বাঙালী সেটেলাররা বেশ কিছু দিন থেকে রামগড় উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নের হাতিমুড়া এলাকায় রুইহ্লা অং মারমা পীং- পিজা অং মারমার মালিকানাধীন প্রায় ১৫ একর ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এলাকায় যখন সাংগ্রাইং উৎসব চলছিল তখনও জয়নাল পিসির নেতৃত্বে বাঙালী সেটেলাররা ঐ ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। এতে জুম্মরা প্রতিবাদ করে এবং তা বন্ধ করার অনুরোধ জানায়। পাশাপাশি তারা সেনাবাহিনীসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি অবহিত করে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি।

এরপর গত ১৭ এপ্রিল সকাল ১১ টার দিকে সেটেলার বাঙালিরা দলবদ্ধভাবে আবার উক্ত জমি জবরদখল করতে গেলে পাহাড়ীরা বাধা দেয় এবং এক পর্যায়ে সংঘর্ষের রূপ নেয়। এই সংঘর্ষে তিনজন সেটেলার বাঙালি গুরুতর আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করে এবং অপর একজন ১ জন গুরুতর জখমসহ ১০ জন জুম্ম আহত হয়। নিহত তিন বাঙালীর নাম- আয়ুব আলী (৩৮) সাং- কচুভাস্তে পাড়া, নোয়াব আলী (৬০), সাং- বড় পিলাক পাড়া ও সুনীল সরকার, সাং- ঐ।

এরপর রামগড়ের হাতিমুড়া, মানিকছড়ির গচ্ছ্যাবিল ইত্যাদি এলাকা থেকে শত শত বাঙালি সেটেলার সংঘবদ্ধ হয়ে জুম্মদের গ্রামে হামলা শুরু করে। এ সময় সেনাবাহিনীর টহলদল এলাকায় অবস্থান নিলেও বাঙালী সেটেলারদের কোন বাধা প্রদান করেনি বলে জানা যায়। সেনা সদস্যরা রাস্তায় টহল দিতে থাকে আর অন্যদিকে বাঙালী সেটেলাররা জুম্ম গ্রামে ঢুকে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট শুরু করে। একের পর এক এই হামলায় রামগড় উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নের অন্তত পাঁচটি গ্রাম শনখোলা পাড়া, তৈকর্মা পাড়া, পথাছড়া পাড়া, রিয়ং মরম পাড়া ও বড় পিলাক এলাকার অন্তত ১০০টি এবং সীমান্তবর্তী মানিকছড়ি উপজেলার মানিকছড়ি মহামুনি পাড়ার (ক্যজাই কার্বারী পাড়া) ১১টি জুম্ম ঘরবাড়ী ভস্মীভূত করা হয়। এতে অন্তত কোটি টাকার সহায়সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। জানা যায়, ১৭ এপ্রিলের শনখোলা পাড়া হামলায় ৭২ বছরের রেপ্রুচাই মারমা ও ২ মাস বয়সী রুইচাই মারমা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।
গ্রামভিত্তিক জুম্মদের ভস্মীভূত বাড়ীর বিবরণ-

ক্রঃ	গ্রাম ও ইউনিয়নের নাম	উপজেলা	বাড়ীর সংখ্যা
১	শনখোলা পাড়া, হাফছড়ি ইউনিয়ন	রামগড়	৬৭ (বৌদ্ধ মন্দির, দোকান, রাইস মিলসহ)
২	তৈকর্মা পাড়া, ঐ	রামগড়	৮
৩	পথাছড়া পাড়া, ঐ	রামগড়	১০
৪	রিয়ং মরম পাড়া, ঐ	রামগড়	৫
৫	বড় পিলাক, ঐ	রামগড়	৯
৬	মানিকছড়ি মহামুনি পাড়া (ক্যজাই কার্বারী পাড়া)	মানিকছড়ি সদর	১১

এছাড়া চট্টগ্রাম ও ফেনী থেকে আসা বাস থেকে নামিয়ে অনেক জুম্ম যাত্রীকে হামলা করা হয়। এতে ২ জন নারীসহ অন্তত ১০ জন জুম্ম আহত হয়। আহত দুই নারী হচ্ছে মিস মিঠু মারমা (১৩) পীং- মেহ্লা প্রু মারমা, সাং- বটতলী, গুইমারা এলাকা ও মিসেস পাইক্রা মারমা (৫০) স্বামী- মংসা মারমা, সাং- বাজার চৌধুরী পাড়া, যৌথ খামার এলাকা, রামগড়। মিঠু মারমা গুরুতর অবস্থায় মানিকছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই সাম্প্রদায়িক হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা বাঙালী সেটেলারদের কেউ গ্রেফতার বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখোমুখি হয়ে বলে জানা যায়নি।

মানিকছড়িতে বাঙালী সেটেলার কর্তৃক আদিবাসী ভূমি বেদখলের চেষ্টা

গত ৮ মে ২০১১ খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নের লুকলুক্যা এলাকার ওয়ার্কছড়িতে বাঙালী সেটেলারদের একটি দল আদিবাসী মারমাদের মালিকানাধীন ভূমি বেদখলের চেষ্টা করে। জানা যায়, ঐ দিন সকাল প্রায় ১০:০০ টায় বাঙালী সেটেলারদের একটি দল মারমা অধ্যুষিত লুকলুক্যা এলাকার ওয়ার্কছড়িতে যায় এবং সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে বাড়ী নির্মাণ শুরু করে। আদিবাসী গ্রামবাসীরা এর বিরোধীতা করলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মানিকছড়ি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর একটি দল সেখানে ছুটে যান এবং বাঙালী সেটেলারদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা বন্ধ করে দেন। অপরদিকে ঐদিন বিকেলে বাঙালী সেটেলাররা জুম্ম গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানে জড়ো হয়ে আদিবাসী জুম্মদের হামলার চেষ্টা করে। তবে জুম্মরা শেষ পর্যন্ত তা প্রতিরোধ করে।

লামায় জুম্মদের ৪০০ একর ভূমি বেদখলের চেষ্টা

২০১১ সালের মে মাসে বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার পাইতং মৌজায় চেয়ারম্যান নুরু ও সাবেক চেয়ারম্যান রফিকের ভাই মোহাম্মদ সামশু নামের দুই ব্যক্তি আদিবাসী ত্রিপুরাদের মালিকানাধীন ৪০০ একর ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। ইতোমধ্যে আদিবাসী গ্রামবাসীদের মালিকানাধীন ২০ একর বনভূমি ধ্বংস করা হয়। আর জুম্ম গ্রামবাসীরা যখন এই বেদখলের চেষ্টা প্রতিরোধ করে, তখন ভূমি বেদখলকারীরা উল্টো লামা থানায় একটি জিডি করে।

জানা যায়, ১৯৮০ সালে জেলা প্রশাসন এ এ সুলতান নামের অস্থানীয় এক ব্যক্তিকে হর্টিকালচারের জন্য পাইতং মৌজায় ১২০ একর ভূমি লীজ প্রদান করে। তবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেই ব্যক্তি ৩ বছরের মধ্যে তা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ এ এ সুলতানের লীজ বাতিল করে। উক্ত ভূমির সংলগ্ন ভূমি জাদিতুং পাড়া গ্রামের ত্রিপুরা ও মারমাদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমি। চেয়ারম্যান নুরু ও সাবেক চেয়ারম্যান রফিকের ভাই মোহাম্মদ সামশু এখন ঐ ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

বান্দরবানে এক বাঙালী ভূমিদস্যু কর্তৃক আদিবাসী খিয়াংদের পিতৃভূমি বেদখল

সম্প্রতি স্থানীয় বাঙালী সেটেলারের নেতা সাংবাদিক পরিচয়ধারী এ কে এম জাহাঙ্গীর নামের জনৈক এক ভূমিদস্যু বান্দরবান জেলার কুহালং মৌজাধীন ঘুংরু মুখ পাড়ায় আদিবাসী খিয়াংদের ভূমি বেদখল করে।

জানা যায়, জাহাঙ্গীর ইতোমধ্যে ঘুংরুমুখ পাড়ার সীমান্তবর্তী চেমি ডলু পাড়ায় রাবার বাগানের জন্য ২৫ একর ভূমি লীজ নেয়। কিন্তু সে ২৫ একরের নাম করে খিয়াং গ্রামবাসীর মালিকানাধীন প্রায় ৭৫ একর ভূমি বেদখল করে। জাহাঙ্গীর দাবী করে যে, সে আরও অতিরিক্ত ৫০ একর ভূমি ক্রয় করেছে। এখন জাহাঙ্গীর খিয়াং গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করে রাবার চারা রোপণের ঘোষণা দিয়েছে।

খিয়াং জনগোষ্ঠীর স্থানীয় নেতা বান্দরবান জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য বাছা খিয়াং বলেছেন যে, আদিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য জাহাঙ্গীর আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে বলে এবং এমনকী সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হবে বলেও হুমকী দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ জাহাঙ্গীর তার কয়েকজন ক্যাডারকে নিয়ে বাছা খিয়াং এর বাসায় যায় এবং যদি খিয়াংরা জায়গা ছেড়ে না যায় তাহলে তাদের জন্য কঠিন পরিস্থিতি রয়েছে বলে হুমকী দেয়।

স্থানীয় খিয়াংদের মতে, উক্ত এলাকায় তারা শত বছর ধরে বসবাস করে আসছেন। ১৯৮৫ সালে জনৈক নূরুল হুদা পীং- ছৈয়দুর রহমান সাং- মেরি ভিলা, বরিশাল জেলা এই এলাকায় ৪০ বছরের জন্য ২৫ একর ভূমি লীজ নেয়। একই বছর এস এম সৈয়দ নামের অপর একজন ৪০ বছরের জন্য ২৫ একর ভূমি লীজ নেয়। কিন্তু লীজ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা কখনো রাবার বাগান করেনি। লীজের শর্ত অনুযায়ী ভূমি ব্যবহারে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৯৮ সালে বান্দরবান জেলার ডেপুটি কমিশনার এর কার্যালয় কর্তৃক তাদের লীজ বাতিল করা হয়। ঐ সময় তারা কেউই উক্ত লীজ বাতিল বিজ্ঞপ্তিতে আপত্তি করেনি। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট এলাকার খিয়াং গ্রামবাসী আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছে। যে কোন সময় জাহাঙ্গীর তার সহযোগীদের দিয়ে তাদের উপর হামলা করতে পারে। তাদের এই উচ্ছেদ ও হামলার আতঙ্ক প্রতিকারের জন্য খিয়াং জনগণ ইতোমধ্যে বান্দরবান জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

রাঙ্গামাটি শহরের জলযানঘাটে সেটেলার বাঙালীরা ৫টি বাড়ী নির্মাণ করে জলেভাসা ভিটা জবরদখল

গত ২৭-২৮ আগস্ট ২০১১ এর মধ্য রাতে একদল সেটেলার বাঙালী কর্তৃক ৫টি ঘরবাড়ী তুলে রাঙ্গামাটি পৌর এলাকাধীন সেনাবাহিনীর জলযান ঘাট নামে এলাকার সন্নিকটস্থ একটি ছোট্ট জলেভাসা টিলা জবরদখল করা হয়। ২৮ আগস্ট স্থানীয় রানী তাতু রায় পাড়ার (পাবলিক হেলথ এলাকা) অধিবাসীরা বাধা দিতে গেলে তারা সেনা কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নিয়েছে বলে সেটেলার বাঙালীরা দাবী করে। উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনীর ব্রিগেড অফিসের সংলগ্ন জলযান ঘাটের সন্নিকটে এই জলেভাসা টিলা অবস্থিত। এর আগে কয়েকজন আদিবাসী জুম্ম পরিবার কর্তৃক উক্ত জলেভাসা টিলায় ঘর নির্মাণ করতে চাইলে সেনা কর্তৃপক্ষ থেকে বাধা দেয়া হয় বলে এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়।

স্থানীয় অধিবাসী অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১০ অক্টোবর ২০১১ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। তবে উক্ত উচ্ছেদ অভিযানে কেবলমাত্র নবনির্মিত ঘরাবাড়ীর কিছু বেড়া ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে মাত্র। ঘরের চাল ও খুঁটি বহাল তবিয়তে থাকে। ফলে সেটেলার বাঙালীরা ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী মেরামত করে এখনো বহাল তবিয়তে উক্ত ভিটায় অবস্থান করছে এবং এরপর আরো কয়েক পরিবার সেটেলার গিয়ে বসতি নিয়েছে।

রামগড়ে বাঙালী সেটেলারদের কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ একদল বাঙালী সেটেলার খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন পাতাছড়া ইউনিয়নের নাভাঙ্গা মৌজার পাগলাপাড়া এলাকায় আদিবাসী মারমাদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। এই উদ্দেশ্যে সেটেলাররা সকাল প্রায় ১০:০০টায় সেখানে যায়। কিন্তু সেখানকার আদিবাসী জুম্মরা তা প্রতিরোধের চেষ্টা করলে সেটেলাররা ফিরে আসে।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ সকাল ৯:০০ টায় আবার সেটেলাররা পাগলাপাড়া এলাকায় এসে জড়ো হতে থাকে এবং জুম্মদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা করে। অপরদিকে মারমা গ্রামবাসীরাও বাঙালী সেটেলারদের ভূমি বেদখল ঠেকানোর জন্য জড়ো হতে থাকে। উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পাতাছড়া ক্যাম্পের একদল আনসার দ্রুত সেখানে যায় এবং বাঙালী সেটেলার ও মারমা গ্রামবাসীদের এলাকাটি ত্যাগ করতে বলে। একই সময় রামগড়ের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গোপাল চন্দ্র দাশ, রামগড় থানার ওসি ওহিদুল রহমান, নাভাঙ্গা মৌজার হেডম্যান সাচিংপ্রু চৌধুরী, পাতাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ আলমগীর সেখানে যান। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ একটি সভা ডাকেন এবং সেখানে বাঙালী সেটেলার ও জুম্মদের স্ব স্ব ভূমির দলিল নিয়ে উপস্থিত থাকতে বলেন।

লংগদুর বগাচদর ইউনিয়নের রঞ্জিত পাড়ায় ৭টি ঘর নির্মাণ করে জায়গা জবরদখল

অতি সম্প্রতি সেটেলার বাঙালীরা লংগদু উপজেলার বড়াচদর ইউনিয়নের পেদান্যামাছড়া মৌজায় জুম্মদের জায়গা-জমির উপর ৭টি ঘর নির্মাণ করে। এসব পাহাড় ও ধান্য জমি স্থানীয় জুম্মরা বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করে আসছে। এসব জমি জবরদখলকারী সেটেলার বাঙালীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিরা হলো- (১) মো. নজরুল ইসলাম (সেন্টু), পিতা শামসুল হক, জালিয়া পাড়া, পেদান্যামাছড়া মৌজা; (২) মো. মজনু মিয়া, পিতা মো. কাসেম আলী, গ্রাম ঠেগা পাড়া, পেদান্যামাছড়া মৌজা; (৩) মো. রুস্তম আলী, পিতা আকবর আলী, গ্রাম ঠেগা পাড়া, পেদান্যামাছড়া মৌজা; (৪) মো. মণির, পিতা অজ্ঞাত, গ্রাম ঠেগা পাড়া, পেদান্যামাছড়া মৌজা; এবং (৫) গুলগুলা হাবিব, পিতা অজ্ঞাত, গ্রাম ঠেগা পাড়া, পেদান্যামাছড়া মৌজা।

নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পূর্বের মতো জুম্মদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। নানা অজুহাতে জুম্মদের আটক করা, অমানুষিক নির্যাতন করা, দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্যমূল্য না দেয়া, ক্যাম্পে হাজির হতে বাধ্য করা, ধর্মীয় পরিহানি ঘটানো, সেটেলারদের মদদ দান ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে এরূপ দুটি ঘটনা উল্লেখ করা গেল-

বান্দরবানের আলীকদমে সেনাবাহিনী কর্তৃক আদিবাসীদের সামাজিক চেরাংঘর ভাঙচুর

গত ২৯ জুলাই ২০১১ শুক্রবার স্থানীয় সেনাবাহিনীর একদল সদস্য আলীকদম উপজেলা ১ নং আলীকদম সদর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের ম্রো ও মারমা অধ্যুষিত বাবু পাড়ার সামাজিক চেরাংঘরটি (ধর্মঘর) ভেঙ্গে দেয়। উল্লেখ্য, চেরাংঘর বা ধর্মঘর হচ্ছে স্থানীয় আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও ধর্মীয় ছোট আকারের একটি ঘর, যেখানে পানীয় ব্যবস্থা করে রাখা হয়, যাতে দুর্গম ও দূর গ্রামের তৃষ্ণার্ত লোক-জনেরা পিপাসা মিটাতে পারে; পাড়াবাসীর বৈঠক ও গ্রাম্য সালিশ-বিচারের কাজেও ব্যবহার হয়ে থাকে। বিশেষ করে যে গ্রামের একেবারে নিকটবর্তী কোন বৌদ্ধ বিহার নাই সেখানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো সম্পাদন করার জন্য এই ঘর নির্মাণ করা হয়।

জানা যায়, ঐ দিন বিকাল ৩.০০ টার দিকে আলীকদম জোনের সেনাবাহিনীর ২২ বীর বেঙ্গলের মেজর সাইফ-এর নির্দেশে

আরপি (রেজিমেন্ট পুলিশ) রশিদ-এর নেতৃত্বে ১৫/২০ জন শ্রমিক ও বনবিভাগের কর্মচারী বাবু পাড়ার চেরাংঘরটি ভেঙ্গে ফেলে। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে ১৭ জুলাই ২০১১ তারিখে আলীকদম সেনা গ্যারিসনের মেজর সাইফ মৌজার হেডম্যান, বাবু পাড়ার কার্বারী, পাড়াবাসী মংশৈনু মারমা ও থোয়াই ম্রা মারমাকে গ্যারিসনে ডেকে বলে যে, উক্ত চেরাংঘরটি ভেঙে ফেলতে হবে এবং অত্র এলাকায় কোনো ধরনের ঘর নির্মাণ, ক্যাং-গীর্জা নির্মাণ করতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে, নচেৎ পাড়াবাসীর বিরুদ্ধে মামলা করা ও ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুমকি দেয়। তারপরেও পাড়াবাসী চেরাংঘরটি ভেঙ্গে না ফেলাতে গত ২৯ জুলাই ২০১১ আরপি রশীদ-এর উপস্থিতিতে শ্রমিক নিয়ে চেরাংঘরটি জোরপূর্বক ভেঙ্গে ফেলা হয়। তবে এরপরে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ঘরটি ভাঙার কথা অস্বীকার করা হলেও বন বিভাগের কর্মচারীরা বলছে সেনাবাহিনীর নির্দেশেই তারা চেরাংঘরটি ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

থানচিতে বিজিবি কম্যান্ডার কর্তৃক গ্রামের কার্বারী নির্যাতন ও হয়রানির শিকার

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলাধীন রেমাক্রি ইউনিয়নের বড় মদক এলাকায় বড় মদক বিজিবি ক্যাম্প কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন রাশেদ কর্তৃক ২ জন কার্বারী (আদিবাসী গ্রাম প্রধান) নির্যাতন ও একাধিক কার্বারী হয়রানির শিকার হন। বড় মদক বিজিবি ক্যাম্প হচ্ছে ব্যাটেলিয়ন বলিপাড়া বিজিবি জোন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি ক্যাম্প।

জানা যায়, ঐ দিন ক্যাম্প কম্যান্ডার রাশেদ তার ক্যাম্পে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কার্বারীদের নিয়ে একটি সভা ডাকেন। রেমাক্রি ইউনিয়নের ২৫টি গ্রামের প্রায় সকল কার্বারী সভায় যোগদান করেন। সভার এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন রাশেদ (১) মিঃ বাথোয়াই অং মারমা (৫০) পীং- ঞিয়ই লুঙ মারমা, বাথোয়াই অং পাড়ার কার্বারী ও (২) মিঃ ক্যই সাথুই মারমা (৪৫) পীং- ক্য অং মারমা, বড় মদক পাড়ার কার্বারীকে হাত বেঁধে ও গাছে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করেন। এছাড়া ক্যাপ্টেন রাশেদ ক্রাহ্লা অং মারমা পীং- মৃত মুইখই মারমা, ক্রাহা অং পাড়ার কার্বারীকে অপমান করেন এবং মিঃ ডিয়াম্ব ত্রিপুরা পীং- মৃত জাপারাং ত্রিপুরা, জাপারাং পাড়ার কার্বারী ও পাইমং মারমা পীং- মৃত সুক্রা অং মারমা, পাইমং পাড়ার কার্বারীর কাছ থেকে জোরপূর্বক সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেন।

বিজিবি কম্যান্ডার গ্রামে আরাকান লিবারেশন পার্টি ও ম্রো পার্টির সশস্ত্র দল আসলে খবর না পাঠানোর জন্য কার্বারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। জানা যায়, পূর্বে এ সমস্ত সশস্ত্র দলের লোকজন আসলে কার্বারীরা বিজিবি কর্তৃপক্ষকে খবর দিত, কিন্তু ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিপরীতে গ্রামবাসীরা এ সমস্ত সশস্ত্র দলের দ্বারা দুর্ভোগের শিকার হন। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালের নভেম্বরে পাইথোয়াই উয়ে মারমা (সিংগাফা মৌজার হেডম্যান), চংদই ম্রো কার্বারী ও রেংনং ম্রো আরাকান লিবারেশন পার্টির সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন।

সভা শেষে ক্যাম্প কম্যান্ডার ২৫টি গ্রামের সকল কার্বারীদের নির্দেশ দেন যে, সপ্তাহের প্রত্যেক রবিবার ক্যাম্পের সভায় উপস্থিত থাকতে হবে এবং প্রত্যেকবার ক্যাম্পে আসার সময় ৫ কেজি মুরগী আনতে হবে। অভিযোগ রয়েছে যে, বিজিবি সদস্যরা প্রায়ই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে গরু, ছাগল বা মোরগ-মুরগী ক্রয় করলে ন্যায্য দাম দেয় না।

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত ক্ষুদে দলবাদী সশস্ত্র সন্ত্রাসী চক্র গ্রামে গ্রামে প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। ফলে তারা তাদের আধিপত্য ও অপকর্ম অব্যাহত রাখার হীনস্বার্থে সাধারণ মানুষের উপর অপহরণ ও খুন-খারাপি জোরদার করেছে। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের উপর হামলা জোরদার করেছে। ২০১০ সালের নভেম্বর থেকে ২০১১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই এক বছরের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একজন প্রত্যাগত সদস্য ও যুব সমিতির একজন নেতাসহ ১০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে অথবা অপহরণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করে। এছাড়া জনসংহতি সমিতির সমর্থকসহ মোট ১২ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। অপরদিকে সংস্কারপন্থী নামে ক্ষুদে দলবাদী সন্ত্রাসীরা বিগত এক বছরে ১ জন গ্রামবাসীকে হত্যা, ২ জনকে বেদম প্রহার এবং জনসংহতি সমিতির ১ জন প্রত্যাগত সদস্যসহ ৫ জনকে অপহরণ করে। নিম্নে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত ক্ষুদে দলবাদী সশস্ত্র সন্ত্রাসী চক্রের ঘটনাবালীর বিবরণ দেয়া গেল-

জুরাছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১০ বিকাল প্রায় ৪:০০ টায় মহারঞ্জন চাকমা বাত্যা (৪৫) ও হেমন্ত চাকমা (২২)-র নেতৃত্বে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলাধীন দুমদুম্যা ইউনিয়নের বরকলক এলাকা থেকে মেঘনাদ চাকমা (৪২) পীং বুন্দুক্যা চাকমা নামের এক নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে।

লংগদুতে সংস্কারপন্থীদের প্রহারের শিকার একটি পরিবার

গত ১১ জানুয়ারি ২০১১ দিবস চাকমা ও গৌরী চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীদের সশস্ত্র একটি দল রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার বাত্যাপাড়া গ্রামে ফুলেশ্বর চাকমার বাড়ীতে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীর নামে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা ফুলেশ্বর চাকমাকে, তার স্ত্রী ডলু কুমারী চাকমা (৩৯) ও কন্যা রিতা চাকমাকে (১৮) নির্মমভাবে প্রহার করে। এতে ফুলেশ্বর চাকমা মারাত্মকভাবে আহত হয়। অপরদিকে ফুলেশ্বরের স্ত্রীর বাম হাত ও কন্যার দুই হাত আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আহত অবস্থায় তাদেরকে লংগদু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খাগড়াছড়িতে সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য অপহরণ

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১১ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পৌরসভা এলাকাধীন মধুপুর এলাকা থেকে সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য অমরসিং চাকমা (৫০) পীং- রামদাশ চাকমা অপহরণের শিকার হয়। তবে জনগণের প্রবল চাপে পড়ে ১৬ জানুয়ারি ২০১১ দুপুর ১২:০০ টার দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অপহৃতকে 'পার্টিতে কাজ না করা'সহ নানা অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করা হয় বলে জানা যায়।

জানা যায়, ঐ দিন সকালে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অমরসিং চাকমা মাটিরাঙ্গা থেকে মধুপুর এলাকায় যান। সেখান থেকে ফেরার পথে শোভা কুমার চাকমা ওরফে কোয়েল (৪৭) পীং- স্বর্গধন চাকমা, সাং- সাতঘর্স্যা, মহালছড়ি (বর্তমানে মধুপুর) ও শিপলু ত্রিপুরা (৩০) পীং- উত্তম ত্রিপুরা (ড্রাইভার), সাং- খাগড়াছড়ি ব্রিজ এলাকা এর নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীদের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা মধুপুর এলাকার সেবব্রত চাকমার বাড়ী থেকে অমরসিং চাকমাকে অপহরণ করে। এরপর অপহরণকারীরা অমরসিংকে কমলছড়ি গ্রামে নিয়ে যায় এবং সেখানে ১৬ জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত আটক করে রাখে। অপহরণের পরপরই অপহৃতের স্ত্রী খাগড়াছড়ি সদরস্থ সংস্কারপন্থী নেতা তাতিন্দ্র লাল চাকমা ও সুধাসিন্ধু খীসার সাথে দেখা করে। সুধাসিন্ধু খীসা অমরসিংকে অপহরণের অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে তিনি অমরসিং চাকমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, অমরসিং মাটিরাঙ্গা উপজেলায় সংস্কারপন্থীদের উপজেলা কমিটি গঠনে ও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহে তাদেরকে সহযোগিতা করছেন না। অবশেষে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে প্রচন্ড চাপের কারণে, অপহরণকারীরা ১৬ জানুয়ারি ২০১১ এই শর্তে অমরসিং চাকমাকে মুক্তি দেয় যে, সে ভবিষ্যতে জনসংহতি সমিতিকে কাজ করবে না এবং অপহরণের ঘটনাটি প্রকাশ করবে না।

লংগদুতে সংস্কারপন্থীদের কর্তৃক এক ইউপি সদস্য অপহরণের শিকার

গত ১৭ জানুয়ারি ২০১১ রাত প্রায় ১০:৩০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু উপজেলাধীন আটরকছড়া ইউনিয়নের পেড়াছড়া গ্রামের বাসিন্দা জ্যোতিষ কান্তি চাকমা নামের এক ইউপি সদস্য অস্ত্রের মুখে ৭/৮ সদস্য বিশিষ্ট তথাকথিত সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণের শিকার হন। এরপর ১৮ জানুয়ারি ২০১১ অপহৃতের পরিবারের সদস্যরা জ্যোতিষ কান্তি চাকমার কাছে থাকা মোবাইল-এ ফোন করেন। ততক্ষণে মোবাইলের অপর প্রান্তে অপহৃতদের একজন বলে যে, যদি ১৯ জানুয়ারি ২০১১ এর মধ্যে তাদেরকে ৩ লক্ষ টাকা দেয়া না হয় তাহলে জ্যোতিষ কান্তি চাকমাকে হত্যা করা হবে।

বরকলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক যুব সমিতি নেতা খুন

১৮ জানুয়ারি ২০১১ সকাল প্রায় ১০:৪৫ টায় রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের লুদিবাচছড়া গ্রামের বাসিন্দা বরকল উপজেলা যুব সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঃ বিক্রম চাকমা ওরফে বক্র (৩৬) পীং- নিরঞ্জয় চাকমা ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন হন।

জানা যায়, ৫/৬ সদস্য বিশিষ্ট ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের একটি দল প্রথমে বিক্রম চাকমার বাড়ীতে আসে। সেখান থেকে বিক্রমকে তুলে নিয়ে বাড়ীর কিছু দূরবর্তী কর্ণফুলী হ্রদের তীরে নিয়ে যায়। বিক্রম চাকমার স্ত্রীও তাদের অনুসরণ করে এবং তার স্বামীর মুক্তির অনুরোধ করে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে স্ত্রীর সামনেই বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে সন্ত্রাসীরা বিক্রম চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে। নিহত বিক্রম চাকমার দুই শিশু সন্তান রয়েছে।

উল্লেখ্য, বিক্রম চাকমা যুব সমিতির নেতৃত্বে থাকা ছাড়াও এলাকার সামাজিক কর্মকান্ডেও তিনি ভূমিকা পালন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ধনুবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও লুদিবাচ ছড়া বনবিহার শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

জুরাছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে ৩ গ্রামবাসী নিহত, ১ অপহৃত

গত ২১ জানুয়ারি ২০১১ গভীর রাতে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অন্তর্গত জুরাছড়ি উপজেলায়

সশস্ত্র হামলা চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চারজন সমর্থককে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা এবং একজনকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে। জানা যায়, আনুমানিক রাত ৩ ঘটিকায় তপন জ্যোতি চাকমা ওরফে বর্মার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী জুরাছড়ি উপজেলাধীন মৈদুং ইউনিয়নের মেম্বার অরুণ চাকমার বাড়ী ঘিরে ফেলে এবং ঘুম থেকে তুলে জুরাছড়ি ইউনিয়নের শালবাগান গ্রামের রতন চাকমা (২২) পীং হেঙত্যা চাকমা, লুলাংছড়ি গ্রামের কালা চান চাকমা (৩০) পীং লক্ষীমণি চাকমা, সন্তোষ কুমার চাকমা (৩৩) পীং কুম রঞ্জন চাকমা ও মৈদুং ইউনিয়নের ফকিরাছড়ার বস্তিপাড়ার অধিবাসী নিরঞ্জয় চাকমা প্রমুখ জনসংহতি সমিতির চারজন সমর্থককে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তারাবন্যা থুমে নিয়ে গিয়ে রতন চাকমা, কালা চান চাকমা ও নিরঞ্জয় চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে। অপরদিকে সন্তোষ কুমার চাকমাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

রাইখালীতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীর গুলিতে ১ গ্রামবাসী নিহত

গত ২১ জানুয়ারি ২০১১ রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার রাইখালি ইউনিয়নের গবছড়ি গ্রামে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বিনোদ চাকমা (৩০) নামে জনসংহতি সমিতির জনৈক নিরীহ সমর্থককে গুলি করে হত্যা করে। জানা যায়, বিনোদ চাকমা খাগড়াছড়ি জেলা থেকে রাইখালির গবছড়ি গ্রামে জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। আনুমানিক সকাল ৭টায় ঘুম থেকে উঠার পর মুখ ধোয়ার সময় ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা অতর্কিতে গুলি বর্ষণ করে এবং এতে সে ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

লংগদুতে সংস্কারপন্থীদের গুলিতে ১ নিরীহ গ্রামবাসী খুন

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ বিকাল প্রায় ৫:৩০ টায় সংস্কারপন্থীদের গুলিতে রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলা সদরের তিনটিল্যা এলাকার বাসিন্দা মিঃ সূর্য চাকমা (২৫) পীং- মঙ্গল চন্দ্র চাকমা নামের এক নিরীহ যুবক খুন হয়।

জানা যায়, গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ বিকেলে সূর্য চাকমা মটর সাইকেলযোগে যখন দীঘিনালা থেকে বাড়ী ফিরছিল তখন লংগদু উপজেলার সীমান্তবর্তী খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার মেরুং এলাকা থেকে সংস্কারপন্থীদের একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী প্রথমে তাকে অপহরণ করে, তারপর লংগদু উপজেলার শিলছড়ি-আটরকছড়া এলাকায় নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা সূর্য চাকমার মটর সাইকেলটিও নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, সূর্য চাকমা একজন নিরীহ গ্রামবাসী এবং ভাড়ার বিনিময়ে সে মটর সাইকেল দিয়ে যাত্রী আনা-নেওয়া করত। সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর পাওয়া যে, বিরাজ মোহন চাকমা ওরফে অসীম (২৫) ও দিবস চাকমার নেতৃত্বে তথাকথিত সংস্কারপন্থীদের একটি দল দীর্ঘ দিন ধরে লংগদু-দীঘিনালা সড়কে চাঁদা সংগ্রহ করে আসছিল। চাঁদা আদায়ের অংশ হিসেবে এই সংস্কারপন্থীরা এই হত্যাকান্ড চালায়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য লংগদু সদরে নিয়ে আসে।

রাজস্থলীতে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক গ্রামবাসী অপহৃত

গত ৬ মার্চ ২০১১ রাত প্রায় ৯:০০ টায় ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলাধীন রাজস্থলী সদর ইউনিয়নের মদন পাড়ার নিজ বাড়ী থেকে জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যা ওরফে দুদুমনি (৩৩) পীং- মৃত লালন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা নামের এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হন। অপহৃত জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যা এসময় রাতের খাবার খাচ্ছিল। আত্মীয়দের অভিযোগ, পার্বত্য চুক্তি সমর্থন করার কারণেই ইউপিডিএফ জ্যোতিময়কে অপহরণ করে।

বাঘাইছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক নিরীহ ৬ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ১১ মার্চ ২০১১ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নের দাঙ্গাছড়া এলাকা থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ৬ নিরীহ গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হয়েছেন। পরে নির্মম প্রহারের পর অপহৃতরা মুক্ত হন। অপহরণের শিকার ৬ গ্রামবাসী হল- (১) শান্তি কুমার চাকমা (৩৫) পীং- নীলধ্বজ চাকমা, (২) বিমল কান্তি চাকমা (৩০) পীং- রমেশ চন্দ্র চাকমা, (৩) গঙ্গাসেন চাকমা (৩২) পীং- কামিনী রঞ্জন কার্বারী, (৪) বিক্রমাদিত্য চাকমা (২৮) পীং- মৃত সুনীল কুমার চাকমা, (৫) অমরসিং চাকমা পীং- মুনি কুমার চাকমা, (৬) অর্পণ চাকমা পীং- অশোক চাকমা। ২০-২৫ সদস্য বিশিষ্ট অপহরণকারী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের দলে নেতৃত্ব দেয় সুশীল ও সপ্তর্ষি। ব্যাপক প্রহারের পর ১২ মার্চ ২০১১ অপহরণকারীরা অপহৃতদের মধ্যে অমরসিং চাকমা ও অর্পণ চাকমাকে মুক্তি দেয়। এছাড়া জানা যায়, ব্যাপক প্রহারের কারণে শান্তি কুমার চাকমা মারাত্মকভাবে আহত হয়।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ কর্তৃক জোরপূর্বক গ্রামবাসীদের কাছ থেকে শত শত মণ হলুদ আদায়

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মার্চের প্রথমদিকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলাধীন ৪নং ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের কাবুকছড়ি পাড়ার গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা হিসেবে শত শত কাঁচা হলুদ আদায় করে। যা গ্রামবাসীদের জন্য ব্যাপক এক আর্থিক দুর্ভোগের সৃষ্টি করে।

জানা যায়, অন্তত ১৯ গ্রামবাসী চাঁদা হিসেবে প্রায় ২ হাজার মনের অধিক কাঁচা হলুদ স্থানীয় ইউপিডিএফকে দিতে বাধ্য হয়। প্রথমে গ্রামবাসীরা হলুদ না নিয়ে তার বিনিময়ে বরং টাকা নিতে অনুরোধ করে। যেহেতু সে সমস্ত কাঁচা হলুদ বিজ হলুদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু ইউপিডিএফ গ্রামবাসীদের সে অনুরোধে ভ্রুক্ষেপ করেনি। ইউপিডিএফ এর চাঁদাবাজির শিকার গ্রামবাসীদের তালিকা ও হলুদের বিবরণ নিম্নরূপ-

ক্রঃ	নাম	হলুদের পরিমাণ	তারিখ
১	অমলেন্দু চাকমা	২৫০ মণ	১৬/০১/২০১১
২	চিকন চান চাকমা	৭০ মণ	২৯/০১/২০১১
৩	মেদেরা চাকমা	১২০ মণ	০৩/০২/২০১১
৪	শান্তি জীবন চাকমা	১৬৫ মণ	১২/০২/২০১১
৫	মহেন্দ্র লাল চাকমা	৬৫ মণ	১৭/০২/২০১১
৬	বুদ্ধ মনি চাকমা	১২২ মণ	২১/০২/২০১১
৭	পদ্ম কুমার চাকমা	৬০ মণ	২৩/০২/২০১১
৮	সম্রাট সুর চাকমা	১৭৫ মণ	২৫/০২/২০১১
৯	সুর কুমার চাকমা	১২০ মণ	২৮/০২/২০১১
১০	সূর্য চান চাকমা	৯০ মণ	২৯/০২/২০১১
১১	লালু চান চাকমা	১২৩ মণ	০১/০৩/২০১১
১২	দেব রঞ্জন চাকমা	৫৫ মণ	০২/০৩/২০১১
১৩	ভদা মুয়া চাকমা	৫০ মণ	০৩/০৩/২০১১
১৪	ঝাদুরা চাকমা	১২০ মণ	০৩/০৩/২০১১
১৫	মুক্ত কুমার চাকমা	১৩০ মণ	০৫/০৩/২০১১
১৬	নিরু চাকমা	১২১ মণ	০৬/০৩/২০১১
১৭	ভাত্য চাকমা	১৪৫ মণ	০৭/০৩/২০১১
১৮	মিসেস মল্লিকা রাণী চাকমা	১১০ মণ	০৭/০৩/২০১১
১৯	সুনীল চাকমা	৪০ মণ	০৮/০৩/২০১১
মোট		২,১৩১ মণ	

লংগদুতে সংস্কারপন্থীদের কর্তৃক ৩ গ্রামবাসী প্রহৃত

গত ১০ এপ্রিল ২০১১ সকাল প্রায় ১০ টায় বিরাজ মোহন তালুকদার ওরফে অসীম পীং- শোভাপ্রিয় তালুকদার এর নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের একটি দল কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন লংগদু দজর পাড়া এলাকার তিন নিরীহ গ্রামবাসী অমানুষিক প্রহারের শিকার হয়। প্রহারের শিকার ৩ গ্রামবাসী হল- (১) দয়াল চন্দ্র চাকমা ওরফে দীপেন (৫৭) পীং- পূণ্যসেন কার্বারী, সাং- বামেছড়া, (২) ননাই চাকমা (২৭) পীং- রাজ মোহন চাকমা, সাং- বড়াদম ও (৩) দয়াল চন্দ্র চাকমার জনৈক কর্মচারী। জানা যায়, দয়াল চন্দ্র চাকমা সংস্কারপন্থীদের কর্তৃক দাবীকৃত চাঁদা দিতে না পারায় এই প্রহারের ঘটনা ঘটানো হয়।

রাঙ্গামাটির কাপ্তাইতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ৩ নিরীহ জুম্ম খুন

গত ১১ আগস্ট ২০১১ সকাল প্রায় ৭:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন চিৎমরম ইউনিয়নের আগাপাড়া এলাকায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া ব্রাশ ফায়ারে (১) ক্যসিং থোয়াই মারমা (২৭) পীং- ম্রাচিং থোয়াই মারমা, (২) হ্লাসুই খই মারমা (৩০) পীং- হ্লাচিং প্রু মারমা ও (৩) মিঃ বেবি চাকমা (৩২) পীং- আনন্দ চাকমা নামের ৩ নিরীহ জুম্ম গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয়। হামলার শিকার ৩ জন এসময় একটি চায়ের দোকানে চান পান করছিল। এদের মধ্যে বেবী চাকমা জেএসএস-র সমর্থক হলেও অন্য দুই জন্য অত্যন্ত সাধারণ গ্রামবাসী। জানা যায়, ২২/২৪ সদস্য বিশিষ্ট ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসী দলে নেতৃত্ব দেয় চন্দন চাকমা ডায়মন্ড ও ক্যসুইনু মারমা।

রাঙ্গামাটিতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের হাতে একইদিনে ১ ইউপি সদস্য খুন, ২ জন অপহৃত

গত ১৪ আগস্ট ২০১১ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের হামলায় রাঙ্গামাটি জেলার দুই উপজেলায় একইদিনে ১ ইউপি সদস্য খুন এবং ২ গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হয়। জানা যায়, ঐ দিন প্রথমে সকাল ৮ টায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা জুরাছড়ি উপজেলার

কুসুমছড়ি গ্রামে নিজ বাড়ীতে বিশ্রামরত অবস্থায় জুরাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডের সদ্য নির্বাচিত সদস্য গোপাল চাকমা (৩৪) পীং- রুহিনী চন্দ্র চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে। গোপাল চাকমার বুকে, কাঁধে ও গলায় গুলিবিদ্ধ হলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। অপরদিকে একই দিন রাত প্রায় ১১:৩০ টায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নের মিটিংগাছড়ি গ্রামের আশীষ কুমার চাকমা (৩৬) পীং- বিশ্বেশ্বর চাকমাকে ও একই ইউনিয়নের নারেইছড়ি গ্রামের শোভারতন চাকমা (২৫) পীং- হারবো চাকমাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক ৪ গ্রামবাসী অপহৃত
পরে মুক্তিপণ ও কঠিন শর্তের বিনিময়ে মুক্তি

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর প্রায় ২ টার দিকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলাধীন ৩নং বর্মাছড়ি ইউনিয়নের শুকনাছড়ি এলাকায় নিজ বাড়ী থেকে ৪ নিরীহ গ্রামবাসী অস্ত্রের মুখে অপহরণের শিকার হন। অপহৃত গ্রামবাসীরা হলেন- (১) কালী মোহন চাকমা (৫৫), কার্বারী, পীং- মৃত মির্জি চাকমা, গ্রাম- মধ্যম শুকনাছড়ি, (২) বিন্দু কুমার চাকমা (৪২) পীং- জগত চন্দ্র চাকমা, গ্রাম- ঐ, (৩) কনক বরণ চাকমা (৩০) পীং- মৃত নলিনী কুমার চাকমা, গ্রাম- উত্তর শুকনাছড়ি ও (৪) অরুন বিকাশ চাকমা (২৫) পীং- মৃত নলিনী কুমার চাকমা, গ্রাম- ঐ। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট অপহরণকারী সশস্ত্র দলটির নেতৃত্ব দেয় সচিব চাকমা, জেলাস চাকমা ও দেবমোহন চাকমা। জানা যায়, ঐ দিন রাত ৮ টার দিকে স্থানীয় জনগণের চাপ ও পরে মোটা অংশের মুক্তিপণ ও কঠিন শর্তের বিনিময়ে সন্ত্রাসীরা অপহৃত গ্রামবাসীদের মুক্তি দেয়।

জানা যায়, এলাকার গ্রামবাসীরা চুক্তির সমর্থক বলে দীর্ঘদিন ধরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা দাবী করে আসছিল। অপহরণের সপ্তাহ দেড়েক আগেও সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবী করে বসে। কেউ কেউ চাঁদা দিতে সম হয়, আবার কারও কারও সম্ভব হয়নি। বলা হয়, যারা চাঁদা দিতে পারবে না তাদেরকে এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। এই অবস্থায় গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ উপজেলার ৩ ইউপি চেয়ারম্যান ও ১৮ জন ইউপি সদস্য একসঙ্গে খাগড়াছড়িস্থ স্বনির্ভর এলাকায় ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসী নেতা সচিব চাকমা ও জেলাস চাকমার কাছে যায় এবং তাদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করে এর প্রতিকার দাবী করে। কিন্তু ইউপিডিএফ নেতারা উল্টো উক্ত জনপ্রতিনিধিদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে পাঠিয়ে দেয়।

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ এর হুমকিতে ২০ গ্রামবাসী ঘরছাড়া

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের অব্যাহত চাঁদা দাবী ও হুমকির মুখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলাধীন ৩নং বর্মাছড়ি ইউনিয়নের শুকনাছড়ি এলাকার ২০ নিরীহ গ্রামবাসী ঘরছাড়া হয়ে লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা সদরে আসতে বাধ্য হন। ফলে এসব পরিবারসমূহ উৎকণ্ঠা ও চরম আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা যায়। ঘরছাড়া এই পরিবারসমূহ হল-

(১) কালী মোহন চাকমা (৫৫) কার্বারী, পীং- মৃত মির্জি চাকমা, গ্রাম-মধ্যম শুকনাছড়ি;
(২) বিন্দু কুমার চাকমা (৪২) পীং- জগত চন্দ্র চাকমা, গ্রাম- মধ্যম শুকনাছড়ি;
(৩) কনক বরণ চাকমা (৩০) পীং- মৃত নলিনী কুমার চাকমা, গ্রাম- উত্তর শুকনাছড়ি;
(৪) অরুন বিকাশ চাকমা (২৫) পীং- মৃত নলিনী কুমার চাকমা, গ্রাম- উত্তর শুকনাছড়ি;
(৫) জগত চন্দ্র চাকমা (৬০) পীং- মির্জি চাকমা, গ্রাম- মধ্যম শুকনাছড়ি;
(৬) নতুন কুমার চাকমা (৪৫) পীং- জগত চন্দ্র চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(৭) স্নেহ কুমার চাকমা (৩৮) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- ঐ;
(৮) রুবেল চাকমা (১৫) পীং- স্নেহ কুমার চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(৯) ললিত কুমার চাকমা (৩০) পীং- কালী মোহন চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(১০) প্রদীপ চাকমা (২৫) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- ঐ;
(১১) প্রভাত চাকমা (২৫) পীং- নতুন কুমার চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(১২) জেকসন চাকমা (৮) পীং- ললিত কুমার চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(১৩) জেসমিন চাকমা (৭) পীং- প্রদীপ চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(১৪) রূপায়ণ চাকমা (১২) পীং- স্নেহ কুমার চাকমা, গ্রাম- ঐ;
(১৫) নিশন চাকমা (১০) পীং- বিন্দু কুমার চাকমা, গ্রাম- ঐ;

(১৬) মিদেল চাকমা (৬) পীং- প্রভাত চাকমা, গ্রাম- ঐ;

(১৭) চিরঞ্জীব চাকমা (২৫) পীং- এরেয়্যা খুলো চাকমা, গ্রাম- ঐ;

(১৮) এরেয়্যা খুলো চাকমা (৫৫) পীং- মৃত সুরেন্দ্র চাকমা, গ্রাম- বর্মাছড়ি;

(১৯) রনজিত চাকমা (৩০) পীং- এরয়্যা খুলো চাকমা, গ্রাম- ঐ;

(২০) মনায়্যা চাকমা (২০) পীং- ঐ, গ্রাম- ঐ।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির একজন প্রত্যাগত সদস্যকে অপহরণের পর হত্যা

ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক শুক্র কুমার চাকমা (সুভাষ) (৫১) পিতা চুচাঙ্যা চাকমা নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির এক সদস্যকে অপহরণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। গত ১১ অক্টোবর ২০১১ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার এক টিলায় তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর ময়না তদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়।

জানা যায় যে, খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন মেরুং ইউনিয়নের চঙড়াছড়ি গ্রামের অধিবাসী শুক্র কুমার চাকমা প্রায়ই চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে আসা-যাওয়া করতেন। গত ৮ অক্টোবর ২০১১ শুক্র কুমার চাকমা খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন সিঙ্গীনালার কাপ্তাই পাড়ার (চেঙ্গী ব্রিজের পাশে) অধিবাসী দেবদত্ত তালুকদার ওরফে কেসিএস নামে জনৈক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। জানা যায় যে, দেবদত্ত তালুকদার ওরফে কেসিএস ইউপিডিএফের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত। তার সহযোগিতায় ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা শুক্র কুমার চাকমাকে চট্টগ্রাম থেকে অতি সুকৌশলে অপহরণ করে পটিয়ায় নিয়ে হত্যা করে বলে ধারণা করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করে এবং ঘটনার সাথে জড়িত কয়েকজন ইউপিডিএফের সদস্যকে চট্টগ্রাম থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

"যে যত আদর্শবান, সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী, সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শি হতে পারে।"

"ক্ষমাগুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তিত হওয়ার গুণ - এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।"

"যারা মরতে জানে পৃথিবীতে তারা অজেয়। যে জাতি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না, পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না।"

-মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

১০ই নভেম্বর

অমর শহীদদের

রক্ত

বৃথা যেতে

দেব না

"আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত দাবী। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।"

"বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে বৃটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা-পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার কাছে বিস্ময়।"

-মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা